আল-ফুরক্বান

মূল

আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

اَلْفُرْقَان

بَيْنَ الْحَقِ والْبَاطِلِ

فِيْ

عِلْمِ التَّصَوُّفِ وَالْإِحْسَانِ

আল-ফুরক্বান

মূল : আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ : মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

Internet Edition

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

আল-ফুরক্বান

মূল : আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ : মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

প্রকাশকাল
রমজান ১৪৩২, আগষ্ট ২০১১, ভাদ্র ১৪১৮

প্রকাশক
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
প্রতিষ্ঠাতা : খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট - ৩১০০, মো: ০১৭৩৭ ৯১৩ ৪৬৩, ০১৭১৭ ৯২৯ ৬৭৫

বর্ণবিন্যাস
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দি কাসওয়া কম্পিউটার, সিলেট।
০১৭১১ ৪৭৮ ২৪৪

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

"Al-Furqan Bainal haqqe walbaatile fee ilmit-tassauuf wal ihsan" : Written by Allama Mushaheed Biampuri (R) in Urdu & Arabic and Translated by Sayed Mahmudul Hassan, Published by Khanqa-E-Aminia-Asgaria Prokashoni, Ali Centre, Subid Bazar, Sylhet-3100 Price: Tk 250.00, £5.00 Date of publication: August 2011

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় নানা, শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা মাওলানা অব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শ্রদ্ধেয় দাদা সৈয়দ শামসুদ্দিন ওরফে মাশুক মিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রাফয়ি দারাজাত, মাগফিরাত এবং ওয়ালিদে মুহতারাম, কায়িদুল উলামা আল্লামা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলিফা আলহাজ্জ শায়খ সৈয়দ মুস্তফা আহমদ দামাত বারাকাতুহুমের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায়।

-অনুবাদক

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলা সায়্যিদিনা ওয়ামাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়াআলা আলিহি ওয়াআসহাবিহি আজমাঈন। আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কৃপায় আমরা ক'জন মিলে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ইলমে তাসাওউফের বিখ্যাত কিতাব, 'আল-ফুরক্বান' এর বঙ্গানুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল হওয়ার জন্য সকলের নিকট দু'আ কামনা করছি। কারণ, আমাদের প্রচেষ্টা যা-ই হোক না কেন, তা যদি মা'বুদের দরবারে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাহলে কোন ফায়দা হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক আমল করার তাওফিক দিন।

'আল-ফুরক্বান' অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। ২০০৯ ঈসায়ী সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে সিলেটস্থ সুবিদ বাজার জামে মসজিদের সানী ইমাম হাফিজ ফায়জুল ইসলাম, উমরপুরের মুহাম্মদ হুসাইন এবং আমি কানাইঘাট মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসায় যোগদান করি। আমি ইতোপূর্বে আর কোনদিন কানাইঘাট যাই নি। সেখানে পৌঁছে লক্ষ্য করলাম অনেক মানুষ একটি কবরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা অবশ্য হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবর জিয়ারত করছিলেন। সুতরাং আমিও সেখানে যেয়ে খুব ভক্তিভরে এই মহান বুজুর্গের কবর জিয়ারত করলাম।

কানাইঘাটের ঐতিহ্যবাহী 'গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্রাসা' ও 'দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্রাসা' পরিদর্শন শেষে বহুলপঠিত ইসলামী ম্যাগাজিন মাসিক মদীনায় এ ব্যাপারে "ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ি মাদ্রাসা ও দারুল উলূম কানাইঘাটে একদিন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি (মাসিক মদীনা: এপ্রিল ২০০৯ ঈসায়ী সংখ্যা)। এই প্রবন্ধে সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের গৌরব, জ্ঞানতাপস, মহাত্মন হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের উপরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। এ বছরই আমার তরীকতের শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ই'তিকাফে সিলেট নগরস্থ ঐতিহাসিক

নয়াসড়ক মাদানী মসজিদে অংশগ্রহণ করি। হযরতের ৯ জন খুলাফাসহ আলিম-উলামা, মাশাইখ, মুরীদান এবং সাধারণ ভক্তবৃন্দ মিলে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ পালন করেন। আমার নিকটেই রাত্রিযাপন করতেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন ভক্ত, ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ, সুনামগঞ্জের ঠাকুরভোগ গ্রাম নিবাসী ও জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা মল্লিকপুর সুনামগঞ্জের সম্মানিত মুহতামীম হযরত মাওলানা নাসির খান সাহেব। এক রাতে তিনি একখানা পুরাতন উর্দু কিতাব আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, ইলমে তাসাওউফের উপর লিখিত এই কিতাবখানা 'মা'রিফাতের মহাসমুদ্র'।

উর্দু ভাষার প্রতি অজ্ঞতা হেতু শিরোনাম এবং এক দু'টো বাক্য ছাড়া কিতাবখানার আর কিছুই পাঠ করে আমি বুঝতে সক্ষম হই নি। তিনি তখন নিজেই কিছু পাঠ করে শোনালেন এবং প্রয়োজনে বঙ্গানুবাদও করলেন। সাথে সাথেই কিতাবটির প্রতি আমার ভীষণ আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। অজানা এক ইঙ্গিতে আমি বলে ফেললাম, মাওলানা সাহেব! এই কিতাবের বঙ্গানুবাদ হয়েছে কি? তিনি বললেন, এখনও হয় নি। আমি বললাম, কী বলেন? সেই ১৯৫৫ ঈসায়ী সনে প্রণীত এরূপ একটি মহামূল্যবান কিতাবের বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ আজো কেউ গ্রহণ করেন নি! কী আশ্চর্য, এ কিতাব তো জাতীয় সম্পদ, মুসলিম উম্মাহর সম্পদ! গণনাতীত মানুষ এ থেকে উপকৃত হতে পারেন। যদি আল্লাহর হুকুম হয় তাহলে এর বঙ্গানুবাদের ব্যবস্থা নিজেই গ্রহণ করবো। যে প্রখ্যাত গ্রন্থটির কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে সেটিই হলো, আমার মতে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শ্রেষ্ঠ কীর্তি "আল-ফুরক্বান বাইনাল হাক্কে ওয়াল বাতিলে ফী ইলমিত তাসাওউফে ওয়াল ইহসান"।

ইলমে মা'রিফাতের অথৈ সাগর থেকে তুলে নেওয়া ইয়াকুত-মারজানে পরিপূর্ণ হযরতের উক্ত কিতাবখানার বঙ্গানুবাদ করার প্রতিজ্ঞা আমি আবেগের প্রভাবেই করেছিলাম। কিন্তু উর্দু এবং আরবী ভাষায় নিজের অযোগ্যতা আর খাস করে ইলমে তাসাওউফের উপর অজ্ঞতা হেতু শুধু ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি নি। সুতরাং একজন সুযোগ্য অনুবাদকের খোঁজ করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিভাবান তরুণ লেখক, খলীফায়ে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,

হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদির সন্তান মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান 'আল-ফুরক্বান' এর বঙ্গানুবাদ করতে আগ্রহী হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই নিঃস্বার্থ চেষ্টাকে কবুল করেছেন। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগে থেকে দীর্ঘ বছর খানেকের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে আমরা গ্রন্থটির অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি।

সবশেষে গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আমার অন্তরের অŠতঃস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, মাওলানা ইব্রাহীম চৌধুরী, কবি আবদুল মুকিত মুখতার, হুসুনল আম্বিয়া চৌধুরী এবং খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার বিশেষ খাদিম দ্বীন ইসলাম প্রমুখের প্রতি আমি ঋণী। এদের সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা অনুবাদক ও আমার কাজে অতুলনীয় শক্তি যুগিয়েছে। এছাড়া গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য যারা অনুদান হিসাবে অর্থ প্রদান করেছেন তাদের কাছেও আমি ঋণী। আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আ-মিন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
প্রতিষ্ঠাতা : খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।
১০/০৭/১১ ঈসায়ী।

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীতে রিসালাতের বিপ্লবই সর্বাধিক কল্যাণকর। এ বিপ্লব চির শাশ্বত। মানবতার মুক্তি, উন্নতি, শান্তি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনই হল এ ইনকিলাবের চাবিকাঠি। মানুষের অন্তরাত্মা থেকে শুরু হয়েছে এর যাত্রা। অতঃপর তার সুফল ছড়িয়ে পড়ে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, গোটা শরীরে। ছড়িয়ে পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে। এ ইনকিলাব কেন এত ব্যাপক, এত সুবিস্তৃত? কারণ একটাই, আর তা হল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা নিজেই নির্বাচিত করেন এ ইনকিলাবের পথনির্দেশক। তিনি হন একটি সমাজের সবচেয়ে বেশী আদর্শ ব্যক্তিত্ব। 'মুহাম্মদ তো হলেন একজন রাসূল।' 'বলুন! আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। তবে আমি ওহী প্রাপ্ত হই' (আল-কুরআন)। এই ওহী হল মানুষ পরিশুদ্ধের কষ্টি পাথর। কল্যাণকর আদর্শ আর অকল্যাণকর পথ ও মতের পরিচয় ফুটে ওহীর কষ্টি পাথরে। যেহেতু এ ইনকিলাবের কর্মসূচি আসে খোদ মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে।

এটা এমন কর্মসূচি, এতে আছে সমাজ ও রাষ্ট্রের আলোচনা। আছে ব্যক্তি ও তার মনের শুদ্ধতা অর্জনের অনুপম নির্দেশনা। আছে নিখুঁত আবেগ-অনুভূতির লালন ও রুচিশীল বুদ্ধি এবং যুক্তি চর্চার সশ্রদ্ধ অনুমোদন। 'তিনি তাদের কাছে পাঠ করবেন তাঁর আয়াত, তাদেরকে করবেন পরিশুদ্ধ, শিক্ষা দিবেন কিতাব ও সুন্নাহ' (আল-কুরআন)। এ চারটি কর্মসূচীর আলোকেই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত। এ দাওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঐশী গ্রন্থের পঠন ও শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি চর্চা ও সুন্নাহ দীক্ষার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে নিখুঁত ও পবিত্র পরিবেশ। বস্তুবাদের এই যুগে আল্লামা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আলফুরক্বান' হচ্ছে সেই সোনালী সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির একটি ঐতিহাসিক প্রয়াস।

আলহামদু-লিল্লাহ্! 'আল-ফুরক্বান' গ্রন্থখানি পাঠকদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। এরকম একটি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করতে পারব জীবনে কোন দিন কল্পনা করি নি। ইলমী জগতে 'আল্লামা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর 'আল-ফুরক্বান' হল এক অবিনশ্বর কীর্তি। গ্রন্থকার কে ছিলেন তা বলা সহজ, কিন্তু তিনি কী ছিলেন তা অনুধাবন করা এবং ভাষা দিয়ে ফুটিয়ে তুলা এ অধমের জন্য নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। তাই তাঁর গ্রন্থের ভাষান্তর করা যে এক দুঃসাধ্য সাধনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ সাধনা আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তা'আলার তাওফিকেরই ফলশ্রুতি। তাঁর করুণার কোন শেষ নেই। অতএব রাহীম রাহমান করুণাময়ের দরবারে এই প্রার্থনা, তিনি যেন এ

খিদমাত কবুল করেন এবং তাঁর মুহাব্বাত ও মা'রিফাত পিপাসুদের নিকট এর মাকবুলিয়াত দান করেন।

মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী একজন নিরলস বিজ্ঞান গবেষক, পাশাপাশি পূর্বসুরী ইসলামী মনীষী ও সালাফে সালিহীনের যে কোন গ্রন্থের অনুসন্ধিৎসু পাঠকও। তিনি আমাকে এ গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে বলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই গ্রন্থের অনুবাদে হাত দিয়েছি। আমার জীবনে আল্লামা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য হয় নি। তবে সুযোগ পেয়েছি তাঁর কয়েকজন একান্ত শিষ্যের সান্নিধ্য লাভের। আর এজন্য নিজেকে দাবী করতে পারি এই মনীষীর একজন প্রশিষ্য হওয়ার। তাই গ্রন্থখানি অধ্যয়নের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের মানসেই অনুবাদ শুরু করি। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণাগারে বসে আমি একদিকে বাংলা বলি আর মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী অতি দ্রুত টাইপ করতে থাকেন। সাথে সাথে আমরা সম্পাদনার কাজও চালিয়ে যাই। এতে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'ইসলামী সমাচার' ও 'সাপ্তাহিক হিজরত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, লেখক আবদুল মুকিত মুখতার।

ভাষান্তরে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়েছে। (১) গ্রন্থকার যে যে স্থলে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন একই শিরোনাম দিয়ে। আমরা এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুসারে শিরোনাম ও উপশিরোনাম সংযোজন করেছি পাঠকের সুবিধার্থে। (২) গ্রন্থে বর্ণিত কুরআন শরীফ থেকে তিন শতাধিক আয়াতের অনুবাদ দিয়েছি। সূরা ও আয়াত সূত্র উল্লেখ করেছি। মূল গ্রন্থে আয়াতের উর্দূ অনুবাদ ছিল না। তাই এগুতে হয়েছে বেশ সতর্কতার সাথে। (৩) আল্লামা মুশাহিদ একজন হাদীস তত্ত্ববিদ। তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল হাদীস চর্চায় উৎসর্গ। আসলে তাযকিয়ায়ে নাফছ বা আত্মসংশোধনের মূল প্রাণ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাত। এ বিষয়টি একজন 'আল-ফুরক্বান' পাঠকের চোখে ফুটে উঠে অতি সহজে। গ্রন্থকার প্রতিটি অধ্যায়ে একের পর এক হাদীসের বর্ণনা দিয়ে পাঠককে নিয়ে যান দরবারে রিসালাতে। যেখানে সায়্যিদুল আরিফিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফেদাকার সাহাবায়ে কিরামকে ইহছান ও তাযকিয়ায়ে নাফছের শিক্ষা দিয়ে বলছেন 'তোমাকে আল্লাহর উপাসনা করা চাই এমনভাবে যেমন নাকি তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি না দেখ, তবে তিনি তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন।' যাক, এ বিপুল সংখ্যক হাদীসের সমারোহে যদি বলা যায় 'আল-ফুরক্বান' হচ্ছে একটি হাদীস গ্রন্থ তবে অত্যুক্তি হবে না। গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। তবে বর্ণিত সমূহ হাদীস অনুবাদ ছাড়াই। এক্ষেত্রে হাদীসের 'মতন' তথা আরবী পাঠাংশ উল্লেখ করত: বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তা'আলার প্রিয় হাবীবের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত এসব নিখুঁত বাণীর নির্ভুল ভাষান্তরে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি।

সীমিত পাথেয় নিয়ে এক অসীম পথের যাত্রা। অসুন্দর অসংগতি যে থাকবে তা স্বীকার করি অকুণ্ঠে।

(৪) গ্রন্থকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী, আল্লামা যুবায়দি, হাফিয ইবনে তাইমিয়া, হাফিয ইবনে কায়্যিম, হাফিয ইবনে কাছির এবং আল্লামা আলুসি বাগদাদী রাহিমাহুমুল্লাহর অভিমত ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আরবী ভাষার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে উন্নীত তাদের এসব অভিমত আমাদের জন্য মণিমুক্তা। কুড়ানো মানিক। তাই এগুলোর অনুবাদে আমাদের কোন কার্পণ্যবোধ হয় নি। বিশেষ করে ইমাম গায্যালী বস্তুবাদে বিক্ষত মুসলিম সমাজকে ইসলামী চরিত্র দর্শনের পথে ফিরে আসার যে আহ্বান করেছিলেন, সেই অহ্বানটি ফুটে উঠেছে ‘আল-ফুরক্বানে’ দরদময় ভাষায়। নতুন ভঙ্গিমায়। নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিংড়ানো আবেদনে। ‘আল-ফুরক্বান’ হচ্ছে আত্মশুদ্ধি চর্চার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই প্রামাণ্যতা যেন ভাষান্তরে হারিয়ে না যায় সে জন্য মূল গ্রন্থের সাথে বারবার অনুবাদটি মিলিয়ে দেখি। প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই ইসলাহে নাফছের জন্য কেবল বই পুস্তক অধ্যয়ন যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন হক্কানী উলামা ও রাব্বানী মাশাইখের সুহবত ও সান্নিধ্যের। প্রয়োজন তাঁদের ইরশাদ ও দিকনির্দেশনার। আল্লামা মুশাহিদ রাহিমাহুল্লাহ একজন মনোনিবেশী পাঠকের মানসে এ সত্য বিষয়টি তুলে ধরেন অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও যুক্তির সাথে।

সমকালীন উলামায়ে কিরাম আল-ফুরক্বানের যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সামান্য একটু এখানে উল্লেখ করতে চাই। সিলেট আলিয়ার প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন ‘ইহসান ও তাসাওউফ অধ্যায়ে ‘আল-ফুরক্বান’ হচ্ছে আল্লামা মুশাহিদের এক ইজতিহাদী কর্ম। ইহসান শাস্ত্রে তাঁকে একজন মুজতাহিদ বলাই যুৎসই।’ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা মারগুবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন ‘ইহসান সম্পর্কে বড় বড় গ্রন্থাদিতে যা বলা হয়েছে তা সবই আল-ফুরক্বানে এসে গেছে। একজন সালিক ও আত্মশুদ্ধি চর্চাকারীর জন্য আল-ফুরক্বান অধ্যয়নই যথেষ্ট। আর এজন্যই অত্যন্ত যত্নের সাথে গ্রন্থখানি আমি দেওবন্দের কুতুবখানায় রেখেছি।’ উল্লেখিত তথ্য দারুল উলূম কানাইঘাটের শায়খুল হাদীস মাওলানা অলিমুদ্দীন দুর্লভপুরীর কাছ থেকে জানতে পারি। গত ২৩-০৫-২০১১ আমরা দারুল উলূম কানাইঘাটে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আল্লামা মুশাহিদ রাহিমাহুল্লাহর খুবই কাছের শাগরিদ। অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি বলেন ‘আল-ফুরক্বানের বাংলা ভাষান্তর আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন। আপনারা একাজে এগিয়ে এসে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।’ ঐ দিনই আমরা গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা জামিল সাহেবের সাথে তাঁর নিজ বাড়িতে সাক্ষাৎ করি। তিনিও আল-ফুরক্বান ভাষান্তরের সংবাদ শুনে বেশ তৃপ্তিবোধ করেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি তিনি হযরতের অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনায় নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক তাঁর এই উদ্যোগ কবুল করুন।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ খলিফা, তাঁর চিন্তা ও ফিকিরের এক প্রতিচ্ছবি হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জীর তাগিদ ও পীড়াপীড়িতে 'আল-ফুরক্বান' অনুবাদের কাজ দ্রুত হচ্ছিল। অনেক অসুবিধা ও ঝামেলা সত্ত্বেও আমাদের কাজ গতিহারা হয়নি, থেমে যায়নি। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। জামেয়া দারুসসালাম, সিলেট এর খাদিমুল হাদীস হযরাতুল উস্তায মুহতারাম মাওলানা যাকারিয়া দামাত বারাকাতুহুম এর কাছে আমি চিরঋণী। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি গ্রন্থখানি পাঠ করেছেন। বেশ মনোযোগ দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লামা মুশাহিদ রাহিমাহুল্লাহর স্নেহধন্য ব্যক্তিত্ব, জামেয়া দারুসসালাম এর উস্তাযুল হাদীস, মুহতারাম উস্তায মাওলানা মাহবুবুর রহমান মুবারকপুরী এবং জামেয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস মুহতারাম উস্তায মাওলানা ওলিউর রাহমান দামাত বারাকাতুহুমকে আমি সময় সময় অনুবাদ সম্পর্কে অবহিত করি। তারা আমাকে প্রেরণা ও হিম্মত যুগিয়েছেন। আসলে আমার মুহতারাম আসাতিযা ও মাশায়েখের সস্নেহ নেগরানি এবং দুয়ার বদৌলতেই কলম হাতে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আজীবন যেনো মাথার উপর তাদের দুয়া থাকে এটাই অন্তরের আকুল কামনা। প্রার্থনা করি হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ইহ-পরকালে পুরস্কৃত করুন, জাযায়ে খায়র দান করুন। হে আল্লাহ! আল্লামা মুশাহিদ রাহিমাহুল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা গোটা মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করুন। আমীন।

তালিবে দু'আ
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
৭ শা'বান ১৪৩২ হিজরী।

আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

জন্ম ও শিক্ষা: ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের মহান সাধক, হাদীসে নববীর জ্ঞানপিপাসু, ওলীয়ে কামিল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩২৭ হিজরীর (১৯০৮ ঈসায়ী) মুহাররম মাসে কানাইঘাট উপজেলার অন্তর্গত বায়মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কারী মুহাম্মদ আলীম ও মাতার নাম মরহুমা মুছাম্মাত সাফিয়া। বাল্যকালেই মুশাহিদ সাহেব তাঁর পিতাকে হারান। মাতা সাফিয়া পবিত্র কুরআনের হাফিজা ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন স্নেহময়ী দীনদার মায়ের কাছেই শুরু হয়। এরপর ৭ বছর বয়সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিন বছর লেখাপড়া শেষে অত্যন্ত কৃতীত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এই অল্প বয়সেই মুশাহিদ সাহেবের আল্লাহ-প্রদত্ত উন্নত মেধা অনেকের নিকট ধরা পড়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই মেধাবী ছেলের প্রতি মুগ্ধ হয়ে প্রস্তাব করলেন মুশাহিদকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে তিনি নিজেই যাবতীয় খরচ বহন করবেন। কিন্তু যিনি হবেন ইলমে দ্বীন তথা ইলমে নববীর এক বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী তিনি কি আর জাগতিক জ্ঞানলাভের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারেন? সুতরাং সেই ছোট্ট বয়সেই তাঁর মন ইলমে দ্বীনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়লো। তাই ভর্তি হয়ে গেলেন কানাইঘাটের বর্তমান মাদ্রাসায় যার তখনকার নাম ছিলো, "কানাইঘাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা"। এখানে তিনি দীর্ঘ ৭ বছর লেখাপড়া করেন।

ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হয়ে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিকটস্থ লালার চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু এখানে শিক্ষকতায় বেশীদিন মন বসলো না মুশাহিদ সাহেবের। জ্ঞানের প্রচ- পিপাসা তাকে শীঘ্রই দূরদেশে নিয়ে গেল উচ্চ শিক্ষার্জনের অন্বেষায়।

প্রথমে তিনি ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। এখানে হিকমাত, ফালাসিফা, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন শেষে ইলমে হাদীসের উপর আরোও জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে মিরাটে চলে যান। দীর্ঘ দু'বছর এখানে অধ্যয়ন শেষে স্বীয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মাসীয়তুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নির্দেশে কাফিয়া কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইজাহুল মাতালিব' এবং আরো

এক দু'টো কিতাব রচনা করেন। এগুলো তার উস্তাদের নামেই প্রকাশিত হয়। হযরত মুশাহিদ সাহেব বাড়িতে ফিরে এসে পুনরায় কানাইঘাটের রাহমানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করলেন। কিন্তু জ্ঞানান্বেষার প্রচ- প্রভাব থেকে তিনি তখনও মুক্ত হতে পারলেন না। বাস্তবে জ্ঞানান্বেষীরা এরূপই হয়ে থাকেন। আর ইলমে ওহীর জ্ঞান তো অসীম। এ জ্ঞান আহরণের সীমা নেই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহাসত্যের এই জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সর্বদা বাড়তেই থাকে। সুতরাং হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবারো ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ইলমে দ্বীনের উচ্চতর শিক্ষার্থী হিসাবে। তিনি ১৩৫৬ হিজরীর জুমাদিউচ্ছানী মাসে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করলেন। এখানে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেন। এছাড়া যুগশ্রেষ্ঠ ওলি-আল্লাহ শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তিনি দীর্ঘ দেড় বছর হযরতের খিদমাতে ছিলেন।

দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাওলানা সাহেব বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা শুরু করেন। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি শাইখুল হাদীস হিসাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিলেছিলেন ওগুলোর মধ্যে প্রধান ক'টি হলো সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা, দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্রাসা, ভারতের বদরপুর মাদ্রাসা এবং যুক্ত প্রদেশের রামপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা। তিনি জীবনের শেষাংশে কানাইঘাট দারুল উলূম মাদ্রাসায় মুহতামীম ও শাইখুল হাদীস হিসাবে দায়িত্বপালন করে গেছেন।

ইলমে তাসাওউফের সন্ধানে: প্রাথমিকভাবে হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে তাঁর ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর স্বীয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে তাসাওউফের সবক গ্রহণ করেন। অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মশুদ্ধির আকাক্সক্ষায় তিনি সে যুগের প্রখ্যাত শাইখ হযরত মাওলানা ইয়াকুব বদরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করে তরীকতের উচ্চতর স্তরে উপনীত হন। 'আল-ফুরক্বানে' (অত্র কিতাবে) তিনি স্বীয় মুর্শিদের নামোল্লেখ না করে শুধু লিখেছেন, "শায়খ মুদ্দাজিল্লুহু"। হযরত ইয়াকুব বদরপুরী রাহমাতুল্লাহি ছিলেন শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলীফা। উল্লেখ্য হাফিয আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শাইখ হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই সিলসিলার সকলেই ছিলেন

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরীকার শায়খ। সে হিসাবে মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও স্বীয় মুর্শিদের নিকট থেকে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরীকানুযায়ী খিলাফত লাভ করেন। অন্যান্য তরীকায়ও তিনি কামালাতের অধিকারী ছিলেন।

রচনাবলি: হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র মতে তাঁর রচিত গ্রন্থাদি হলো: ১. ফাতহুল কারীম ফী ছিয়াছাতিন্নাবিয়্যিল আমীন (রাজনীতিক আলোচনা) - গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' নামকরণে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ২. আল-ফুরক্বান বাইনাল হাক্কে ওয়াল বাতিল ফী ইলমিত তাসাওউফে ওয়াল ইহসান (ইলমে মা'রিফাতের সঠিক ব্যাখ্যা) - উর্দু ও আরবী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৫৫ ঈসায়ী; ৩. সত্যের আলো (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) - প্রথম খণ্ডে মাওলানা সাহেব ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সীরাত, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উপর সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে দু'টি মতভেদপূর্ণ ফাতওয়ার উপর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। এর একটি হলো তাহাজ্জুদের নামায জামাআতে পড়া ও দ্বিতীয়টি হলো ঈদের চাঁদ স্বচক্ষে না দেখে সরকারী আদেশের ভিত্তিতে ঈদ পালন সম্পর্কিত। এ গ্রন্থ দু'েটা বাংলা ভাষায় রচিত। ৩. আল বুরহান আলা ইস্তিহবাবে ছিমাইল কুরআন (আরবী) - এই গ্রন্থটি হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা জামিল আহমদ সাহেব সম্প্রতি (মূল আরবী ভাষায়) প্রকাশ করেছেন। ৪. বিশ্ব রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাংলা ভাষায় চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতগ্রন্থ) - এটি অপ্রকাশিত। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে জানা যায় নি। ৫. মুশকিলাতে কুরআন ও হাদীস (আরবী ভাষায় রচিত প্রকাণ্ড কিতাব - অপ্রকাশিত) - এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে জানা যায় নি। ৬. তাফসীরে সূরা ফাতিহা (আরবী - অপ্রকাশিত) - এই গ্রন্থের আংশিক পাণ্ডুলিপি হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা জামিল আহমদ সাহেবের নিকট সংরক্ষিত আছে। ৭. আল-কিরাতু খালফাল ইমাম (আরবী - অপ্রকাশিত) - পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলে নি। ৮. তাহকীকে রুইয়াতে হিলাল (আরবী - অপ্রকাশিত) - পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে জানা যায় নি। ৯. কাওয়ায়িদে উর্দু (উর্দু) - এটাও একটি অপ্রকাশিত কিতাব। এই কিতাবের পাণ্ডুলিপির খবরও কেউ জানেন না। ১০. ইজহারে হাক্ব (বাংলা) - কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসা এবং রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। মাওলানা হারুনুর রশীদ শ্রীপুরী গ্রন্থটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। ১১. রিসালাতু মুতাআল্লিকাতিয যাকাত (আরবী) - যাকাত বিষয়ক একটি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত)। ১২. ইসলামে ভোট ও ভোটাধিকার - গ্রন্থটি প্রকাশিত। ১৩. আযকার

তুফিদুস সালিকীন ইলার রাহমান (এ গ্রন্থটির কথা আল-ফুরক্বানের শেষে মাওলানা সাহেব উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই গ্রন্থটি আল-ফুরক্বানের দ্বিতীয় খণ্ড- তবে এটি লিখেছিলেন কি না, সে তথ্য আমরা উদ্ধার করতে পরি নি)।

এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে, আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাড়িতে যেয়ে আমরা তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা জামিল আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। উপরোক্ত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি জবাবে বললেন, একমাত্র তাফসীরে সূরা ফাতিহা গ্রন্থের আংশিক কিছু পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কিছুই নেই। অপরদিকে "আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রহঃ): জীবন ও চিšতাধারা" গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান সাহেব লিখেছেন: "এ ছাড়া পাণ্ডুলিপি অবস্থায় যে কয়েকটি কিতাব এখনো তাঁর ঘরে দেখেছি সেগুলো হচ্ছে" ... এরপর তিনি উক্ত গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। (দেখুন উক্ত গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠা)। মহাত্মন হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উল্লেখিত সকল কিতাবই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনে অনূদিত হয়ে প্রকাশ হওয়া জরুরী থাকা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ ৪০ বছর পরও এগুলো অপ্রকাশিত রয়েছে। আমরা সবার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, 'জাতীয় সম্পদ' এসব কিতাবের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে যে কোন উপায়ে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া সকলের ঈমানী দায়িত্ব। এ ব্যাপারে 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া'র কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন, ইনশাআল্লাহ।

ইন্তিকাল: যুগের মহান জ্ঞানতাপস, ওলিয়ে কামিল আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ৬৩ বছর বয়সে, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ঈসায়ী সালে এই মায়াবী ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর মাত্র তিনদিন পূর্বে একটি সভায় ওয়াজ প্রদানকালে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দু'টি তিনি কাঁদতে কাঁদতে পাঠ করেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

-"খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।"(ক্বামার (৫৪) ৫৪-৫৫)।

এরপর দীর্ঘ দু'আ করলেন। শুক্রবার রাতে সফর থেকে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন শনিবার কানাইঘাট বাজারের মসজিদে যুহরের নামায আদায় করে কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করলেন। উল্লেখ্য পরদিন রবিবার ছিলো পবিত্র

ঈদুল আযহার তারিখ। রাত ১২ টায় ছোটভাই মাওলানা মুজাম্মিল সাহেব তাঁর কামরায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তিনি ভীষণ অসুস্থ। বার বার বলছিলেন, "ছাকারাতে মাউত বড়ই কষ্টদায়ক"। মাওলানা সাহেব ছোটভাইকে অসিয়ত করলেন: "আমার কুতুবখানা থেকে তাফসীরে রুহুল মা'আনী এবং ফাতওয়ায়ে শামী কানাইঘাট মাদ্রাসায় দান করে দিও। আমার ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহর হাওলা করলাম।" এরপর পাঠ করতে লাগলেন: আল্লাহুম্মা বির-রাফীক্বিল আ'লা- (হে আল্লাহ! তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং তোমার সাথে মিলতে চাই)। এরপর তিনি যেনো ঘুমিয়ে গেলেন। কিন্তু আসলে ইতোমধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন (ঈদুল আযহার দিন) আসরের নামাযের পর কানাইঘাট মাদ্রাসা মাঠে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল এই নামাযে জানাযায় লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হলেন। অনেকের মুখে শোকগাথা এই পংক্তিটি শোনতে পাওয়া যায়: "দুঃখ রইলো কলিজায়, মুশাহিদ বায়মপুরী আর নাইরে দুনিয়ায়" (তথ্যসূত্র: জগন্নাথপুর পৌরসভাধীন ভবানীপুর গ্রামের কবি আবদুল মুকিত মুখতার)। এরপর মাদ্রাসার সামনেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

কবরের মাটিতে আতরের খুশবো: লাশ কবরস্থ করার পর এক আশ্চর্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। কবর থেকে বেরিয়ে আসলো আতরের ঘ্রাণ। ভক্তরা মাটি তুলে নিতে লাগলেন। এভাবে বেশ ক'দিন চললো। উল্লেখ্য, হযরত বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের মধ্যে বেশ মিল পাওয়া যায়। উভয়ই ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং উভয়ের কবর থেকে ঘ্রাণ বেরিয়েছে ও অনেকে মাটি নিয়েছেন। এছাড়া উভয়ের মৃত্যু-দিবস ছিলো ঈদুল আযহার রাত। (আমরা যাদের উত্তরসূরী- হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান)

জ্ঞানের গভীরতা: হযরত বায়মপুরী সাহেবের ইন্তিকালের কিছুদিন পর সিলেট শহরের জামে মসজিদে এক শোক সভায় হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সিলেট বিভাগের যতো আলিম রয়েছেন তাদের সবার ইলম একত্রিত করলেও হযরত মাওলানা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইলমের সামনে এই বলা চলে যে, মাওলানার হাঁটু পানিতে সবাই সাঁতরাতে পারবে।" হানাফী মাযহাবের উপর হযরতের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক একটি ঘটনার কথা শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত সভায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "একদা আমরা একত্রে পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা

শরীফ গমন করলাম। সেখানে মসজিদুল হারামে বসে এক আরবী আলিমের কণ্ঠে ওয়াজ শ্রবণ করছিলাম। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সেই ওয়ায়েজ হানাফী মাজহাবকে কিছুটা কটাক্ষ করে বসলেন। সাথে সাথেই হযরত মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একজন আরবের মতো সুন্দর আরবী ভাষায় বক্তব্য শুরু করে দিলেন। দীর্ঘ ঘণ্টা খানেক তিনি হানাফী ফিকহের উপর বয়ান করলেন। এতে ঐ আলিম তার নিকট হার মানলেন। ঘটনার সংবাদটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর অসংখ্য মানুষ মাওলানাকে দেখতে আসলেন।”

রানাপিং আরবিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা রিয়াছত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা হাদীসের দরসের সময় উক্তি করেছিলেন, “আমাদের দেশে বড় আলিমদের মধ্যে হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম।”

খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার গহরপুর মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের মাত্রা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “সমস্ত পাকিস্তান নহে বরং আমার মতে সমস্ত বিশ্বে যে কয়েকজন হাদীসের খাদিম রয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষ খাদিম বা হাদীস বিশারদ হচ্ছেন হযরত বায়মপুরী সাহেব।”

হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার ভাষাবিদ ও পণ্ডিত মরহুম ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বাসগৃহে মেহমান হয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা থেকেই হাদীস শাস্ত্রের উপর মাওলানার গভীর জ্ঞানের পরিচয় মিলে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রানাপিং মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা হাফিজ জাওয়াদ সাহেব বলেন, “একবার ঢাকায় ডঃ শহীদুল্লাহর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং হযরত বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের উপর আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব কোন এক বিষয়ের সমর্থনে প্রায় ৫০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। প্রতিউত্তরে বায়মপুরী সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে উসূলে হাদীস অনুযায়ী প্রতিটি হাদীসের বর্ণনাকারী, উদ্দেশ্য, সত্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় এভাবে সুন্দর বর্ণনা শ্রবণ করে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব মন্তব্য করলেন, “আমি মোটেই জানতাম না যে, পাকিস্তানে হাদীস শাস্ত্রের উপর পারদর্শী এমন একব্যক্তি রয়েছেন।” এরপর শহীদুল্লাহ সাহেব হযরতকে তাঁর বাসভবনে দাওয়াত দেন- হযরত তা সানন্দে গ্রহণও করেছিলেন। (মাসিক মদীনা)

মুজতাজাবুত-দাওয়াত: হযরত মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে মুজতাজাবুত-দাওয়াত তথা 'দু'আ কবুল হয়' এমন ওলি ছিলেন তার দু'টি প্রমাণ এখানে তুলে ধরছি। ওলিয়ে কামিল, মুর্শিদুল আমীন, শাইখুল মাশাইখ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: একদা আমি হযরত মুশাহিদ সাহেবকে কাতিয়া মাদ্রাসায় দাওয়াত করে নিয়ে আসলাম। তাঁকে আনার উদ্দেশ্য ছিলো দু'আ করানো। কারণ, কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গনের ফলে আমার মাদ্রাসার ভীষণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। হযরত মাওলানা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে নিয়ে এক দীর্ঘ দু'আ করলেন। এরপর মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই কুশিয়ারা নদী অন্তত দেড় কিলোমিটার দূরে সরে যায়।

কানাইঘাট মাদ্রাসার বর্তমান শাইখুল হাদীস ও আল্লামা মুশাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র হযরত মাওলানা আলিমুদ্দীন দুর্লভপুরী দামাত বারাকাতুহুম বর্ণনা করেন: একদা লক্ষ্য করা গেল সুরমা নদীর ভাঙ্গনের ফলে কানাইঘাট মাদ্রাসার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে। আমি হযরতের সাথে ছিলাম। তিনি নদীর পারে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দু'আ করলেন। সুবহানাল্লাহ! কিছুদিনের মধ্যেই নদীটি বেশ দূরে সরে পড়লো।

আমরা মহান দয়ালু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে সবিনয় দু'আ প্রার্থনা করছি: হে মহান আরশের অধিপতি! আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। একমাত্র আপনার সন্তুষ্টিকল্পে আমরা ক'জন গুনাহগার আপনার এই মহান ওলির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-ফুরক্বানের' বঙ্গানুবাদে হাত দিয়েছি। আমাদের ভুল-ত্রুটির প্রতি আপনি ক্ষমার দৃষ্টি রাখবেন এটাই কামনা। আর আপনার বান্দা হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দারাজাত বুলন্দ করুন, তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন, তাঁর রূহানী ফায়জ দ্বারা আমাদেরকে মালামাল করুন এবং কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে এই বঙ্গানুবাদখানা আমাদের জন্য নাযাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দিন। আ-মিন, ছুম্মা আ-মিন।

(**তথ্যসূত্র:** 'আমরা যাদের উত্তরসূরী'- হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। 'আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী (রহঃ) জীবন ও চিন্তাধারা'- অধ্যাপক মাওলানা মুহিববুর রহমান। 'জামিউল উলূম শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা'- ছাত্র সংসদ, গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্রাসা। মাসিক মদীনা।)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রারম্ভ : আসমায়ে হুসনা

গোটা জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, পরম দয়া ও করুণাময় সত্তার মহান নাম হল 'আল্লাহ'। এই নামটি স্পষ্টভাবে তাঁর পবিত্র সত্তাকেই বুঝায়। তাছাড়া আরো যত নাম আছে এগুলে হচ্ছে তাঁর সিফাতী নাম, যা মহান আল্লাহর কামালাত ও পূর্ণাঙ্গতার পরিচয়বাহী। তাঁর সত্তা যেমন পরিপূর্ণ, তদ্রূপ কর্মশক্তিতে তিনি পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী। আসলে ইলাহী সত্তার কামালতের কোন অবধি নেই। আর এ জন্যই কোন শেষ নেই তাঁর আসমায়ে হুসনার। অন্যদিকে গোটা বিশ্ব হচ্ছে আল্লাহর কামালিয়াতের নিদর্শন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় আল্লাহর এসব নিদর্শনও হচ্ছে অনন্ত, অশেষ।

আল্লাহ তাআ'লার ঐ অশেষ অনাদি আসমায়ে হুসনা দু'ভাগে বিভক্ত; জামালিয়া ও জালালিয়া। জান্নাত, দারুর রাহমাত, দারুস্সালাম, দারুন্নুর হল জামালিয়া নামের প্রতিবিম্ব। আর জাহান্নাম, দারুয্যুলমাত এবং দারুল-ইকাব (শাস্তির ঘর) হল জালালিয়া নামের পূর্ণ প্রতিরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই হল প্রকৃত মাহবুবের জামাল ও জালাল তথা আসমায়ে হুসনার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ -'আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন।' অর্থাৎ আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যেন তাঁর মধ্যে আল্লাহর সিফাত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানে 'তাঁর আকৃতিতেই' কথাটির কয়েকটি মর্ম হতে পারে। ১. তাঁর গুণাবলীর উপর যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়:

كذا المسئلة صورة 'বিষয়টির বৈশিষ্ট্য অনুরূপ' ২. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নামাবলীর বিকাশের জন্য তাঁর মনোনীত গঠন দিয়ে সৃষ্টি করলেন। ৩. আল্লাহ তাঁর মনোনীত আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। আর এখানে সম্মানার্থে বলা হয়েছে আল্লাহর আকৃতি। যেমন বলা হয় بيت الله 'আল্লাহর ঘর', روح الله 'আল্লাহর আত্মা' । আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

-"যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো" (ছোয়াদ (৩৮) : ৭১-৭২)

মানুষ এমন এক সৃষ্টি যাদের একদল অহংকার, বড়ত্ব এবং ঔদ্ধত্যে মত্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে أنا ربكم الأعلى -"আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা"র শ্লোগান দিচ্ছে, আর পরকাল জীবনে জাহান্নামীদের নেতার উপাধি লাভ করছে। পক্ষান্তরে তাদের মাঝে এমনও লোক আছে যে একদম ডুবে আছে তাঁর একত্ববাদে, তিনি ছাড়া অন্য সবকিছু যেন তাঁর সামনে বিলুপ্ত, অস্তিত্বহীন। সে নিমগ্ন তাঁর প্রেমে, দিবানিশি তাঁরই উপাসনায় মত্ত, সে তো উদগ্রীব কিভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে দেহ-মন, অর্থ-সম্পদ সবকিছুই যেন কুরবান করে দিবে। যেসব কাজ, কর্ম ও বিশ্বাস তার মাহবুবের কাছে নিন্দনীয়, এ সবই তার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য। আর প্রেমাস্পদের পছন্দসই বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের আলোকে নিজেকে করে তুলে সুশোভিত। আল্লাহর প্রেম ও ভক্তি হল তার প্রাণের প্রাণ। আল্লাহর সাথে গড়ে ওঠে প্রেমময় ভক্তির সম্পর্ক। কবি বলেন:

"নিরাকারের মিলনের নাই কোন জ্ঞান, মহাপ্রভু হবেন যখন তোমার প্রাণের প্রাণ।"

থাকুক সে মাসজিদে কিংবা বাজারে, বনে-জঙ্গলে কিংবা বাড়িতে, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথেই থাকে।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

-"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক" (হাদীদ (৫৭) : ৪)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সে মনোনিবেশের যোগ্য মনে করে না। সে যা কিছু করে, শুনে, দেখে এবং বলে সব একমাত্র তাঁরই জন্য। তার চলা-ফেরা, দেওয়া-নেওয়া, প্রেম-ভালবাসা ও শত্রুতা সবকিছুই শুধুমাত্র তাঁর তরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

-“যার ভালবাসা বা শত্রুতা, দান করা বা দান না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হবে, তার ঈমানই পরিপূর্ণ” (সুনানে আবু দাউদ ৪০৬১) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

“আল্লাহ তা’আলা বলেন, বান্দাহ্ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নিকটে আসতেই থাকে, শেষ অবধি আমি তাকে ভালবাসি। যখন ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণে পরিণত হয়ে যাই, তা দিয়ে সে শুনতে থাকে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে দেখতে পায়।” (সহীহ বুখারী :৬০২১)

সারকথা, সে মাওলার হয়ে যায়। মাওলা হয়ে যান তার আপন। মহিমাময় রাহমান ও রাহীম মাওলা দান করেন তার প্রতি বিশেষ প্রেমময় দৃষ্টি। খুলে দেন অত্মার কপাট। অন্তরে উদয় হয় আসমায়ে হুসনার। সে অবলোকন করতে থাকে তার প্রেমাস্পদকে হৃদয় নেত্র দিয়ে।

“হাফিজ! হুজুরী হয় যদি তোমার বাসনা, তবে তার সামন থেকে অদৃশ্য হয়ো না। সাক্ষাৎ হবে যখন মাহবুবের, ছোড়ে দাও মায়াজাল এ জগতের।”

প্রকৃত প্রেমিকের উপস্থিতি ও ভালবাসা তার হৃদয়ের অঙ্গে পরিণত হয়। তাঁর আসমায়ে হুসনার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ ও প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা সে এমন শান্তি-আরাম অনুভব করে যে, আরাধনার মিষ্টতা এবং প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি যেন সে আস্বাদন করতে থাকে।

কবির ভাষায়:

“এ বছরই খাকানীর নিকট বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠলো: আল্লাহর সাথে একটিমাত্র মুহূর্ত যাপন, বাদশাহ সুলাইমানের (আ:) রাজত্ব লাভ থেকেও উত্তম।”

হাফিয ইবনে কাইয়্যিম এবং হাফিয ইবনে তাইমিয়া কী চমৎকার বলেছেন: “মু’মিনের জন্য দু’টি জান্নাত; একটি ইহজীবনে অপরটি পরজীবনে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সে যেতে পারবে না পরকালের জান্নাতেও।” পার্থিব জান্নাতে প্রবেশের অর্থ হল আল্লাহর উপাসনা, একত্ববাদ ও প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, তাঁর আসমায়ে হুসনার বিকাশ, দীদার ও নৈকট্য লাভ করা। পরকাল জীবনে জান্নাতের অর্থ হল- তার অতিথিশালায় আতিথ্যলাভে ধন্য

হওয়া। তাঁর দর্শন ও তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

-"হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সŠ্েতাষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (ফযর (৮৯) : ২৭-২৯)

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهر

-"খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে" (ক্বামার (৫৪) : ৫৪-৫৫)

অনুগত বান্দা যদি আল্লাহর সাথে মুনাজাতের মাধ্যমে স্বাদ ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে, তবে এটাই তো যথেষ্ট, যদিও না সে তার সৎকর্মের অন্য কোন বিনিময় লাভ করে। (ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ইমাম যুবায়দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর রচিত 'আলইতহাফ' পৃ: ১২৯, খ: ৮)

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা

আল্লাহকে মুহাব্বাত করার সথে সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ পুণ্যময় সত্তার সাথে তার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার হৃদয় হলো আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুসনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশস্থল। আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে এমন প্রেমময় সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন, যেরূপ সম্পর্ক আর কারো বেলায় হয়নি, হবেও না। ঐশী প্রেমের আকর্ষণে তিনিই প্রেমাস্পদের আসনে অধিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তা থেকে ভালবাসা ও করুণা তাঁর ওপর যে পরিমাণ বর্ষণ করেছেন, তা অন্য কারো উপর করেন নি। তিনিই আবির্ভূত হয়েছেন পৃথিবী জগতে 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' নামে। অর্থাৎ কুল-জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার হৃদয় তার ওপর কুরবান হউক)। তাঁর সাথে আমাদের ভালবাসা কি এ জন্য যে, তিনি অতিশয় সুন্দর ছিলেন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন, বা তিনি হলেন আব্দুল্লাহর তনয়, তিনি একজন বীর বিক্রম কিংবা বুদ্ধিমান?- না, বরং ভালবাসার কারণ একটাই, আর তাহলো আমরা যে আমাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহর পরিচয় পেয়েছি। তিনিই হলেন এই পরিচয় সূত্রের একমাত্র মাধ্যম। লোকদেরকে এক আল্লাহর সোজা পথে আহ্বান করতে তিনি যে সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছেন, তা কল্পনা করা মাত্রই হৃদয় শিহরিয়া উঠে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ

-"আল্লাহর পথে আমি যে পরিমাণ ভয় ও আতঙ্কের সম্মুখীন হয়েছি, অন্য কারোর বেলা এরকম হয় নি। আমি যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, অন্য কেউ এরকম পায় নি। আমার উপর ত্রিশদিন এমনভাবে অতিক্রম হয়েছে যে, আমি ও বিলালের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবারই জুটেনি। কেবল এটুকু মিলেছিল যা বিলালের বগলের মধ্যে সঙ্কুলান হতো।" (তিরিমিযি : ২৩৯৬)

ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীস সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনায় বলেন: ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়িফ গিয়ে সেখানকার দলপতির নিকট সাহায্য চাইলেন, তাকে দওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সে বখাটে ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করলো। তাঁর উভয় পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে পড়লো। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর প্রসিদ্ধ মুনাজাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন: “হে আল্লাহ! আমার শক্তি ও কৌশলের দুর্বলতা এবং মানুষের মধ্যে হীনতার অভিযোগ একমাত্র তোমার কাছেই করছি। হে করুণাময়ী! যদি আমাকে শত্রুর ওপর ছেড়ে দাও, এতে যদি তুমি রাজি থাক তবে আমার কোন পরওয়া নেই। তোমার আফিয়ত ও করুণা আমার জন্য সুবি¯তৃত। তোমার যে নূরে উদ্ভাসিত হয়েছে আকাশ, আধার হয়েছে দূরিভূত, তোমার গযব থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি সেই নূরের। তোমার ক্ষমতা ছাড়া আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।”

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা’আলা পাঠিয়েছেন পথের আলো বানিয়ে। সাথে সাথে তার সত্যিকার প্রেমিকদেরকে জানিয়ে দিলেন, বাস্তবে যদি তোমরা আমার অন্বেষণে থাক, আমার ভালবাসা চাও, তাহলে হযরত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর, অনুকরণে পূর্ণতা অর্জন কর, তবেই তোমরা আমার মুহাব্বাত লাভে ধন্য হবে। পৌঁছে দেব তোমাদেরকে মুহাব্বাতের স্তরে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।” (ইমরান (৩) : ৩১)

আল্লাহ্ তা’আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

-"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক সδরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (আহযাব (৩৩) : ২১)

হে আমার অন্বেষীরা! আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাদের জন্য নমুনা বানিয়ে প্রেরণ করেছি। তার পূর্ণ শরীয়ত, হিদায়াত, আদর্শ ও জীবনেতিহাস তোমাদের জন্য সংবিধান।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

-"বলে দিন: এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুজে দাওয়াত দেই।" (ইউসুফ (১২) : ১০৮)

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, দেখ আমি এক। আমার রাস্তা একটি। সুতরাং আমার প্রিয় নবীর পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে না পাবে আমার সন্ধান, না নসীব হবে সায়র ফিল্লাহ্ (আল্লাহর পথে) চলার সৌভাগ্য। আর না তোমাদের হৃদয়ে আসমায়ে হুসনার বিকাশ হবে, আর না আমার সান্নিধ্য অর্জন হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা দিয়েছেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

-"নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে; তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।" (আনআম (৬) : ১৫৩)

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ*صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

-"নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহর পথ নভোণ্ডল ও ভূণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই; শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।" (শুরা (৪২) : ৫২-৫৩)

দেখ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সবকিছু। আমি তাঁর হৃদয়ে আমার কালাম অবতীর্ণ করেছি।

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ*عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

-"বিশ¡স্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।" (শু'আরা (২৬) : ১৯৩-১৯৪)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

-"এবং (মুহাম্মাদ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।" (নাজম (৫৩) : ৩-৪)

সারকথা, তরীকত, হাক্বিকাত, মা'রিফাত, সুলুক, তাসাওউফ এবং ইলমুল ইহসান ইত্যাদির অর্থ হল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পদে পদে অনুসরণ করে চলা, অনুসরণের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা অর্জন করা।

রিয়াযত, মুজাহাদা, আর আত্মশুদ্ধির মর্ম এ নয় যে, মানুষ তার মানবীয় শক্তির সাথে লড়াই করে একে অর্থহীন বানিয়ে রাখবে। প্রথমত এ রকম যুদ্ধে সফলতা আসলেই অসম্ভব। দ্বিতীয়ত এ যুদ্ধ তো মূলত এই শক্তির সৃষ্টিকর্তার সাথেই হবে। সুতরাং সঠিক অর্থ হল, মানুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরিয়তের উপর চলে মানবীয় শক্তির পরিমার্জন ও পরিশুদ্ধি আনয়ন করবে। তার শক্তিকে অতিরঞ্জন ও অতি শিথিলতা থেকে রক্ষা করবে। মধ্য পন্থা অবলম্বনে সদা-সর্বদা প্রচেষ্টা চালাবে। একেই বলে ইস্তিকামাত (إستقامت) তথা দৃঢ়তা ও অবিচলতা।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا*وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

-"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (মায়িদা (৫) : ৩-৪)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ *نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

-"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু।" (হ-মীম সিজদাহ (৪১)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

-"বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।" (হা-মীম সিজদাহ (৪১) : ৬)

তাসাওউফ: মর্ম ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

তাসাওউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য হল বান্দাহর হৃদয়ে যেন আল্লাহর সাথে প্রেম ও ভক্তিময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদ্বরুন তার হৃদয়ে অনুভব হবে এক আল্লাহর সঙ্গ ও উপস্থিতি। আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকবে অন্তর চোখ দিয়ে। দেহ, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভূত হবে একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য, প্রেম ও ভক্তির রাজত্ব। পুষ্পের ঘ্রাণ কিংবা দুধের ঘি'র মত হৃদয়ে বয়ে যাবে আল্লাহর আসমায়ে হুসনা। আল্লাহর ইবাদতে সে থাকবে অবিচল ও অটল। আল্লাহর ইবাদাতই হবে তার কাছে সবচেয়ে বেশী তৃপ্তিকর। তৃষ্ণার্ত লোকের কাছে শীতল পানি যেমন সুস্বাদু তদ্রূপ আল্লাহর উপাসনা, স্মরণ, ধ্যান ও প্রার্থনার মিষ্টি ও স্বাদ হবে তার কাছে খুবই তৃপ্তিকর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ذَاقَ طَعْم الْإِيمَان مَنْ رَضِيَ بِاَللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا

-"যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে নিল, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করলো"। (সহীহ মুসলিম :৪৯) হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

-"যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে: ১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই হবেন তার কাছে সর্বাধিক প্রেমময়, ২. সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং ৩. অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া যেমন কষ্টকর তদ্রূপ কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার জন্য কষ্টকর।" (সহীহ বুখারী :(১৫) মুসলিম)

এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "হে আল্লাহ্! আপনার ভালবাসা আমার নিজের চেয়ে, পরিবারের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিকতর করে দিন"। হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর একটি কথা: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের প্রেমের মজা আস্বাদন করতে পারবে, দুনিয়া থেকে সে তার মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে গোটা জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে"।

সব উদ্দেশ্যের মূল

এই নিসবতের মূল উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা। তাঁর আনীত শরীয়ত অনুসরণ করে পরিপূর্ণতা লাভ করা। মোটকথা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই হল তাসাওউফের চরম ও শেষ উদ্দেশ্য।

যে ব্যক্তি উল্লেখিত নিসবত অর্জনে সক্ষম হবে, তার কাছে মনে হবে ঈমান এবং ইসলাম এক, অভিন্ন বিষয়। ঈমানের জ্যোতি তার হৃদয়ে শক্তিময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। সৎকর্মের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা প্রবল হয়। তার প্রাণের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে যায় ইবাদতের আত্মা। আর ঈমান ও সৎকর্মের আলো একই স্থানে এসে আত্মপ্রকাশ করে। এরূপ অবস্থা অর্জন হলেই, তার কাছে ঈমানকে

সৎকর্ম থেকে পৃথক করে নেওয়া কঠিন বোধ হবে। এ ব্যক্তির কাছে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম এত ব্যাপক-বিস্তৃত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ শরীয়ত, তথা আক্বিদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, আদর্শ-চরিত্র, লেন-দেন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ইসলাহী কার্যক্রম- সবকিছুই এই পবিত্র কালিমার মর্মাধীন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

-"তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন: পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত, তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।" (ইব্রাহীম (১৪) : ২৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ

-"ঈমানের শাখা হলো ষাটের অধিক। সবচেয়ে উচ্চ শাখা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' কালিমাটি এবং সর্বনিম্ন স্তর হলো রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করা। আর হায়া ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারী, সহীহ মুসলিম : ৫১)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ لَقِيك مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْجِدار يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

"এই প্রাচীরের পেছন থেকে যে ব্যক্তিই তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে যদি অন্তরের বিশ্বাসসহ একথা বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" (সহীহ মুসলিম) উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের সঠিক মর্ম তার হৃদয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের মধ্যকার বিভিন্ন বাহ্যিক দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে যায়। শরীয়তের পরিভাষায় এই নিসবতকে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়। যেমন: শরহে সদর (হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া): নূরে রাব্বানী (পালনকর্তার আলো), সাকিনা (প্রশান্তি), রাবতুল ক্বালবি বিল্লাহ (আল্লাহর সাথে হৃদয়ের বন্ধন) ইত্যাদি।

এমন ব্যক্তির ভাগ্যেই বাস্তবিক ঈমান, পরিপূর্ণ তাকওয়া, জয়ের স্তর ও খাস ওলায়াত অর্জন হয়।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

-“আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন§ুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে।” (যুমার (৩৯) : ২২)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

-“তিনি মু’মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়।” (ফাতাহ (৪৮) : ৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ

-“লোকজন যখনই কোন ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন ও তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ হয়। করুণা তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আর তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন ফিরিশতারা।” (সহীহ মুসলিম :৪৮৬৭)

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى*وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

-“তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এবং আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম।” (কাহাফ (১৮) : ১৩-১৪)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ*الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

-“মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তানি¡ত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।” (ইউনুস (১০) : ৬২-৬৩)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

-“যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন।” (মারইয়াম (১৯) : ৯৬)

নিসবত কী

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সকল মাশায়িখের তরীকা ও পদ্ধতির শেষ উদ্দেশ্য হল নিসবত অর্জন করা। আধ্যাত্মিকতার বিশেষ একটি অবস্থাকে নিসবত বলা হয়। 'যাদুত-তাকওয়া' গ্রন্থে নিসবত এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রকৃত মা'বুদের পবিত্র সত্তার পরিচয় লাভ ও চেনার বরকতময় মাধ্যম হল 'আল্লাহ্'। প্রকৃত অর্থে, যাতে মুকাদ্দাছ বা পবিত্র সত্তাই হল এই 'আল্লাহ' শব্দের উদ্দেশ্য। যিনি একক। অনুপম ও অতুল্য। অন্তর যখন এই যাতে মুকাদ্দাছ এর প্রতি মনোনিবেশ থাকার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়, আল্লাহ্ আয্যা ও জাল্লাহ'র সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক হয়ে যায়। আর এই সম্পর্কটা অন্তরের একটি গুণে রূপ লাভ করে। অন্তর থেকে তা কভুও যেন বিচ্ছেদ হয় না। তখন ঐ মালাকা বা যোগ্যতাকে নিসবত বলা হয়।

তিনি অন্যত্র লিখেন: এটা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তিনি তার স্মরণকারীর উদ্দেশে অবতরণ করেন, কাছে আসেন, তার অন্তর একদম ভরে দেন, অন্য কোন বস্তুর জন্য একটুও জায়গা খালি রাখেন না। অর্থাৎ আল্লাহর আভা ও জ্যোতিতে অন্তর ঝলমল করে ওঠে। সে তখন একমাত্র আল্লাহকেই দেখতে পায়।

তিনি (শাহ ওয়ালীউল্লাহ) অন্যত্র বলেন, মুশাহাদা হলো সুলুক তথা 'সায়র ইলাল্লাহ'র (আল্লাহর দিকে ভ্রমণের) মাকসাদ। আর সেখান থেকেই প্রারম্ভ সায়র ফিল্লাহ (আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ)। যার লক্ষ্য হল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসারী হয়ে যাওয়া।

টিকা: আল্লাহ্ পাকের 'অবতরণ', 'আগমন', 'নিকটে আসা' আমাদের অবতরণ, আগমন, নিকটে আসার মত নয়। বরং এসব গুণ আল্লাহর শান অনুযায়ী বিবেচ্য। "আমরা আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান এনেছি"।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

-"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, এবং তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" (শুরা (৪২) : ১১)

প্রতিবন্ধকতা অধ্যায়

তালিবে সাদিকের জন্য সুলুক, মা’রিফাত ও তরীকতের উদ্দেশ্য কী, তা পরিস্কারভাবে জেনে নেওয়া উচিত। যাতে করে যা লক্ষ্য ও যা লক্ষ্য নয়- এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করে নেওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য নয় এমন বিষয়কে উদ্দেশ্য মনে করে যেন এর প্রতি মনোযোগী না হয়। কেননা এটা এক প্রকার গ-মূর্খতা, আর হতভাগা হওয়ার একটি বড় পথ। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে উপরে যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে। সার-সংক্ষেপ এটুকু জেনে রাখা উচিত, উপর্যুক্ত মাকসাদ ছাড়াও কিছু হাল প্রকাশ পাবে। ‘হাল’ কখনও মূল মাকসাদ নয়, আর এটা মনোযোগ পাওয়ার মতও কোন বিষয় নয়। হ্যাঁ, লক্ষ্য অর্জনে যদি হালের দ্বারা শক্তি পায়, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মাকসাদ ত্যাগ করে এর প্রতি মন দেওয়া যাবে না। কারণ এটা পথের জন্য একটি আড়াল। এ আড়ালে মাকসাদ সাথে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন, ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা, প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় উন্মোচন হওয়া, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন কিছু দেখে ফেলা, কোন ফিরিশতাকে দেখা, কবর জগত দৃশ্যমান হওয়া, দু’আ কবুল হয়ে যাওয়া কিংবা কোন কারামত প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। উল্লেখিত কোন একটিও মাকসাদ নয়। হ্যাঁ, এগুলো আল্লাহ পাকের নিয়ামত। অর্জন হলে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে না। তালিবে সাদিক ও সত্যিকার অন্বেষী যদি ‘হাল’ অর্জনে আনন্দ পায়, আর অর্জন না হলে দুঃখবোধ করে তবে নিঃসন্দেহে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূর সরে পড়বে। তালিবে সাদিককে এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত, যদি আমি উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হই, ফলশ্রুতিতে আমি ঈমানে তাহকিকী, মাকামে তাওবাহ, সবর ও ধৈর্য, ইখলাস ও নিষ্ঠা, রিযা ও সন্তুষ্টি, তাওহিদ ও প্রেম ভালবাসায় পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ হতে পারি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতে পারি, তাহলে তো এটাই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে আমার উপর সবচেয়ে বড় নিয়ামত। সবচেয়ে বড় করুণা ও সম্মান। হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ উম্মাহর অন্যান্য মনীষীগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ইস্তিকামাত (অবিচলতা) হল তালিবে হকের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সবচেয়ে বড় কারামাত। অন্য প্রকার

কারামাত থেকে বঞ্চিত থেকেও যদি এটা অর্জন করে নেয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, যদি ইস্তিকামাত অর্জন না হয়, এর বদলে তার মধ্য থেকে অন্যান্য কারামত প্রকাশ পেতে থাকে, তখন সে ধ্বংসই হয়ে গেল। সে বঞ্চিত থাকলো তার মাকসাদ থেকে।

মনীষীগণের কাছে, ইস্তিকামাতের মর্ম হল সমূহ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা, দীনি ও পার্থিব কর্মকাণ্ডে সীরাতে মুস্তাকিম অবলম্বনকে জরুরী মনে করা। (আল-ইতহাফ ৮ম খণ্ড, পৃ:১৩)

মূর্খ, আলিম ও আ'রিফের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর সত্তার মধ্যে গবেষণা করে তাঁকে চেনা যাবেনা। এটা সৃষ্টির জন্য অসম্ভব। তাই তাঁকে চিনতে হবে তাঁর নাম ও সিফাতের সাহায্যে। (ইতহাফ) আল্লাহর নাম ও সিফাতের পরিচয় লাভের তিনটি পথ: ১.তাকলীদ (অনুকরণ), ২. ইস্তিদলাল (চিন্তা ও গবেষণা) এবং ৩. মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ করা)। তৃতীয় পন্থাকে এ শাস্ত্রের আলিমগণ মা'রিফাত নামে অভিহিত করেন। প্রথম পন্থা হচ্ছে আওয়াম লোকদের জন্য, দ্বিতীয় পন্থা হল আলিমদের জন্য আর তৃতীয় পন্থা হল আ'রিফীনদের জন্য। আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাফসীরে বায়যাওয়ি'র টীকায় লেখেন: "আরিফ হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের যাত, সিফাত ও কর্ম দেখিয়ে দেন"।

উল্লেখিত তিন প্রকার পথ অর্জন করাকে ইল্ম বলা হয়। আর যা অর্জন হয় সেটাকে 'মালুম' বলে। কিন্তু এই তিন প্রকার পথ সাধনার মাধ্যমে জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তিতে যে কাইফিয়াত অর্জন হয়, এর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যেমন 'ঈমানে'র বিষয়টিই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আওয়াম লোকের ঈমান হল 'ঈমানে তাকলিদী'। তার এই ঈমান দ্বারা যে নূর ও কাইফিয়াত (আলো ও অবস্থা) অর্জন হয় এর তুলনা হল চেরাগের আলোর মত- সামান্য একটু বাতাস দিলেই নিভে যায়। আর এজন্য আওয়াম লোক থেকে অনেক সময় শরীয়ত সম্পর্কে উপহাসমূলক মন্তব্য, কুফরী কথা ও কর্ম সংগঠিত হতে পারে। আলিমদের ঈমান হল 'ঈমানে ইস্তিদলালী'। তাদের ঈমান দ্বারা যে নূর ও কাইফিয়াত অর্জন হয় এর তুলনা চলে চাঁদের আলোর সাথে। প্রথমোক্ত আলো থেকে এ আলো অনেকগুণ শক্তিশালী। মেঘমালা দ্বারা সমস্ত দিগন্ত আচ্ছাদিত না

হওয়া পর্যন্ত চাঁদের আলো অদৃশ্য হয় না। আ'রিফীনদের ঈমান হল 'ঈমানে তাহকিকী'। এই ঈমানের আলো সূর্যালোক তুল্য। বাহ্যতঃ সূর্যের আলো চাঁদের আলো থেকে কতইনা শক্তিশালী। এজন্য, আ'রিফীনরা যদিও মা'সুম (আজীবন নিষ্পাপ) নন, কারণ 'ইসমত' একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফিরিশতাদের গুণ, কিন্তু তারা অবশ্যই মাহফুয (সংরক্ষিত)।

ঈমানে তাকলিদী, ঈমানে ইস্তিদলালী ও ঈমানে তাহকিকীর আলোচনা এবং উদাহরণ

মনে করুন জনৈক ব্যক্তি কোন নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে জানতে পারলো যে, মুসকিতী মিষ্টি খুবই সুস্বাদু ও উপাদেয়। লোকটি এই সংবাদের সত্যতা মেনে নিলো কারণ, সংবাদদাতা তার কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য, তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, মুসকিতী মিষ্টি সত্যিই খুবই সুস্বাদু ও উপাদেয়। কিছুদিন পর সে এই মিষ্টি বিষয়ক একটি গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেল। এতে উক্ত মিষ্টির স্বাদ, উপাদান এবং এর প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থ পাঠের পর তার মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে, বাস্তবেই মুসকিতী মিষ্টি সুস্বাদু ও উপকারী। তবে এখন তার বিশ্বাস পূর্বেকার তুলনায় আরোও দৃঢ় হলো এবং মুসকিতী মিষ্টির প্রতি আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেলো। অতঃপর কিছুদিন পর লোকটির মুসকিতী হালুয়া খাওয়ার সৌভাগ্য হল। এবার এই মুসকিতী হালুয়ার স্বাদ ও উপকারিতার উপর তার এমন অটল বিশ্বাস জন্মালো যে, যা পূর্বেকার ইয়াক্বিন থেকেও দৃঢ়তর। সুতরাং, প্রথমোক্ত ইয়াক্বিন হলো 'ঈমানে তাকলিদী', দ্বিতীয়োক্ত ইয়াক্বিন হলো 'ঈমানে ইস্তিদলালী' এবং শেষোক্ত ইয়াক্বিন হলো 'ঈমানে তাহকিকী'র উদাহরণ। আর শেষোক্ত ঈমানে তাহকিকীকেই সুফিয়ায়ে কিরাম 'মা'রিফাত' নামে অভিহিত করেন। এই মা'রিফাত দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মা'রিফাতের শাব্দিক অর্থ দ্বারা ঈমানের অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। বরং এই মা'রিফাতের অর্থ হলো ঈমানের পরিপূর্ণ স্তর।

ইতহাফ গ্রন্থে আছে: "তত্ত্ববিদদের মতে আলিম যখন তার জ্ঞানানুসারে আমল করে, ঐ জ্ঞানকে মা'রিফাত বলা হয়। তাই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই মা'রিফাত শব্দের ব্যবহার হয়। যে নাকি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা ও এর প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তার মধ্যে এমন অবস্থা বিরাজ করে, যা মা'রিফাতের সাক্ষ্য বহন করে। তাদের ভাষায় ঐ ব্যক্তি হলো আরিফ, যে আল্লাহ

তা'আলার নাম, সিফাত ও কর্ম চিনতে পেরেছে। নিজের কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সত্যতা প্রদান করে। একমাত্র তাঁরই জন্যই সংকল্প করে। অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্রতা লাভ করে। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে। প্রজ্ঞার সাথে দ্বীন ও ঈমানের তাবলীগ করে। দ্বীনের প্রচারে মানুষের মত, যুক্তি ও বুদ্ধির পরোয়া করে না। মানুষের মত ও যুক্তির সাথে আল্লাহর রাসূলের আদর্শের কোন তুলনা করে না। আর এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি আরিফ নাম ধারণের উপযুক্ত"।

ইলমুল ইয়াক্বিন, আইনুল ইয়াক্বিন এবং হাক্কুল ইয়াক্বিনের মধ্যে পার্থক্য

যে জ্ঞান সম্পর্কে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে না সেটাই হচ্ছে ইলমুল ইয়াক্বিন। আইনুল ইয়াক্বিন হলো সেই জ্ঞান যা হৃদয়ে বার বার জাগ্রত হয়; এবং তা খুব অল্প বিস্মৃত হয়। আর হাক্কুল ইয়াক্বিন হলো ঐ জ্ঞানের নাম যার দ্বারা জ্ঞাত সত্তার প্রত্যক্ষ দর্শন অর্জন হয়। জ্ঞাত সত্তা আপন গুণাবলীসহ অন্বেষকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। তখন এই জ্ঞানান্বেষী লোকটি তার গুণাবলী দর্শনের মধ্যে একদম নিমগ্ন থাকে। সে তার এই পরিচিত ও জ্ঞাত সত্তার দর্শন, প্রেম, উপভোগ এবং এই সত্তার সাথে কানকথায় এমন বিভোর হয় যে, হৃদয়ে এই সত্তা ছাড়া আর কোন কিছুরই চিন্তা স্থান পায় না। এই পরম সত্তার প্রেম, ভালোবাসা ও দর্শন তার আত্মার আত্মায় পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে হৃদয়ে তাওহীদ, তাওবাহ, ইনাবাত (প্রত্যাবর্তন), ইখলাস (নিষ্ঠা), কসর-খুযু (বিনয়), রিযা (সন্তুষ্টি) অন্বেষণ, মুহাব্বাত (প্রেম), উবুদিয়াত (উপাসনা) এবং অন্যান্য উচ্চস্তরের মাক্বাম ও প্রসংশিত গুণ সৃষ্টি হয়ে যায়। উপাসনার আত্মা তার হৃদয়ে আলোকপ্রদ হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাহবুবের আনুগত্যের আকর্ষণ এতো তীব্র হয় যে, মাহবুবের আনুগত্য তার নিকট সবচেয়ে বেশী মধুময় অনুভূত হয়। এমনকি মাহবুবের আনুগত্যে তার জীবনকে বিপদে ফেলে দেওয়া এবং অর্থ সম্পত্তি ব্যয় করা তার জন্য খুবই সহজ কাজে পরিণত হয়।

"হে আমার হৃদয়! নন্দিত হও, ইশকের বাজারে মস্তক বিচ্ছিন্ন হবে। যদিও দীদার লাভের প্রতিজ্ঞা নেই কিন্তু মৃত্যুর তো প্রতিশ্রুতি আছে।"

মূলত হাক্কুল ইয়াক্বিন হলো একটি বৃক্ষের কাণ্ড পর্যায়ের। মাক্বামাত, আখলাকে হামীদাহ ও সুন্দর চরিত্র এবং মালাকাতে ফাযিলা ও উত্তম যোগ্যতা হলো ডালের পর্যায় এবং আমালে সালিহা ও সৎকর্ম হল ফল ও ফুলের পর্যায়ে; এই স্তরকে

শরীয়ত ও সুন্নাহর অনুসরণের পূর্ণাঙ্গ স্তর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আর এটাই হলো এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। যাকে বলে ‘ঈমানে তাহকিকী’। এই স্তর অর্জন করে নিলে মাওলার সাথে বান্দার একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যাকে বলে ‘নিসবত’ ও ‘ইয়াদ দাশত’। এমন স্তরে উপনিত বান্দার হৃদয়কে আল্লাহ তা’আলা তাঁর আসমায়ে হুসনার উদয়স্থল বানিয়ে দেন। এটাকেই বলে ‘শরহে সদর’। আল্লাহ পাক তার উপর সাকীনা ও শান্তি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় আসমায়ে হুসনার সাথে বান্দার হৃদয়কে সম্পৃক্ত করে দেন। সর্বাবস্থায় এবং বিশেষকরে নামাযের মধ্যে বান্দা যেনো তার মাওলাকে মুশাহাদা করতে থাকে।

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

-“তুমি এমনভাবে আল্লাহর উপাসনা করো যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো আর যদি না দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই স্তরের ভেতরে আরোও হাজারো স্তর আছে। একটি অন্যটির চেয়ে উপরের। সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, “মারাতিবে কুরবেরা পায়ায়ে নেস্ত” অর্থাৎ, “নৈকট্য লাভের স্তরসমূহের কোন সীমা নেই”।

আলিম ও আ’রিফের মধ্যে পার্থক্য

জেনে রাখা আবশ্যক, জ্ঞাত বিষয়াদির দৃষ্টিতে আলিম ও আ’রিফের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঈমান, নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত এবং জিহাদ তথা ইসলামের প্রত্যেকটি ফরয ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে আলিম ও আ’রিফ সমান। একদল মূর্খ লোক মনে করে, আ’রিফের জন্য বাহ্যিক নামাযের কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতামূলক। এই সমস্ত লোক কাফির, মুশরিক, মুলহিদ এবং জিন্দিক। মূলত আ’রিফ আলীমের চেয়েও ইসলামী শরীয়তের বেশী অনুসারী। তিনি শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ স্তরে উপনীত। তবে আলিম এবং আ’রিফের মধ্যে কাইফিয়াতে ক্বালবিয়া তথা আধ্যাত্মিক অবস্থার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য আছে। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের আলোকপাত করছি।

১. আলিমের ঈমান হলো ইস্তিদলালী ও প্রামাণিক এবং আ’রিফের ঈমান হলো তাহকিকী ও প্রত্যক্ষমূলক।

২. আলিমের ঈমান বাহির থেকে অর্জিত হয় আর আ'রিফের ঈমান তার হৃদয় থেকে উতলে বের হয়।

৩. আলিম তার মাওলাকে আসমায়ে হুসনার মাধ্যমে জানে এবং আ'রিফ তার মাওলাকে আসমায়ে হুসনার মাধ্যমে পেয়ে যায়। আ'রিফ তার মাওলার হুজুরী (উপস্থিতি), বেকায়িফ মুশাহাদা (আকৃতিহীন প্রত্যক্ষ), কুরবত, মা'ইয়াত (সান্নিধ্য), তাজাল্লি (উদয়) ইত্যাদির জ্ঞান তার কাছে এমনভাবে অনুভূত হয় যেভাবে পিপাসু লোকের কাছে পিপাসা, ক্ষুধার্তের নিকট ক্ষুধা, আনন্দিত লোকের কাছে আনন্দ এবং চিন্তিত লোকের চিন্তা-পেরেশানী অনুভব হয়।

৪. আলিম নামাযের অবস্থায় জানতে পারে সে তার মাওলার সামনে আছে এবং আ'রিফ মুশাহাদার মাধ্যমে তার মাওলার উপস্থিতি দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

-"তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেমন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

৫. আলিম পাঠ ও পঠনের মাধ্যমে শরীয়ত এবং এর রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে। আ'রিফের হৃদয়ে রিয়াযত-মুজাহাদার পর ইলাহী জযব ও আকর্ষণে শারীয়তের জ্ঞান, তত্ত্ব ও রহস্য উন্মোচন হয়ে যায়।

বি:দ্র: আলিমের ইল্ম এবং আ'রিফের মুকাশাফা (অন্তরদৃষ্টি) তখনই সঠিক বিবেচিত হবে যখন তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুকুল হবে। যদি একটি চুল পরিমাণও এর ব্যতিক্রম হয় তবে তা হবে একদম প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই মূল চাবিকাঠি।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

-"তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।" (নিসা (৪) : ৫৯)

ক্বালব, রূহ এবং নফসের আলোচনা

ক্বলবের দু'টি অর্থ। প্রথম অর্থ হলো, যে মাংশ খণ্ড বাম স্তনের নীচে অত্যন্ত হিফাজতের সাথে রাখা হয়েছে তা-ই হলো ক্বালব। এই মাংশ খণ্ডই প্রাণী-জীবনের মূল ভাণ্ডার এবং অনুভব শক্তির চাবিকাঠি। এটা নড়াচড়া করে বলেই শরীরের মধ্যে প্রতি ৮ সেকেন্ড রক্তের গতি থাকে। যদি এর স্পন্দন ও চঞ্চলতা বন্ধ হয়ে যায় তবে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এই ক্বলব পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ এই ক্বালব নিয়েই গবেষণা করেন। কিন্তু সুফিয়ায়ে কিরাম এই ক্বালবের প্রণালীগত কোন আলোচনা করেন না। দ্বিতীয় অর্থ হলো, ঐ জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তিকে ক্বালব বলা হয় যা কেবলই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের কারণেই মানুষ মানুষ হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং জ্ঞান ও কর্মের ময়দানে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। মূলত এই শক্তিটাই হলো মানুষের মূল প্রকৃতি। এর দ্বারাই মানুষ সরাসরি আল্লাহর সম্বোধন প্রাপ্ত হয়। ঈমান এবং কুফর তা থেকেই প্রকাশ হয়। এই শক্তিটা 'আলমে আমরের' অন্তর্ভুক্ত। শক্তিটা খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। আকাশ, জমিন এমনকি আরশ-কুরসিও এর সামনে অতি ক্ষুদ্র। মাংশ খণ্ডের সাথে এই শক্তির এমন সম্পর্ক যেমন নাকি শরীরের সাথে রঙ্গের, ফুলের সাথে ঘ্রাণের এবং ইঞ্জিনের সাথে চালকের। দার্শনিকগণ এই শক্তিকে নফসে নাতিক্বা নামে অভিহিত করেন। আর সুফিয়ায়ে কিরামের ভাষায় এটা 'লতীফায়ে রাব্বানিয়া নূরানিয়া' নামে পরিচিত। তাদের সমস্ত আলোচনা মূলত এই ক্বালবকে নিয়েই। যখন রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং বিশ্বাস ও কর্মগত সমস্ত দূর্বলতা থেকে পাক-পবিত্র এবং স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর স্বীয় আসমায়ে হুসনার বিকাশ ঘটান। বানিয়ে দেন তাকে নৈকট্য ও তাজাল্লির দর্পণ। তার প্রতি দান করেন মুহাব্বাত ও ওলায়াতের বিশেষ দৃষ্টি। যদ্বরুন সে প্রভুকে স¡চক্ষে অবলোকন করতে থাকে। তার ঈমান তাহকিকী রূপ লাভ করে। উপভোগ করতে থাকে সে ঈমান ও সৎকর্মের স্বাধ।

মুসনাদে আহমদ ও মু'জামে তাবারানীর মধ্যে একটি হাদীস উল্লেখিত আছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়কে স্বীয় তাজাল্লির আয়না বানিয়ে দেন। তাই সত্য গ্রহণে তাদের হৃদয় কোমল হয় এবং হক্বকে রক্ষার জন্য কঠোর হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার

তাজাল্লির জন্য সর্বপ্রকার দূর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পাক-পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়ে যায়।” সহীহ মুসলিমে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা’আলা মু’মিনের অন্তরকে নিজ করুণা, ভালোবাসা এবং ওলায়াতের দৃষ্টিতে দেখেন।” সহীহ বুখারীতে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক শরীরেই একটি মাংস খণ্ড আছে, যদি এটা পরিশুদ্ধ থাকে তাহলে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ থাকে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীরই বিনষ্ট হয়ে পড়ে- আর এটাই হলো ক্বলব।” হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীর মধ্যে এবং সাইয়্যিদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রূহুল মা’আনীর মধ্যে একথা স্পষ্ট করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাংস খণ্ডকেই ক্বালব বলেছেন। যা হলো ক্বালবের প্রথমোক্ত অর্থ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, লতিফায়ে রাব্বানিয়া নূরানিয়া- যা হলো ক্বালবের দ্বিতীয় অর্থ। যেহেতু উভয়টির মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন রয়েছে- একটি হচ্ছে স্থান ও অপরটি হচ্ছে অবস্থা, তাই প্রথমোক্ত অর্থ উল্লেখ করে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য করেছেন। হে আল্লাহ! এই নগণ্য লেখককে তুমি কবুল করো, আর তোমার তাওহীদ ও মুশাহাদার মধ্যে এই অযোগ্যকে নিমগ্ন রাখো।

টীকা: লতীফায়ে রাব্বানিয়া-নূরানিয়াকে কখনো রূহ আর কখনো নফস বলা হয়। যখন এটা পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় ‘নফসে মুতমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) এবং ‘নফসে তায়্যিবাহ’ (পবিত্র আত্মা)। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত আছে,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

-“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাও।” (ফযর (৮৯) : ২৭-২৮)

মুসনাদে আহমদে আছে: “হে পবিত্র আত্মা! তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বেরিয়ে আসো।”

কখনো রূহ দ্বারা জীবাত্মা উদ্দেশ্য হয়। অধিকাংশ সময় নফস দ্বারা মানুষের অসৎকর্ম উদ্দেশ্য করা হয়। মূলত এর উৎস স্থল হচ্ছে জীবাত্মা। আর কখনো এই নফসকেই নফসে আম্মারা বলা হয়। আল্লাহ তা’আলাই সর্বজ্ঞ।

জয্ব, সুলুক, আউলিয়ায়ে রাহমান এবং আউলিয়ায়ে শয়তানের সবিস্তর আলোচনা

প্রথমত জেনে রাখা উচিত, জয্বের শাব্দিক অর্থ হলো আকর্ষণ করা, টেনে নেওয়া। আর পরিভাষায় ঐশী আকর্ষণকে জয্ব বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি মু'মিন হিসাবে বিবেচিত হবে, সে রব্বানী জযব ও আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত নয়। তবে ঈমানে তাহকিকী এবং পরিপূর্ণ তাকওয়া কেবল জযবে কামিলের ফলশ্রুতি। কিন্তু জয্বে কামিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং যাদেরকে আমরা প্রকৃত মাজযুব হিসাবে বিশ্বাস করি, তাঁরা হলেন একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমু-স্সালাম। আর মাজযুবদের সর্দার হলেন, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম। শরীয়তের পরিভাষায় এই জযবে কামিলকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়: যথা:-

১. রাবতুল ক্বালবি বিল্লাহ: আল্লাহর সাথে হৃদয়ের বন্ধন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِم وَزِدْنَاهُمْ هُدًىوَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

-"তারা ছিল কয়েকজন যুবক তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল অতঃপর তারা বলল: আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা, আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না; যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।" (কাহাফ (১৮) : ১৩-১৪)

২. ইনজালুস সাকীনা - শান্তি বর্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

-"তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়।" (ফাতাহ (৪৮) : ৪)

৩. শরহে সাদর - হৃদয় উন্মোচন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

-"অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উনŞ্ুক্ত করে দেন।" (আনআম (৬) : ১২৫) এবং ৪. ইসতিফা ও ইজতিবা - নির্বাচন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

-"আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত।" (ছোয়াদ (৩৮) : ৪৭)

আউলিয়ায়ে রাহমানের দু'টি দল: ক. মাজযুবে সালিক, খ. সালিকে মাজযুব। প্রথমে এ আলোচনা হয়েছে যে, মু'মিন যখন রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তার হৃদয়কে পবিত্র ও পরিষ্কার করে নেয় তখন তার মধ্যে নিসবত সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার তাজাল্লির আয়নায় পরিণত হয়ে যায়। এখন জানা উচিত, কোন কোন মু'মিনের হৃদয় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সৃষ্টিগতভাবেই অসৎ চরিত্র থেকে পাক ও পবিত্র থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই মু'মিনকে কোন মুর্শিদ এবং সুলুক ছাড়াই নিজের দিকে জয্ব করেন (টেনে নেন) তাকে ঈমানে তাহকিকী, নিজ নিসবত এবং তাজাল্লি দ্বারা ফায়জিয়াব ও সিক্ত করে দেন। তাকওয়ার কামিল স্তরে উপনিত করেন। কিন্তু এই মু'মিনকেও রিয়াজত-মুজাহাদা এবং সুলুকের মানাজিল ও স্তর অতিক্রম করা চাই। কেননা, একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া আর কেউ মা'সুম নন। সুতরাং উক্ত মু'মিনের মধ্য থেকে পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব আছে। এর ফলে সে ঐশী আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। সুতরাং এই সময় তার জন্য সুলুক ছাড়া আর কোন পথ নেই। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী, তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অধিক হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

-"নবী-রাসূলগণই বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী লোকজন, এরপর তাঁদের নিকটের লোকজন।" (বুখারী) উলামায়ে কিরাম বলেন, "নেক লোকদের সৎকাজও নৈকট্যশীলদের জন্য মন্দ বিবেচিত হয়"।

এই আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম মাজযুব হচ্ছে ঐ মু'মিন যাকে ঐশী প্রেম সঠিক পথের উপর টেনে নিয়ে আসে এবং মুর্শিদ ও সুলুক ছাড়াই তাকে পৌঁছিয়ে দেয় ঈমানে তাহকিকী ও কামিল তাকওয়ার স্তরে। সুতরাং বর্তমান যুগে যারা নিজেকে মাজযুব দাবী করে কিংবা লোকে তাদেরকে মাজযুব বলে, কিন্তু বাস্তবে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শরীয়তের উল্টো। তারা তো কখনো মাজযুবে রাহমানী হতে পারে না বরং মাজযুবে শয়তানী। পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে কিছু লোক আছে, তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, দিনরাত অপবিত্রতার সাথে কাটায় ও বেগানা মহিলাদের সাথে মিলামিশা করে। কিন্তু যেহেতু তাদের সামনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয় উন্মোচন হয়ে যায়, চুরি করা বস্তুর সন্ধান দিতে পারে- এজন্য লোকজন তাদেরকে পীর, অলি, কুতুব ও মাজযুব ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। আরো পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু আলিমও তাদেরকে মাজযুব বলেন এবং তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করেন। আমরা আল্লাহর নিকট পথভ্রষ্টতা ও হীনতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রিয় ভাইয়েরা! কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আউলিয়াদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: ১. আউলিয়াউশ-শাইতান বা শয়তানের বন্ধু। ২. আউলিয়াউর রাহমান বা রাহমানের বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

-"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে"। (বাক্বারাহ (২) : ২৫৭)

আউলিয়ায়ে রাহমানের নিদর্শন হলো, তারা ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ স্তরে থাকবে। তারা ঈমানে তাহকিকী, কামিল তাকওয়া, শরীয়তের উপর অটল থাকা এবং জাহিরী ও বাতিনী পবিত্রতা লাভে ধন্য হবে। রাহমাতের ফিরিশতাদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ*الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

-“মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তানি¡ত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে” (ইউনুস (১০) : ৬২-৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

-“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা যা দাবী কর।” (হা-মীম সিজদাহ (৪১) : ৩০-৩১)

ভাইয়েরা আমার! আওলিয়ায়ে রাহমানরা দিনরাত তো তাদের মাহবুবের সামনে উপস্থিত থাকেন। সুতরাং দুনিয়া এবং এর বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং গায়িবী বিষয়ের উন্মোচন করার সময় কোথায়? তারা তো দিনরাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণে বিভোর। পক্ষান্তরে আউলিয়ায়ে শয়তানদের না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণের ফিকির আছে, না জাহিরী ও বাতিনী তাহারাত অর্জনের ধ্যান আছে, না দুর্গন্ধময় বস্তুর প্রতি তাদের ঘৃণা আছে। এরা তো শয়তানের ঘাঁটি। শয়তান তো তাদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেয়- প্রাকৃতিক বিষয়-আশয় উন্মোচন করে দেয়। তার দ্বারা যেনো লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে। কেননা, লক্ষ শয়তানরা পথভ্রষ্টতার কাজ আঞ্জাম দিতে পারে না, যতটুকু করতে পারে একজন শয়তানের বন্ধু। আমি এ বিষয়ে যা লিখেছি আল্লাহ তাওফিক দিলে ভবিষ্যতে আরো লিখবো। সবকিছুই হাদীস শরীফ থেকে গ্রহণ করেছি। দুঃখজনক হলো আমি এই গ্রন্থে এসব বিষয়ে বর্ণনা দিতে অপারগ। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখের মাধ্যমেই ইতি টানছি।

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

-"নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে" (আনআম (৬) : ১২১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

-"এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রুকরেছি শয়তান, মানব ও জিনকে, তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়" (আনআম (৬) : ১১২)

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

-"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর সȣরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী" (যুখরুফ (৪৩) : ৩৬)

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

-"শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে" (যুখরুফ (৪৩) : ৩৭)

টীকা: আউলিয়ায়ে রাহমান দু'প্রকার: ১. মাজযুবে সালিক: যার সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা ইতোপূর্বে হয়েছে। ২. সালিকে মাজযুব, ঐ ব্যক্তি যিনি শরীয়ত মুতাবিক রিয়াজত-মুজাহাদা করে তাযকিয়া ও তাহলিয়া তথা স্বচ্ছতা-পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জন করে নেন। একদিন তো এমন হবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, নিজের কাছে জয্ব করে তথা টেনে নিয়ে যাবেন। পড়ুন!

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালোবাসেন।” (বাক্বারাহ (২) : ২২২)

এই আয়াত বিশেষতঃ এ সমস্ত লোকের জন্যই। সহীহ বুখারীতে আছে:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

-“বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটে আসতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসি।” এবং আল্লাহ তা’আলা বলেন:

اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

-“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।” (শুরা (৪২) : ১৩)

উক্ত আয়াতে মাজযুবে সালিক ও সালিকে মাজযুবের আলোচনা হয়েছে। يَجْتَبِي দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘মাজযুব’ আর مَنْ يُنِيبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘সালিক’।

রিয়াযত-মুজাহাদা তথা তাযকিয়া ও তাহলিয়া

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” (আনকাবুত (২৯) : ৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

-“সে-ই তো মুজাহিদ যে তার নফসের সাথে যুদ্ধ করে।” (তিরমিযি)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

-“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।” (শাম্স (৯১) : ৯-১০)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

-“আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন, বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।” (আলে ইমরান (৩) : ১৬৪)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-“পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত।” (নাযিয়াত (৭৯) : ৪০-৪১)

এখানে কয়েকটি মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

নীতি ১- মৃত্যু পর্যন্ত তাযকিয়ার সাধনা: তাযকিয়া ও তাহলিয়াকে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা জরুরী, কিছুদিন পর তা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক না। কেননা, আপনার দুশমন হলো শয়তান- সে তো মৃত্যুবরণ করে না। সে যখনই আপনাকে উদাসীন পায় তখনই কাজ শুরু করে দেয়। তাবারানী ইত্যাদি কিতাবে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়ের পাশে ওঁৎপেতে বসে থাকে। যখনই তাকে সে গাফিল পায় তখনই তাকে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দেয়। তবে যে লোক তাযকিয়া ও তাহলিয়া দ্বারা নিসবত এবং ঈমানে তাহকিকী অর্জন করে নেয়, তখন তাযকিয়া ও তাহলিয়ায় তার কষ্ট অনুভব হয় না বরং স্বাধ অনুভূত হয়। ইবাদতের রূহ তার হৃদয় ও দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বুঝে নিন, এক ব্যক্তি বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য প্রতিদিনই বাহ্যিক সাজ-সজ্জা করে শাহী দরবারে উপস্থিত হয়।

কিন্তু বাদশাহ্র নৈকট্য তার অর্জন হয় না। একদিন সৌভাগ্যক্রমে বাদশাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে গেল। বাদশাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তার সাজ-সজ্জায় পরিতৃপ্ত হয়ে নিজ নৈকট্যগামীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেন ও প্রত্যহ তার নিকটে বসার অনুমতি দিলেন। এখন বলুন, ঐ লোকটি কী আগামীতে তার সাজ-সজ্জাকে কমিয়ে আনতে পারে? কখনো নয়- বরং সে তা আরো বৃদ্ধি করবে। তবে এই বৃদ্ধিকরণে তার কোন কষ্ট অনুভব হবে না বরং স্বাদ অনুভব হবে।

নীতি ২- তাযকিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ: তাযকিয়া (পবিত্রতা অর্জন) ও তাহলিয়ার (সৌন্দর্যাবলম্বনের) সমন্বিত নাম হলো রিয়াজত-মুজাহাদা। দু'টোই একসাথে করতে হবে। এরকম নয়, প্রথমে তাযকিয়া শেষ করে তারপর তাহলিয়া আরম্ভ করবো। বরং তাযকিয়া এবং তাহলিয়া উভয়টির সমন্বিত নামই হলো ইসলাম। উভয় কাজটি একই সাথে চলে। নবীন ও প্রবীণ সকলের জন্যই এটা প্রযোজ্য। নবীন সালিক ও মুরিদের ক্ষেত্রে কষ্ট-যাতনা অনুভব হবে। আর কামিল ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধ উপভোগ হবে। কিছু লোক মনে করে প্রথমে তাযকিয়া শুরু করবে এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে তাহলিয়ার কাজ আরম্ভ করবে। বাস্তবে এটা তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা। কারণ, তাযকিয়া হলো ইসলামের অর্ধেক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

-"পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক।" (সহীহ মুসলিম) কিছু বিদআতী সুফির দাবী হলো, কামিল ও ওয়াসিল (গন্তব্যে উপনিত) ব্যক্তির জন্য তাযকিয়া জরুরী নয়, তার নফসের ও চাহিদার মৃত্যু ঘটে ইত্যাদি। এই দাবী সম্পূর্ণ ভুল এবং পথভ্রষ্টতা। এরকম দাবীকারী তো শয়তানের চেলা ও গোলাম এবং নফসেরও গোলাম। হে সুফী! আপনি যতোই কামিল হোন না কেন, আপনি একজন সর্বনিম্ন পর্যায়ের সাহাবীর স্তরেও পৌঁছতে পারবেন না। সহীহ বুখারীতে আছে:

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ

-“ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশ জন আসহাবকে পেয়েছি। সবাই নিজের মধ্যে নিফাকের ভয় করতেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহকে তো একমাত্র মু’মিনই ভয় করেন, আর একমাত্র মুনাফিকই আল্লাহ থেকে নিশ্চিন্ত থাকে।” সারকথা, বর্ণনাকারী বলেন, আমি ত্রিশ জন জলীলুল ক্বদর সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু কাউকেই নিফাক (আক্বীদা কিংবা ’আমলী) থেকে নিশ্চিন্ত পাই নি। বরং তারা সবাই এটাকে ভয় করতেন এবং এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি সাইয়্যিদুত তাইফায়ে সুফিয়া (সুফিদের সর্দার) ছিলেন, তিনি বলেন: ‘আল্লাহ তা’আলাকে একমাত্র মু’মিনই ভয় করে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে একমাত্র মুনাফিকই নির্ভয়ে বসে থাকে।’

প্রিয় ভায়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরামের ইসমত (আজীবন নিষ্পাপ) হলো সর্বজনস্বীকৃত। তারাও তাদের নফসের পবিত্রতার ঘোষণা দিতেন না। হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালাম আল্লাহর বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও বলেন,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

-“আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়- আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (ইউসুফ (১২) : ৫৩)

নীতি ৩- রিয়াজত-মুজাহাদার মর্মকথা: রিয়াজত-মুজাহাদার অর্থ এ নয় যে, মানুষ তার জন্মগত শক্তিকে শেষ করার চেষ্টা করবে। কেননা, এটা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত এটা যেহেতু সৃষ্টিগত শক্তি- আর এ শক্তি নিঃশেষ করার অর্থ হলো এর খালিক বা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তৃতীয়ত এটা একটি অনর্থক কাজ। যদি বলা হয়- এর দ্বারা রূহের মধ্যে অবচেতন শক্তি অর্জন হয়, বিশ্বের অনেক গোপন রহস্য উন্মোচন হয়, অনেক গোপন বিষয়-আশয় বেরিয়ে আসে কিংবা অন্যদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়- আমরা এর জবাবে বলবো, গোটা বিশ্বও যদি তার সামনে খুলে যায় তবুও এতে তার কি কামালিয়াত নিহিত আছে? তার রূহের মধ্যে কী-ই বা প্রশান্তি অর্জিত হলো? এরকম তাজাররুদ এবং গায়েবী বিষয়ের উন্মোচন তো শয়তানদেরও হয়। শত-সহস্র কীট-পতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছু

এবং মাছেরও এরকম কাশফ হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ফলে গোটা বিশ্বব্যাপী মানুষের বিচরণ অতি সহজ হয়ে গেছে। বিশ্বের অনেক গোপন তথ্য-রহস্য আমাদের নিকট বেরিয়ে আসছে। আমরা দুনিয়ার এক স্থানে বসে সারা দুনিয়ায় আমাদের বক্তব্যের প্রচার করছি। মূলত এসব বস্তুর আবিষ্কার সম্পর্কে তেরো শত বছর পূর্বে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবগত করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

-"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন না মানুষ প্রাণীর সাথে, তার লাঠির সাথে এবং তার জুতোর ফিতার সাথে কথা বলছে। এক ব্যক্তিকে তার নিজ উরুই সহস্র মাইল দূরে বসে থাকা তার পরিবার-পরিজন কী করছে তা অবগত করবে।" (সুনানে তিরমিযি :২১০৭)

সহীহ বুখারীতে আছে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষ এক বৎসরের কাজ এক মাসে করবে। আর এক মাসের কাজ এক সপ্তাহে করবে। এরকম বিষয় আরো বহু হাদীসে বর্ণিত আছে। এখন ইনসাফের সাথে বলুন, আজকের বিজ্ঞানের বদৌলতে যেসব গোপন বিষয় উন্মোচন হলো, এ ক্ষেত্রে কি একজন মানুষও পাওয়া যাবে, যে তার রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে জীবনকে নিঃশেষ করে দিল? আপনি পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের ইতিহাস পড়ুন কিংবা পাদ্রী ও যোগীদের অবস্থা অধ্যয়ন করুন। আপনি একজনও কি পাবেন, যে তার জীবনকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা করেছে? তারা তো রিয়াজত-মুজাহাদার আড়ালে নফসের গোলামীই করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

-"সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি।" (হাদীদ (৫৭) : ২৭) ইনশাআল্লাহ, পরবর্তীতে আমি এই বিষয়ের উপর আরো কিছু আলোকপাত করবো।

বিজ্ঞান ও মিজমারিজম (অবাক করার মতো কাণ্ড) এর মাধ্যমে বিশ্বের গোপন তথ্যাদি ও রহস্যাবলী কিছু জানা হয়েছে এবং আরো জানা হবে। এখন, বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গোপন তথ্য-রহস্যাবলীর অবগতির দ্বারা কি কোন মানুষের আত্মায় প্রশান্তি অনুভব হয়েছে? এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা কি জুলুম-নিপীড়ন, প্রতারণা, সন্ত্রাস, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান এবং অন্যান্য অসৎ চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার হ্রাস সৃষ্টি হয়েছে? না আজকের দুনিয়া হত্যা-নিপীড়ন, প্রতারণা এবং হাজারো অসৎ চরিত্র দ্বারা জাহান্নামে পরিণত হয়েছে? আপনি অবশ্য উত্তর দেবেন, জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। আজ সচ্চরিত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য মানুষের জান-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। আমরা আপনাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনার জন্য বলতে চাই, একমাত্র ইসলাম এবং ইসলামের নবীই হলেন ন্যায়বিচার ও সচ্চরিত্রের মূল চাবিকাঠি।

চতুর্থ কারণ হলো, মানুষ যদি তার জন্মগত শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয় তখন তো সে মৃত্যুবরণ করবে। আর কি কেউ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সচেষ্ট থাকবে? পঞ্চম কারণ হলো, এর দ্বারা দুনিয়ার জীবন ও নিযাম একদম অচল হয়ে পড়বে। ষষ্ঠ কারণ হলো, এর দ্বারা মানব প্রাণী - যে নাকি আশরাফুল মাখলুকাত, ধ্বংসের ঘাটে উপনীত হয়ে যাবে। এছাড়া আরো শত-সহস্র ক্ষতি আছে। এজন্য ইসলাম আমাদেরকে বলে, সঠিক রিয়াজত-মুজাহাদা হলো: মানুষ তার স্বভাবজাত শক্তিকে নিঃশেষ করবে না, বরং এটাকে পরিশুদ্ধ করবে। সর্বপ্রকার শিথিলতা ও অতিরঞ্জন থেকে নিজেকে রক্ষা করে মধ্যম পন্থাবলম্বনে সচেষ্ট থাকবে। সারকথা হলো, নফসের প্রাপ্য বাকী রেখে এর খাহিশাত বিলীনকরণে কাজ করবে।

নীতি ৪- দু'টি শক্তির পরিমার্জন: মানুষ হলো অনেক উপাদানের সমষ্টিগত নাম। কিন্তু এর মূলে রয়েছে দু'টি শক্তি: ১. বোধশক্তি এবং ২. কর্মশক্তি। বোধশক্তির পূর্ণ স্তরের নাম হলো 'ওয়াহী'। এটা মানুষের চেষ্টা-সাধনার অনেক ঊর্ধ্বে। কর্মশক্তির পূর্ণ স্তরের নাম হলো 'ইসমত' (সংরক্ষণ), যা মানুষের রিয়াজত-মুজাহাদা সীমার বাইরে। এই উভয় স্তরই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া এবং এগুলো আম্বিয়ায়ে কিরামের বিশেষত্ব। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে যেখানেই দারাজায়ে কামালের (পরিপূর্ণ স্তরের) আলোচনা আসবে সেখানে উল্লেখিত এই দু'টি স্তর উদ্দেশ্য হবে না।

নীতি ৫- ইলহাম ও হিফজ: ইসলাম আমাদেরকে বয়ে দেয়, মানুষের শক্তি ও যোগ্যতার পরিশুদ্ধতা ও সংশোধনীর নামই হলো প্রকৃত রিয়াজত-মুজাহাদা। এজন্য আমাদেরকে বোধ ও কর্মশক্তি এই উভয় শক্তিকেই সংশোধন করে নেওয়া উচিত। এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে বোধশক্তির যে পূর্ণ স্তর অর্জন হয় তাকে 'ইলহাম' বলে। এবং কর্মশক্তির ক্ষেত্রে যে স্তর অর্জন হয় তাকে বলে 'হিফজ'। এই উভয় স্তরের মধ্যে আরোও শত-সহস্র স্তর আছে। কিছু স্তর নুবুওয়াতের নিকটবর্তী, আর কিছু স্তর অনেক দূরবর্তী। যেমন, সিদ্দীক, মুহাদ্দিস, হাওয়ারী, শহীদ এবং ইক্বতিসাদ তথা মধ্যপন্থার স্তর।

নীতি ৬- আখলাকে হাসানা: যেহেতু মানুষ আত্মা এবং শরীরের সমন্বিত রূপ, আর আত্মাই হলো বোধশক্তির উৎস স্থল এবং শরীর হলো কর্মশক্তির উৎস স্থল। তাই উভয় যোগ্যতা ও শক্তির সংশোধনী জরুরী। কেননা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যতোই বেশী হোক, তা কখনো পরিপূর্ণ নয়। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অপরিপূর্ণ। তাই বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ যে কোন শক্তিই হোক না কেন তা পরিপূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশুদ্ধতার সাথে ভুল, পরিপূর্ণতার সাথে অপরিপূর্ণতা, স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির সংমিশ্রণ থাকবেই। আর অদ্যাবধি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধি কোন একটিও বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারে নি। এ হলো বোধশক্তির অবস্থা। বোধশক্তির এই অবস্থার দ্বারাই কর্মশক্তির অবস্থাও পরিষ্কার হয়ে যায়- কারণ, এই শক্তিটি মূলত বোধশক্তির নির্দেশাধীন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিশক্তির কাজ হলো বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা। যেমন দৃষ্টিশক্তির কাজ হলো দেখা। কিন্তু সূর্যের আলো ছাড়া যেমন দৃষ্টিশক্তি দ্বারা কোন কিছু দেখা যায় না। তদ্রূপ শরীয়তের আলো ছাড়া কেবল বোধশক্তির দ্বারা কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সুস্থতা-ব্যাধি, বিশুদ্ধতা-ত্রুটি এবং সংশোধনী-বিনষ্টকরণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত প্রদান করা যাবে না। তাই তালিবে-সাদিকের জন্য প্রথম দায়িত্ব হলো, নূরে মুহাম্মদীর আলোকে নিজ বোধশক্তিকে সংশোধন করে নেওয়া। বোধশক্তি হলো রাজা বা শাসকের মতো। আর এটা নিয়ম যে- রাজা সংশোধিত হলো প্রজাদেরও সংশোধন হয়ে যায়। সুতরাং বোধশক্তি যখন শরীয়তের আলোকে আলোকপ্রদ হয়ে ওঠবে, তখন কর্মশক্তির অপব্যবহার ছেড়ে দেবে। বরং যখনই সে এটাকে কাজে লাগাবে, শরীয়তে মুহাম্মদীর

অনুসারেই লাগাবে। বোধশক্তি যখন শরীয়তকে বেশী বেশী অনুসরণ করতে থাকবে আর তার নফসও অভ্যস্ত হয়ে ওঠবে, তখন তার মধ্যে কিছু ফাজাইলে শরীফা তথা উন্নত গুণাবলী এবং মালাকাতে আলীয়া তথা উচ্চাঙ্গের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এটাকেই শরীয়তের ভাষায় আখলাকে হাসানা তথা সুন্দর চরিত্র বলা হয়।

সারকথা হলো, ঈমান সঠিক হলে তার ফলশ্রুতিতে আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর পরিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে যে ভালো গুণাবলীর উদয় ঘটে ওগুলোই আখলাকে হাসানা। পরিপূর্ণ ঈমান, পরিশুদ্ধ আমল এবং সুন্দর চরিত্র শরীয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। সুতরাং হৃদয় যখন সঠিক ঈমান, পরিশুদ্ধ আমল ও সৎ চরিত্রের আলোকে চমকপ্রদ হয়ে ওঠবে, তখন তা মাহবুবে আকবর তথা শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার তাজাল্লির দর্পণে পরিণত হবে। তার মধ্যে অনেক ভালো অবস্থার সৃষ্টি হবে যেমন, গুলবা (প্রভাব), সাকর (অতি আসক্তি), ফানা (বিলীন), বাক্বা (স্থিতি), ক্বাবয (সংকোচন), বাস্ত (সম্প্রসারণ), হাইবাত (আতঙ্ক), উনস (প্রশান্তি), গ্বাইরুল্লাহর প্রতি নফরত এবং তামকীন (স্থিরতা) ইত্যাদি। এর পরে তার হৃদয়ে আরো অনেক মাক্বাম সৃষ্টি হবে যেমন তাওবাহ, যুহদ, সবর, শুকর, রাজা, খাওফ, তাওয়াক্কুল, রিদ্বা (সন্তুষ্টি), কসর (বিনয়), জমা (মনোযোগ), হায়া (লজ্জা), তাজিম (সম্মান), দায়িমী তাওয়াজ্জুহ (সর্বদা আল্লাহমূখিতা), আল্লাহর জন্য কামিল ইনকীতা (একমূখিতা), আল্লাহর সাথে মুনাজাত (কানকথা), ইখলাস এবং উবুদিয়াত ইত্যাদি। সালিকের হৃদয় ও দেহে ইবাদতের প্রাণ ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সাথে তার ঐ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যার আলোচনা 'নিসবত' অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় প্রদান করা হয়েছে। এটা জেনে রাখা ভালো, হাল ও মাক্বামের শুদ্ধতা ও ভ্রান্তির মাপকাঠি হলো শরীয়ত। শরীয়ত যেটাকে শুদ্ধ বলবে এটাই শুদ্ধ। আর যেটাকে ভ্রান্ত বলবে তা-ই ভ্রান্ত। শেষকথা, মানুষ শরীয়তের এতোই অনুগত হবে যে, তার জাহির ও বাতিন এর আলোয় ঝলমল করে ওঠবে।

নীতি ৭- জীবাত্মা ও মানবাত্মা: মানুষ হলো সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যেসব খারাপ গুণাবলী নিহিত আছে, যেমন হিংস্রতা এবং প্রতারণা ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের মধ্যেও আছে। তাই তার মধ্যে পরিপূর্ণ জীবাত্মা বিদ্যমান। এটা গোটা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এর প্রধান দফতর হলো বাম

স্তনের নীচে অবস্থিত মাংসখণ্ড। ক্বালবের প্রথমোক্ত অর্থে এর আলোকপাত হয়েছে। এই জীবাত্মার ডাকঘর হলো দিমাগ (মস্তিষ্ক)। কুরআন এবং হাদীসে যেখানেই 'মুতমায়িন্নাহ' শব্দ ছাড়া কেবল নফস শব্দের আলোচনা এসেছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো এই জীবাত্মা। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এরই অনুগামী বানিয়েছেন। এবং এটাই হলো জীবের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তির মূল উৎস। প্রাণীর মধ্যে শক্তির কোন সীমা নেই- কিন্তু নেতৃত্বের অধিকারী হলো নফস। সুতরাং পানাহার, পরিধান, সহবাস, সন্তান জন্মদান, পার্থিব সম্পদ অর্জন, কথা বলা, দেখা, শোনা, ধরা, চলা, বড়ত্ব, আত্মম্ভরিতা, শয়ন, আধিপত্য এবং প্রতারণার খাহিশ ইত্যাদি হলো জন্মগত বা প্রাণীগত শক্তি। ক্রোধও অধিকাংশ উলামার মতে একটি জন্মগত শক্তি। কিন্তু এই অধমের মতে এটা জন্মগত শক্তি নয়- বরং জীবাত্মা যখন নিজ খাহিশ পূর্ণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন প্রতিরোধ-প্রতিশোধের জন্য তার মধ্যে যে উন্মত্ততার সৃষ্টি হয় তাকেই ক্রোধ বলে। সারকথা, জীবাত্মার সমস্ত শক্তির মূল উৎসই হলো নফস। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى*فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (নাযিয়াত (৭৯) : ৪০-৪১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

-"মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ- রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত- খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী; এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু, আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।" (আলে ইমরান (৩) : ১৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

-"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল- খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?" (জাসিয়া (৪৫) : ২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

-"প্রবৃত্তি দিয়েই জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে।" (তিরমিযি)

আল্লাহ তা'আলা রূহকে এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার কারণে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। সুফিয়ায়ে কিরাম এই রূহকেই 'লতীফায়ে রাব্বানিয়া নূরানিয়া' নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

-"আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব।" (হিজর (১৫) : ২৮)

এবং এই রূহকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমায়ে হুসনার দর্পণ বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إن لله أنية في أرضه وإن أنية اللهِ فِي أَرْضِهِ قلوب عباده الصالحين

-"নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একটি পাত্র আছে, জেনে রেখো তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের হৃদয়ই হলো তোমাদের প্রভুর সেই পাত্র।" (আহমদ, তাবারানী)

আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়াগুণে রূহকে মানুষের নফস ও অন্যান্য শক্তির আমীর বানিয়েছেন। সে যখন নফসের প্রধান দপ্তর তথা বাম স্তনের নীচের মাংস খণ্ডে পৌঁছে তা নিয়ন্ত্রণ করে তখন বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়:

১. রূহ নফসকে বলে, আল্লাহ তা'আলা আমার, তোমার এবং সমস্ত সৃষ্টির খালিক ও রব। তিনি আমাকে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, আমি তোমাকে এবং অন্যান্য শক্তিকে সংশোধন করে দেবো। যদি তুমি আমার ইসলাহ ও তাহজিব গ্রহণ করো এবং তোমার রবের সম্মুখে মাথানত করো তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং

আমার মাধ্যমে তোমাকে নুবুওয়াতের স্তরে উপনীত করবেন। তিনি নিজ কালাম ও শরীয়ত দ্বারা আমাকে ও তোমাকে সৌভাগ্যবান বানাবেন- যার মাধ্যমে অসংখ্য আল্লাহর বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সফলতা লাভ করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। নফস যখন দেখলো, রূহ অত্যন্ত সুন্দর ও শক্তিশালী তখন সে এর ইসলাহ ও তাহজিবকে গ্রহণ করে নিলো, রবের আনুগত্যে প্রেমসূলভ যাত্রা শুরু করলো এবং নিজের সমস্ত শক্তিকে রবের আনুগত্যে এরূপ বিলিয়ে দিল যে, নফসের প্রধান উপদেষ্টা শয়তানের জন্য বাহ্যিক আনুগত্য ছাড়া আর কোন পথই রাখে নি। এই অবস্থাটি হলো একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরামের সিফাত।

২. রূহ নফসকে বলে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার আমীর নিযুক্ত করেছেন যেনো আমি নিজেও শরীয়তের আলোতে আলোকিত হই এবং তোমার সমস্ত শক্তিকেও এর দ্বারা নূরান্বিত করি। যদি তুমি আমার সংশোধনী গ্রহণ করো এবং প্রধান উপদেষ্টা শয়তানের গোপনীয় ইশারা-ইঙ্গিতের বিরোধিতা করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর করুণা ও প্রেমের দৃষ্টিতে দেখবেন, আমার মাধ্যমে তোমাকে তাঁর তাজাল্লির আয়না বানাবেন এবং আমাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধন ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেবেন- যা আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। পরিশেষে যখন সর্বপ্রকার আঁধার থেকে পাক-পবিত্র হয়ে আমরা নিজেরাই নূরে পরিণত হয়ে যাবো, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দারুন-নূরে তথা আলোকিত ঘরে তাঁর প্রিয় অতিথির মর্যাদায় ভূষিত করবেন। সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশের জায়গা থেকে উপকার লাভের সদয় অনুমতি দান করবেন। আমাদের ও তাঁর মধ্যকার পর্দা উন্মোচন করে দেবেন এবং তাঁর দর্শন ও নৈকট্যলাভের এমন সব স্তর প্রদান করবেন যার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

নফস এসব কথার জবাবে বললো, হে রূহ! তুমি হচ্ছো অপরিচিত ব্যক্তি। সংবাদ দিচ্ছ এক অজানা দেশের এবং এর রূপ দেখিয়ে আমাদের উপর তোমার আধিপত্য বিস্তার করতে চাচ্ছ। দেখো, আমাদের এখানকার রাজ্য হলো গণতান্ত্রিক। আর আমি হলাম এর প্রধান। এই রাষ্ট্রের সংবিধান হলো শাহাওয়াত (প্রবৃত্তি)। হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, পেট এবং লজ্জাস্থানসহ এর সমস্ত নাগরিক সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রবৃত্তির খাহিশ পূর্ণ করতে তারা কারো অধীন নয়। এই রাষ্ট্রের প্রধান দপ্তর ক্বালব। যার একাংশের নিয়ন্ত্রণ তোমার কাছে। এর ডাকঘর হলো দিমাগ বা মস্তিষ্ক (ইতহাফে আছে, চিন্তাশক্তির উৎস হলো দিমাগ), যার নিয়ন্ত্রণের চিন্তায় তুমি নিমগ্ন। মুখ হলো প্রকাশনী কার্যালয়, শ্বাস-প্রশ্বাস তার যোগাযোগ অধিদপ্তর। আর

এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হলো শয়তান। সে খুবই শক্তিধর। তার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে সে সদা ব্যস্ত থাকে। সে এমন কিছু কলা-কৌশল ও ফন্দি উদ্ভাবন করে, এর মুকাবিলা করা তোমার জন্য অসম্ভব। প্রতিটি শ্বাস দিয়ে রাজ্যে তার হুকুম চলতে থাকে। যদিও আমি এ রাজ্যের প্রধান, কিন্তু তার দিক-নির্দেশনা ছাড়া আমি একটি পা-ও ফেলতে পারি না। নফস আরো বলে, হে রূহ! হে অপরিচিত-অজানা ব্যক্তি! আমি তোমার নিকট দু'টি প্রস্তাব রাখছি। এর যে কোন একটি তুমি গ্রহণ করে নাও; ১. হয় তুমি এই রাষ্ট্রের খাজনা দিয়ে যাবে, বা ২. এই রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবে। তুমি রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং শাহাওয়াতের সংবিধান বাস্তবায়নে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। সুন্দর সুন্দর পন্থা আবিষ্কার করে দেবে। আমরা তোমার সেবা করবো বরং গোটা বিশ্বই তোমার মূল্যায়ন করবে।

রূহ যখন অবাধ্য নফসের জবাব শোনলো এবং রাষ্ট্রের উপর তার আধিপত্য দেখলো, তখন সে মাওলায়ে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মনোনিবেশ হয়ে ফরিয়াদ শুরু করলো। তাঁর সাহায্য চাইতে লাগলো। তার নিঃস্বতা স্বীকার করে আবেদন করতে থাকে, হে আল্লাহ! তোমার তাওফিকই হলো উত্তম বন্ধু। আমি এ সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি একমাত্র তোমার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য। হে আল্লাহ! বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। সীরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকার তাওফিক দাও। শত্রু বড়োই শক্তিধর। একমাত্র তোমার নাম ও জিকির ছাড়া আমার কাছে আর কোন যুদ্ধাস্ত্র নেই। হে আল্লাহ! আমার জিহাদ কবুল করো। তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভূক্ত করে নাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমার মাকসাদ। হে আল্লাহ! তুমি আমার আপন হয়ে যাও আর আমাকে তোমার বানিয়ে দাও।

অতঃপর শরীয়তের যুদ্ধনীতি অনুসারে নফস ও শয়তানের রাজত্বে রূহের এক তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বড় বড় তোপ, আল্লাহু-আল্লাহ'র শক্তিশালী মেশিনগান এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র যেমন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, ইস্তিগফার, তাওবাহ, কসর (বিনয়), তাওয়াক্কুল, ইখলাস ও উবুদিয়াত ইত্যাদি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমত মাংসখণ্ড ক্বালবের উপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বড় বড় তোপ দিয়ে ফায়ারিং শুরু করে দেয়। এটাকেই কেন্দ্রস্থল ধার্য করে আল্লাহু-আল্লাহ এর শক্তিশালী মেশিনগান তাক করে দেয়। নফস এবং শয়তানের যোগাযোগস্থল শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তোপ এবং আল্লাহু-আল্লাহ এর সমস্ত মেশিনগান দিয়ে এমন তুমুল ফায়ারিং শুরু করে, এর দ্বারা সমস্ত প্রজা

ক্ষেপে উঠে। দুর্বল হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যকার সম্পর্ক। কখনো আল্লাহু-আল্লাহ'র ফায়ারিং হতে থাকে ডাকঘরে আর কখনো ছয় লতীফায় যুদ্ধের তাঁবু বানিয়ে কোন সময় আক্রমণ হয় একসাথে। আর কোন সময় বিচ্ছিন্নভাবে। কখনো সমস্ত রাষ্ট্র একই রণনীতির আওতাধীন রাখা হয়, এর প্রতিটি স্থলে সুলতানুল আযকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নির্ধারণ করে রাখা হয়। এবং প্রতিটি জায়গায় একসাথে আল্লাহর জিকিরের ফায়ারিং শুরু হয়। যার ফলে গোটা রাষ্ট্রে জিকিরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে নফস ও শয়তানের যোগাযোগ কেন্দ্র ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং প্রত্যেক দিক থেকে ফায়ারিং করার কারণে পুরনো সমস্ত ভিত একদম দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে পুরনো রাষ্ট্রের এই দুর্বলতা অনুভূত হয়। নতুন রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য আরো শক্তিধর হয়। নতুন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অফিসের বেতারকেন্দ্রে ওয়াইজুল্লাহকে বক্তা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। প্রতি মুহূর্তে এই বেতারকেন্দ্র থেকে যে বক্তব্যের প্রচার হয় তা রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বক্তব্যকে প্রজ্ঞা ও উপমার ভাণ্ডার মনে হয় কিন্তু এর মূল কথা হলো: ১. নতুন রাষ্ট্র তথা রূহের আনুগত্য মেনে নাও। এতে তোমরা দারুন-নূর (আলোর ঘর) অর্জন করবে। পুরনো রাষ্ট্র তথা নফস ও শয়তানের আনুগত্য বর্জন করো, কেননা এর পরিণাম হচ্ছে দারুজ জুলমাত। ২. নতুন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো আল্লাহ আর পুরনো রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো শয়তান। ৩. নতুন রাষ্ট্রটি হবে গণতান্ত্রিক। কিন্তু তা সুশৃঙ্খল শ্রেণীবদ্ধ আইনের আলোকে হবে। এই বিধানের রচয়িতা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ৪. নতুন রাষ্ট্র তোমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে না বরং তোমাদেরকে স্বভাবজাত স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। হ্যাঁ, এর একটি সীমা থাকবে-এ সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে তোমরা তোমাদের ফিতরী শক্তির প্রয়োগ করবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। ৫. নতুন রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতার অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের ফিতরী শক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী বানিয়ে দেবে। তিনি যেখানে অনুমতি দিয়েছেন সেখানে ব্যবহার করবে। তবে এ ব্যবহারে যেনো লক্ষ্যর্জন তথা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে বাঁধা সৃষ্টি না হয়। তিনি যেখানে নিষেধ করেছেন, সে ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োগ করবে না। ৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোমন্দ সম্পর্কে খুবই অবগত। যদি তোমরা আইন-কানুনের পাবন্দ না হও তাহলে ইফরাত এবং তাফরীতের কারণে দুনিয়া-আখিরাতে ধ্বংসের দৃষ্টান্তে পরিণত হবে। মনে করো লজ্জাস্থানের অভ্যাস হলো সহবাস করা, এখন যদি এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন অবলম্বন করা হয় তাহলে পার্থিব জীবনে অনেক ধরনের দুর্বলতা

আসতে পারে যেমন, দৃষ্টিশক্তি, পাকস্থলী ইত্যাদিতে অনেক সমস্যা দাঁড়াবে। আর যেহেতু এতে বৈধ-অবৈধ কোন পার্থক্য রাখবে না, তাই আরো শত-সহস্র অসৎ চরিত্রের সৃষ্টি হবে। যার পরিণতিতে রূহ একদম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং দারুজ-জুলমাতে উপনীত হবে। পক্ষান্তরে যদি কৃচ্ছ্বতাবলম্বন করতে যেয়ে সহবাস থেকে একেবারে বিরত থাকে তাহলে দুনিয়াতে শত-সহস্র রোগের স্বীকার হবে। যেহেতু মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে এই শক্তিও তার সাথে বেঁচে থাকে। এর ফলে প্রত্যেক সময়ে আত্মার সাথে প্রবৃত্তির বিরোধিতা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যদ্বরুন অনেক অসৎ চরিত্রতার সৃষ্টি হয়।

ইসলাম পৃথিবীতে এসে সেই কৃচ্ছ্বতা ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে এক মধ্যমপন্থা দেখিয়ে দিল। নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে সহবাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

-"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।" (মু'মিনূন (২৩) : ৫-৭)

ইসলামী তাসাওউফ এটাই শিক্ষা দেয়, তোমার মাকসাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই তোমার স্ত্রীর সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোল যা তোমার চলার পথে সহায়ক হবে। এতটুকু ছাড়া নফসের বাকী সব বিলাসিতা তুমি ছেড়ে দাও। তুমি হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করবে, এতে কারো রাজত্বের সুযোগ দেবে না বরং সর্বদা হৃদয়কে মনোনিবেশ রাখবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি।

হে তালিবে সাদিক! তুমি নিজের হাত-পা, মুখ, কান, চোখ, পেট ও দিলের বিষয়টিও লজ্জাস্থানের মতোই বুঝে নাও (এগুলোর প্রয়োগে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে)। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি অঙ্গকেই তার চাহিদা পূরণের অনুমতি দিয়ে এর সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সীমার ভেতরে থেকে যদি কেউ তার স্বভাবজাত শক্তি প্রয়োগ করে এবং তা যদি হয় আল্লাহর পথে সহায়ক- তবে তা নিষিদ্ধ নয়- বরং এটাই ফিতরতের আসল উদ্দেশ্য।

মোটকথা, পুরনো রাষ্ট্রের মধ্যে ওয়াইজুল্লাহর বক্তব্য এক আগুন জ্বেলে দিল। নফস ও শয়তান চতুর্দিকের আক্রমণের কারণে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। মনে হলো তারা যেনো একদম ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে বিষয়টা এরকম নয়। রূহ যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, সে তো একজন মানুষ। তার মধ্যে আছে ক্লান্তি ও উদাসীনতা। পক্ষান্তরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এমন এক শত্রুযার না আছে কোন ক্লান্তি বা অলসতা। সে হল শয়তান। রূহের অলসতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাংসখণ্ড ক্বালবের উপর উড়োজাহাজ থেকে বোমা বর্ষণ করতে থাকে। কখনো সম্মানাসক্তি ও পার্থিব মোহের এটম বোমা দিয়ে আর কখনো আত্মপ্রীতি, কারামত, কাশফ (অন্তর দৃষ্টি), কুমন্ত্রণা, বিদআত, কপটতা এবং প্রতারণার বোমা দিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সৈন্যদের শিবিরে এক তুমুল আক্রমণ শুরু করে। মনে হয় যেনো রূহ একদম অচল হয়ে পড়বে এবং জিকিরের আধিপত্য যেনো নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে রূহ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য থেকে নফীউন নফী (অস্থিতির অস্থিতি), ফানা (আত্মবিলুপ্তি), ফানাউল ফানা (আত্মবিলুপ্তির মধ্যে আত্মবিলুপ্তি), আল্লাহ তা'আলার প্রতি দায়িমী তাওয়াজ্জুহ ও মনোনিবেশ, দায়িমী তাওবাহ এবং দায়িমী খুযু (অনুনয়-বিনয়) ইত্যাদি তোপ থেকে শয়তানের উড়োজাহাজে এমনভাবে ফায়ারিং শুরু করে যে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের (ক্বালবের) উপরাংশ একদম স্বচ্ছ হয়ে যায়। এটা তখন সর্বপ্রকার আক্বীদাগত, চারিত্রিক ও আমালী ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আবরণ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে যায়। অন্যদিকে কামিল ঈমান ও নেক আমলের জ্যোতি তার এই চমককে আরো দ্বিগুণ করে দেয়। কুরআনে করীমে আছে:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

-"তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য তাতে পুত পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী; জ্যোতির উপর জ্যোতি।" (নূর (২৪) : ৩৫)

তার এই রিয়াজত-মুজাহাদা আল্লাহ তা’আলার কাছে খুবই পছন্দ হলো- তাই তিনি এই রূহ ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে নিজের সাথে মিলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى*وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

-“তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এবং আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম।” (কাহাফ (১৮) : ১৩-১৪)

তার উপর সাকীনা নাজিল করে ঈমানে তাহকিকী এবং নিসবতের নিয়ামত দিয়ে তাকে মহিমান্বিত করেন। সাইর ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে যাত্রার স্তর থেকে উন্নীত করে তাকে ডুবিয়ে রাখেন সাইর ফিল্লাহ তথা আল্লাহর মধ্যে বিচরণের মাঝে। সে তখন হয়ে যায় আসমায়ে হুসনার তাজাল্লির আয়না।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” (আনকাবুত (২৯) : ৬৯)

সালিকের প্রতিটি কর্মে আল্লাহর মুহাব্বাত ও জালালের দৌড় শুরু হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে:

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

-“তুমি এমনভাবে আল্লাহ তা’আলার উপাসনা করো যেনো তুমি তাকে দেখতো পাচ্ছ, আর যদি না দেখো তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।” [সহীহ বুখারী]।

মুশাহাদা ও দর্শন এবং উনস ও ঘনিষ্ঠতার স্বাদের দরুন এক আল্লাহর মুহাব্বাত ও জালাল ছাড়া তার মধ্যে আর কোন কিছুই বাকী থাকে না। এসব তো হলোই। কিন্তু অবশেষে সে তো একজন মানুষ মাত্র। ক্লান্তি-অবসাদে সে নিথর হয়ে পড়ে। যদিও আসমায়ে ইলাহীর তাজাল্লি দ্বারা তার নফস ‘মুতমায়িন্নায়’ পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় শত্রুশয়তান পূর্ণমাত্রায় তখনও শত্রুতায় লিপ্ত আছে। যখনই সে ক্বালবকে আল্লাহ তা’আলা থেকে গাফিল পায় তখনই ওয়াসওয়াসার মেশিনগান থেকে খুব জোরেসুরে ফায়ারিং শুরু করে দেয়। অতঃপর রূহের মধ্যে যখন জাগরণ

এসে যায় তখন সে আল্লাহর জিকির, তাওবাহ এবং তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ ইত্যাদি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দেয়। সারকথা যদিও শয়তানের আধিপত্য তার উপর বাকী থাকে না কিন্তু আক্রমণ সর্বদাই হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، وإذا ذكر الله خنس

-"শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে চেপে বসে থাকে। যখন মানুষ উদাসীন হয় তখন কুমন্ত্রণা দেয় আর যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সরে যায়।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

-"যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।" (হিজর (১৫) : ৪২)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

-"যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।" (আ'রাফ (৭) : ২০১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لولا الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ، لنظروا في ملكوت السموات والارض

-"বনী আদমের হৃদয়ে যদি শয়তানদের আগমন না হতো, তাহলে তারা আকাশ ও যমিনের অদৃশ্য জগৎ অবলোকন করতে পারতো।"

শয়তান যখন তার পথ থেকে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সে বহির্দেশের সাথে সন্ধি করে এবং সম্মিলিত শক্তি দিয়ে রণাঙ্গন উত্তপ্ত করে তুলে। অর্থাৎ মানবরূপী শয়তান দুনিয়ালিপ্সু আলীম, ফাসিক ও পথভ্রষ্ট নেতা এবং অন্যান্য মুলহিদদেরকে নিয়ে শত্রুতার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শয়তান ও তার দলবলের সাথে রূহ একাই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। এরপর হঠাৎ অদৃশ্য থেকে ধ্বনি আসলো, "হে রূহ! এখন তোমার নফস মুতমায়িন্নে পরিণত

হয়ে গেছে এবং বাঘ-সিংহ একত্রিত হয়ে গেছে, সুতরাং তুমি আমার কাছে চলে এসো।”

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

-“হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সŠেতাষভাজন হয়ে।” (ফজর (৮৯) : ২৭-২৮)

তোমার প্রভু রিয়াজত-মুজাহাদার কারণে খুবই খুশী হয়েছেন। এখন দারুন-নূর হলো তোমার ঠিকানা।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي

-“অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।” (ফজর (৮৯) : ২৯ - ৩০)

শয়তানের সাথে সংঘর্ষ ছাড়াই তুমি কামালত অর্জন করো। নিজের মধ্যে সৃষ্টি করো নূরানিয়াত ও স্পিরিট। যার মাধ্যমে তোমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে দারুন-নূর তথা আলোর ঘরে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয়: দ্বিতীয় হালতে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা ঐসব লোক সম্পর্কে যারা প্রথম অনুভূতি থেকেই রিয়াজত-মুজাহাদা শুরু করে দিয়েছেন। এসব লোক এক প্রকারের মাজযুব। জযবই তাদেরকে সুলুক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু সাধারণ সালিকগণ যারা দীর্ঘকাল যাবৎ নিদ্রাচ্ছন্ন, শয়তান ও নফসের আনুগত্যে মত্ত, অতঃপর যখন ওয়াইজুল্লাহর উপদেশ, প্রেম ও ঘনিষ্ঠতার বায়ুপ্রবাহে অথবা কোন কামিল শায়খের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা তাদের জাগরণ এসে যায় এবং উদাসীনতার স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ে, তখন তাদের রিয়াজত-মুজাহাদার জন্য আরো অতিরিক্ত কিছু আমল আছে। এগুলো হলো: ১. আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

-“আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আপন সত্তার দিকে ফিরেছি, যিনি নভোণ্ডল ও ভূণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই।” (আনআম (৬) : ৭৯)

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ

-“যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে।” (লুকমান (৩১) : ২২) অর্থাৎ লা-শরীক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করলো। এই মনোনিবেশে যেনো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে কোন উপায়েই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ স্থান না পায়। আর হৃদয়ে যেনো আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই অবশিষ্ট না থাকে। অর্থাৎ কাজ ও কর্মের সংকল্প সে যেনো তখনই করে যখন তা কেবল আল্লাহর জন্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

-“সমস্ত কাজই নির্ভর করে নিয়তের উপর।” [সহীহ বুখারী :১] ২. অতীতে উদাসীন জীবনে যেসব পাপ সংঘটিত হয়েছে এসবকে খুবই ঘৃণা করবে। আর ভবিষ্যতের পূর্ণ ইরাদা, মনোযোগ ও দৃঢ়তা নিয়ে তাওবাহ ইস্তিগফার শুরু করবে। এটাকেই বলে ‘তাওবাতান নাসূহা’ বা খাঁটি তাওবাহ। এই সংকল্প ও মনোযোগ থেকেই শুরু হয়ে যায় তাযকিয়া ও তাহলিয়া (শুদ্ধিকরণ ও অলঙ্ককরণ) ৩. অতীত উদাসীনতার মধ্যে নফস ও শয়তানের আনুগত্য এবং ফিতরী শক্তির অপপ্রয়োগ দ্বারা যে ভ্রান্ত আক্বীদা এবং অসৎ চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে, এসবের কারণে ক্বালব ও আল্লাহর মধ্যে এক বিরাট পর্দা পড়ে গেছে। এখন এই আবরণকে দূর করাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। তরীকতের সালিকদের জন্য এটা এক দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই আবরণ ভেদ করণের দু’টি পথ:

(ক) আবরণে আচ্ছাদিত ব্যক্তি নিজেই চেষ্টা-সাধনা করে তা উন্মোচন করবে।

(খ) শক্ত বহমান বাতাস এই পর্দাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখানেও কখনও সালিকের চেষ্টার দ্বারা পর্দা উড়ে যায় আর কখনো তা উড়ে যায় প্রেমের বহমান বায়ু দ্বারা। স্মরণ রাখা উচিত, প্রেমের বায়ু যখন বেগবান হবে তখন সালিক যেনো পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ নিয়ে এক আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকে। নিজের নিঃস্বতা বিনয় এবং দূর্বলতা দ্বারা রোগের ঔষধ অনুসন্ধান করে।

“হে মালিক! তোমার ভাণ্ডারে চারটি জিনিস পওয়া যায় না: হীনতা, নিঃস্বতা, অক্ষমতা ও পাপ।”

বর্তমান যুগে দেখা যায় কিছু লোক কোন এক তরীকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিছুদিন জিকির করাকেই তাসাওউফ মনে করে। তারা একে অন্যকে খিলাফত প্রদান করে! অথচ তাদের হৃদয়ে পড়ে আছে অসংখ্য আবরণ ও পর্দা। এই অধমরা এসব পর্দা

উন্মোচনের জন্য কী চেষ্টা করছে? এগুলোর হাক্বিকাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কতটুকু আছে?

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দিলে পরবর্তীতে এসব আবরণ সম্পর্কে আরো আলোচনা করবো। এখানে কেবল আবরণ দূরীকরণের একটি মহৌষধ সম্পর্কে আলোকপাত করছি। ১. এসব জিনিস তো মাহবুবে হাক্বিকীর সামনে বিরাট অন্তরায়; মানুষকে ধ্বংসকারী আর দারুজ-জুলমাত পর্যন্ত পৌঁছানোকারী। সুতরাং এসবের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিতে দরজায়ে কামালিয়াত অর্জন করা। ২. এগুলোর অনুকুল কাজ থেকে পলায়ন করা। ৩. এসব পর্দার হাক্বিকাত ও কারণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আর বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ), বিনয় ও নিঃস্বতা নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কখনো পূর্ণমাত্রায় অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলাকে বলা: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে লোভ, হিংসা, লৌকিকতা ও সম্মানাসক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এভাবে বার বার দু'আ করা। ৪. ক্বালবকে পরিষ্কারকারী আমল যেমন, মাউতের আলোচনা ও স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, অধিক জিকির ও ইস্তিগফার ইত্যাদি করতে থাকা। আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোনিবেশে মত্ত থাকা।

"এ দয়ালুর স্মরণ থেকে এক মুহূর্তও গাফিল থাকা যাবে না। কখন যে তিনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তা তোমার জানা নেই।"

তৃতীয় হালত: রূহের উত্তরে নফস দু'টি প্রস্তাব পেশ করেছিল। রূহ যখন নফসের রাজত্বের দৃঢ়তা দেখলো, তখন সে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মেনে নিল। অর্থাৎ নফস ও শয়তানের সামনে তার অস্ত্র সমর্পণ করলো। তাদের আনুগত্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিল। দুনিয়ার জীবনেও পশুর মতো নিকৃষ্টময় জীবন ও অভিলাষ পূরণে লিপ্ত থাকলো। আর পরকালীন জীবনে দারুজ-জুলমাত তথা অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা হলো। যেমন, আজকের যুগে সন্ত্রাসীদের জীবনচক্র।

চতুর্থ হালত: রূহ দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিল। অর্থাৎ সে রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হলো। খাহিশাতে নফস চরিতার্থের জন্য এসব পন্থাবলম্বন করলো যা আজ যাদু, তেলেসমাতী ও বিজ্ঞান [অর্থাৎ বিজ্ঞানের নামে গোমরাহী] নামে প্রসিদ্ধ। প্রতিপত্তি, প্রতারণা, অহঙ্কার এবং ধনার্জনে সে আজ নেতৃত্বের ভূমিকায় আছে। প্রতারণায় শৃগাল থেকে এগিয়ে। ফন্দিতে সে বানর থেকেও অগ্রসর। ক্রোধের ক্ষেত্রে সিংহ

থেকেও আগোয়ান। পার্থিব মোহে ইঁদুরও তার নিকট হার মানবে। হিংস্রতায় সে শূকর থেকেও অগ্রগামী। অর্থাৎ পার্থিব নেতৃত্বে সে যেনো প্রথম স্থানে উন্নীত। কুরআন মজীদে আছে:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

-"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই, তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" (হূদ (১১) : ১৫-১৬)

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

-"অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই।" (নাজম (৫৩) : ২৯-৩০)

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

-"যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগুতের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে।" (মায়িদা (৫) : ৬০)

এসব লোক নফসের খাহিশকে নিজেদের প্রভু বানিয়েছে।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

-"আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে?" (ফরুক্বান (২৫) : ৪৩)

সে শয়তানকে বানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী।

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

-"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স§রণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। এবং শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।" (যুখরুফ (৪৩) : ৩৬-৩৭)

তাদের রূহ শয়তানের রাজত্ব দৃঢ়করণে এমনসব কৌশল উদ্ভাবন করছে যার সামনে স্বয়ং শয়তানও অক্ষম। হৃদয়ের উপরিভাগের কপাটে একের পর এক আবরণ পড়তেই আছে। ঈমান গ্রহণের কোন যোগ্যতাই আর তাদের মধ্যে বাকী থাকে নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ের কপাটে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন,

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

-"আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (বাক্বারাহ (২) : ৭)

প্রবৃত্তির আরাধনায় তারা প্রাণীকুল থেকে এগিয়ে আছে।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ

-"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জিন ও মানুষ; তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না তারা চতুষ্পাদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর তারাই হল গাফিল, শৈথিল্যপরায়ণ।" (আ'রাফ (৭) : ১৭৯)

এসব লোক প্রবৃত্তির দাসত্বের আকাশে উড়ছে, সমুদ্রে ডুবছে, উড়োজাহাজ দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করছে, জুলুম-নিপীড়নে তাদেরকে দরিদ্র বানাচ্ছে এবং অর্থ ও সম্পদের ভাণ্ডার লুটেপুটে নিচ্ছে। কিন্তু কোন উপায়েই তাদের খাহিশাত পূর্ণ হচ্ছে না। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহইয়া উলূমুদ্দীনের মধ্যে এবং ইমাম জুবাইদী এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যে ব্যক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

শক্তিকে কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জনে কাজে লাগালো এবং তা অনুযায়ী আমল করলো সে ফিরিশতাদের সামঞ্জস্যতা লাভ করলো। সুতরাং সে তাদের সাথে মিশে যাওয়ারই উপযুক্ত। সে ফিরিশতা ও রব্বানী আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

-"যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগুতের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে।" (মায়িদা (৫) : ৬০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

-"তারা তো চতুষ্পাদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।" (ফুরক্বান (২৫) : ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না।" (আনফাল (৮) : ২২)

নীতি ৮- মুজাহাদার সারকথা: ১. পূর্ণ নিয়ত, হিম্মত ও সংকল্প নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে সদা-সর্বদা মনোনিবেশ থাকা, দিলকে গ্বাইরুল্লাহ থেকে খালি করা। যেহেতু কথা ও কর্মের উৎসস্থল হলো নিয়াত ও সংকল্প। সুতরাং, যখন ইখলাস (নিষ্ঠা), উবুদিয়াত (দাসত্ব), রিযার (আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের) আত্মা নিয়তের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন এই রূহই মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কাজ পরিচালনা করবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সমস্ত কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী : ১)

২. ফিতরী শক্তির অপপ্রয়োগের কারণে যে অসৎ-চরিত্রতার সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণে মনেপ্রাণে চেষ্টা করা।

৩. ভবিষ্যৎ জীবনে স্বভাবজাত শক্তির সঠিক ব্যবহারে চেষ্টা করা। চেষ্টাকরণে পিপাসু ব্যক্তির মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে যাওয়া। যেভাবে মাউতের সময় পানির জন্য ছটফট করে।

৪. সকল কর্মকাণ্ড, সংকল্প ও চরিত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ইত্তিবা করা। ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার রচিত ইতহাফে'র ৭ম খণ্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় - وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

-"আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন: "এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা সৎচরিত্র লাভ করবে, সৃষ্টির মধ্যেই তারাই হবে আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী। দূরত্ব ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অনেক ভেদাভেদ আছে। যে যতো বেশী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকের নিকটবর্তী সে ততোই আল্লাহর নিকটবর্তী। কারণ, যে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটবর্তী হবে সে-ও তো নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে।"

নীতি ৯- রিয়াজত-মুজাহাদার উদ্দেশ্য: রিয়াজত-মুজাহাদার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে সব সময় মনোযোগী থাকা উচিত। পূর্ণ হিম্মত নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা চাইতে থাকা। মুজাহাদার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে তাসাওউফ অংশে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত নিসবত অর্জন করা এবং অন্তরকে আসমায়ে হুসনার তাজাল্লির ক্ষেত্র বানানো। আল্লাহ তা'আলার মুশাহাদা, নৈকট্যের উন্মোচন এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে ইবাদতের রূহ বহমান হয়ে যাওয়া। ইমাম গাযযালী এবং ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, "রিয়াজত-মুজাহাদার শেষ উদ্দেশ্য হলো বান্দার হৃদয় সর্বদা আল্লাহর সাথে থাকবে। এই নৈকট্যের উল্টো কোন কাজ তার মধ্যে থাকবে না। এ অবস্থা অর্জন হয় শুধুমাত্র গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। আর গাইরুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের মুজাহাদা।

মুজাহাদা মানেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ। আর এটাই হচ্ছে হিদায়াতের প্রথম স্তর। নিম্ন বর্ণিত আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি উপলব্ধি হয়।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

-“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।” (আনকাবুত (২৯) : ৬৯)

হিদায়াতের এই স্তর অর্জন করার পরই ইহসানের স্তর লাভ হয়। আর এই স্তরের ব্যাখ্যাই নিম্নে উদ্ধৃত হাদীসে এসেছে।

أن تعبد الله كأنك تراه

-“তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো।”

নিম্নের এই আয়াতের মধ্যেও উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে:

وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-“নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।” (আনকাবূত (২৯) : ৬৯)

ইহসানের সৌভাগ্যে প্রবেশকালে যখন আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ হয় তখন আল্লাহর হুজুরী উন্মোচন হয়ে যায়। তাজাল্লির পর্দা সরে পড়ে। আল্লাহর করুণার এমন সূক্ষ্ম বিষয়ের উদ্রেক হয় যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে তাজাল্লি দ্বারা সিফাত উদ্দেশ্য।”

নীতি ১০- প্রতিবন্ধকতা: মাকসাদে উপনীত হওয়ার পর ক্বালবের মধ্যে শান্তির উপাদান সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু শয়তানের শত্রুতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। সে উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়ে, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জনের আসক্তি দিয়ে, নেতৃত্ব ও পার্থিব মোহ দিয়ে আর কখনো জয্ব, উযদ, কাশফ, কারামত, রিয়া, কিবির, প্রতারণা ইত্যাদি দ্বারা এমন তুমুল আক্রমণ শুরু করে যে, যা তার দীর্ঘদিনের রিয়াজত-মুজাহাদা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কখনো তাকে নিয়ে যায় বিদআত ও নিফাকের পথে। আর কখনো পৌঁছে দেয় শিরক ও কুফরের আঁধারে।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

-"হে আল্লাহ! আমার নফসের মধ্যে আপনি তাকওয়া দান করুন, এটাকে পরিশুদ্ধ করুন, কারণ পরিশুদ্ধকরণে আপনিই সর্বোত্তম। আর আপনিই এর অভিভাবক।" (আহমদ : ২৪৫৭৫) শয়তান যদি এই পথে ব্যর্থ হয় তখন সে দুনিয়াবাসীকে শত্রুতার জন্য কাজে লাগায়। সালিককে তখন টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যদি অটল-অবিচল থাকে তাহলে তো উচ্চ স্তর অর্জন করে নিল। তার প্রাপ্য হলো সিদ্দীকিয়াতের স্তর। ইসলামের জন্য সিদ্দীকগণ বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা দৃঢ় ও স্থির চিত্তে এসবের আলিঙ্গন করেছেন। সুতরাং তালিবে সাদিককে শত্রুসম্পর্কে খুবই সজাগ থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

-"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" (ফাতির (৩৫) : ৬)

হে তালিবে সাদিক! মাওলাকে পাওয়ার পথ বড়ই কঠিন। তুমি যদি আল্লাহর কাছে নিজেকে এবং তোমার সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে বিক্রি করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে তোমার আলোকবর্তিকা বানিয়ে ফেলো, তবেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেলে। নতুবা তুমি মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পৌঁছবে মস্কো নগরীতে।

"সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গমালা / অসহায় নিশিতে 'সাদী' একেলা।
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ঢেউয়ের আঘাতে / বাঁচার পথ একটাই হাল ধরো সূন্নাতে।"

নীতি ১১- সায়র ও সুলুকের দু'টি অংশ: ১. সায়র ইলাল্লাহ ও ২. সায়র ফিল্লাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত সালিক তার হৃদয়কে এক আল্লাহর আসমায়ে হুসনার দর্পণ না বানাবে, ততক্ষণ সে সাইর ইলাল্লাহর মধ্যেই থাকবে। যখন তাজাল্লির আয়না বানিয়ে ফেলবে আর তার জামাল ও জালালের মুশাহাদার সুযোগ হয়ে যাবে তখন থেকে সায়র ফিল্লাহর যাত্রা শুরু। যেহেতু আল্লাহর জামাল ও জালাল, আসমায়ে

হুসনা এবং তাঁর শান ও তাজাল্লির কোন শেষ নেই, তাই সায়র ফিল্লাহর মধ্যেও নৈকট্য স্তরের কোন অন্ত নেই। মানুষ যতোই নিকটে যেতে থাকে, ততোই তার দূর্বলতা অক্ষমতা অনুভূত হয়। সমস্ত চেষ্টা সাধনার সারকথা এটাই হয়- যেনো কিছুই হয় নি। আরবী একটি প্রবাদ আছে: "জ্ঞানার্জনের অক্ষমতা জানাই হলো আরেক জ্ঞান"। রিয়াজত মুজাহাদার অর্জন এটাই, মানুষ তার আপাদমস্তকে পাপ ও পঙ্কিলতাই শুধু দেখতে পায়। তার কোন ইবাদতকেই এক আল্লাহর পবিত্র দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য মনে করে না। এই অনাদি অশেষ দরবার তাকে এতো নিঃস্ব বানিয়েছে যে, না তার জ্ঞানের কোন ক্ষমতা আছে আর না কথা বলার কোন শক্তি আছে। সে যা বলে তা এটাই: "হে প্রভু! আমি তোমার পবিত্রতার বর্ণনা দিচ্ছি। তোমার শান তো কতো মহান! তোমার স্তর কতোই না উঁচু!" কুরআনে করীমে আছে,

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

-"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝে নি; কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে তিনি পবিত্র আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।" (যুমার (৩৯) : ৬৭)

সে নিজের পূর্বের ইবাদাতসমূহকে বে-আদবী মনে করে। জালাল ও জামালের মুশাহাদার দ্বারা তার মধ্যে আশ্চর্যজনক এক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সে একদম হতবাক হয়ে যায়। ভয় ও ভালোবাসা একত্রে রূপলাভ করে। ভয় হয়ে যায় প্রেমাসক্ত আর প্রেম হয়ে হয়ে যায় ভয় ও ভক্তিসূলভ। সদাচিন্তা ও পেরেশানী তার অবস্থায় রূপলাভ করে। হ্যাঁ, তার নিঃস্বতা অপারগতা ও পঙ্কিলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ দয়াগুণে মুশাহাদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। আর এই অনুভূতি তার মধ্যে বিনয়, তাওবাহ, ইখলাস, রিযা, উবুদিয়াতের এক নবপ্রাণ সৃষ্টি করে দেয়।

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ أُولَئِكَ

-"তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।" (মুজাদালাহ (৫৮) : ২২)

এই আয়াতের মর্ম তার সামনে আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত করে দেন। আগে তার অনুভূতি ছিলো, যখন মাহবুবে আকবার আল্লাহ তা'আলা মুশাহাদা লাভে ধন্য করেন, তখন অন্তর চক্ষু খুলে যাবে এবং তা দিয়ে তাঁর জামাল ও জালাল প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। কিন্তু কি পরিতাপ, অনুমতি যখন মিলেই গেল এবং তাঁর জামাল ও জালাল দর্শনের রাস্তা খুলে গেলো, তখন তার অন্তরচক্ষু জামাল ও জালালের ভক্তি-প্রভাবের দরুন একদম অক্ষম হয়ে যায়। মাহবুব তো তার সামনে উপস্থিত- কিন্তু ভয়, লজ্জা, আদব এবং নিজের নিঃস্বতার প্রকাশ অন্তর ও চক্ষুকে নীচু করে দেয়। এক আরব কবি বলেন:

ان ليلي تبرقعت * وان حجابا دونها يمنع اللثما قدما توهمت

فلاحت فلا والله ماثم حاجب * سوي إن طرفي كان عن حسنها اعمي

"মিলনের পূর্বে আমার ধারণা হয়েছিল প্রেমাস্পদ পর্দার আড়ালেই আছেন, পর্দার কারণে তাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কী পরিতাপ! তিনি যখন আমার সামনে আসলেন ও তাঁর সৌন্দর্য পর্দাহীন হয়ে গেলো, তখন ভয় ও লজ্জায় অনুভব এমন হলো যে, প্রেমাস্পদের দিকে তাকাতে আমি অক্ষম হয়ে পড়লাম"।

হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "জ্ঞানার্জনের অক্ষমতা জানাই হলো আরেক জ্ঞান"। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-মাকসাদুল আসনা'-তে বলেন, "আ'রিফদের মা'রিফাতের শেষ স্তর হলো- মা'রিফাত অর্জনে অক্ষমতা প্রকাশ করা। প্রকৃতপক্ষে তাদের মা'রিফাত হলো, তারা যেনো তাঁকে চিনেনেই না- তাঁর পরিচয় যেনো তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব"।

স্মরণ রাখা চাই, এসময় শয়তান তার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যখনই সে অলসতার সুযোগ পায় তখনই শত-সহস্র ওয়াসওয়াসা দিয়ে অন্তরকে পঙ্কিলময় করে তুলে। কখনো ওলায়ত, কাশফ ও কারামত এবং ও ওয়াজদের দাবী নিয়ে সামনে আসে। কখনো যশ ও খ্যাতি আর নেতৃত্বের প্রেম এবং সম্পদের মোহ নিয়ে সামনে আসে। আবার কখনো রিয়া, অহঙ্কার নিয়ে জোরেসুরে আক্রমণ করে সালিককে পেছনে হটিয়ে দেয় কিংবা তাকে নিরাশ বানিয়ে রিয়াজত-মুজাহাদা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কখনো বিদআত, নিফাক এবং কুফর-শিরকের মধ্যে লিপ্ত করে একদম নিকৃষ্টতম বানিয়ে দেয়। কখনো আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার তাজাল্লিকে আল্লাহর অস্তিত্ব মনে করে অন্তরকে বাইতুর-রাব, আনাল-হাক্ব, ওয়া

মাফি জুব্বাতি ইল্লাল্লাহ, ইত্তিহাদ ও হুলুল ইত্যাদি শিরকী ও বিদআতী কথাবার্তা বের করে দেয়। [এখানে ভুল-বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই যে, উচ্চ পর্যায়ের সুফি-মাশাইখ ও সাধকদের কিছু উক্তি আজকাল ভ-, পথভ্রষ্ট তথাকথিত 'মা'রিফতী ফকীররা' উচ্চারণ করে বেড়ায় এবং এতে তারা অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করে নিচ্ছে। হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব ভ-দের সম্পর্কেই এখানে উল্লেখ করেছেন। - অনুবাদক]

প্রিয় ভায়েরা! খুবই সাবধান থাকবেন। রাস্তা বড়োই ভয়াতুর। নূরে মুহাম্মদী ছাড়া একটি পা-ও বাড়াবেন না। শয়তান যখন তাকে কাবু করতে পারে না, তখন সে মানব শয়তানদের বিরাট একটা দল নিয়ে চতুর্দিক থেকে আল্লাহর এই বান্দার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব শয়তানরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে উত্তাল লড়াই শুরু করে দেয়। এই বান্দাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে কোন চেষ্টাই তারা ছাড়ে না। সে কাফির হয়ে গেছে, ফাসিক হয়ে গেছে এরকম ফাতোয়ার বই প্রকাশ করে। তার রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।

মাদারিজুস সালিকীনে হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটাই হলো শয়তানের শেষ চক্রান্ত। আল্লাহর তাওফিকে যদি বান্দা এ যুদ্ধে সফল হয় তবেই সে প্রকৃত সফল। হে আল্লাহ! তোমার সীরাতে মুস্তাকিমের উপর আমাদেরকে পূর্ণ ইস্তিকামাত দান করো এবং এর উপরই মৃত্যু দাও। হে পরম করুণাময়!

নীতি ১২- অন্তরের কাইফিয়াত: সালিক কবজ (সংকোচন) এবং বসত (বর্ধন) উভয় গুণের সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে নবীন ও প্রবীণ উভয়ই সমান। হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ, এবং হযরত হানযালা রাদ্বিআল্লাহু আনহু যিনি ওহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, এই উভয় বুজুর্গের একটি ঘটনা এক্ষেত্রে শক্ত দলীল। সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত আছে: "হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিদমাতে একদিন হযরত হানযালা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাশরিফ নিলেন। সিদ্দীকে আকবার রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো হানযালা? তিনি জবাব দিলেন, আমি তো মুনাফিক হয়ে গেছি! হযরত সিদ্দীকে আকবার বললেন, এ কী বলছো? তিনি জবাব দিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

দরবারে যাই এবং তাঁর উপদেশ শ্রবণ করি, তখন মনে হয় যেনো বেহেশত-দোযখ সামনে এসে গেছে। আর যেনো আমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু যখন বাড়িতে ফিরে আসি আর পরিবার পরিজন নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ি তখন আর অন্তরের এই কাইফিয়াত থাকে না। হযরত সিদ্দীকে আকবার বললেন, এটা তো আমারও অবস্থা। তখন এই উভয় বুজুর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শোনে বললেন, যদি আমাদের মজলিসের অবস্থা সবসময় এরকম হয়ে থাকে, তবে তো তোমাদের জন্য চলাফেরা দুষ্কর হয়ে পড়বে। ফিরিশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করবে আর তোমাদের পার্থিব জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ভয় পেয়ো না, পার্থিব প্রয়োজনে মশগুল হয়ে হৃদয়ে যে পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয় তা আমার মজলিসে উপস্থিত হয়ে দূর করে নিও। আর এটাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট।"

পবিত্রতা অর্জন অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

-"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের কাছে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন।" (আলে ইমরান (৩) : ১৬৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

-"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।" (শামস (৯১) : ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" (বাক্বারাহ (২) : ২২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" [সহীহ মুসলিম :৩২৮]

প্রসঙ্গ: তাহারাত বা পবিত্রতা দু' প্রকার: বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক পবিত্রতা আবার দু' প্রকার: প্রথমতঃ প্রসাব-পায়খানা ইত্যাদি প্রকৃত নাপাকী থেকে পবিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ রূপক নাজাসাত যেমন জানাবাত ও হদস থেকে পবিত্রতার জন্য গোসল ও অযু। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাও দু' প্রকার: প্রথমত জবান, পেট এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম, মাকরূহ এবং সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা। দ্বিতীয়ত অন্তর পবিত্র করা। আর এটাও কয়েক প্রকারের: ১. শিরক, কুফর, নিফাক,

বিদআত, ইলহাদ, আজে-বাজে সংকল্প এবং নিকৃষ্ট আবেগ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। ২. লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, রিয়া, ক্রোধ, কৃপণতা, আত্মম্ভরিতা, পার্থিব মোহ এবং যশ ও খ্যাতির আসক্তি ইত্যাদি অসৎ চরিত্র থেকে অন্তর পবিত্র করা। ৩. অন্তরকে গ্বাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করা এবং ক্বালবের অন্তঃস্থলে গাইরুল্লাহর জন্য কোন স্থানই বাকী না রাখা। তাহারাতে উল্লেখিত প্রকারসমূহ উপলব্ধি করার পর 'ঈমানের অর্ধেক হলো পবিত্রতা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি সহজেই বুঝে আসবে। কেননা, হাদীসে উল্লেখিত ঈমান শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীন ইসলাম। এর অংশ দু'টি: ১. তাযকিয়া ও তাতহির তথা পবিত্রকরণ; ২. তাহলিয়া ও তা'মির তথা অলঙ্করণ।

সুতরাং জেনে রাখুন, যে শাস্ত্রে তাযকিয়া ও তাহলিয়া তথা পবিত্রকরণ ও অলঙ্করণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তাকেই বলে ইলমে তাসাওউফ। এর উদ্দেশ্য সিররে ক্বালব তথা অন্তরের অন্তঃস্থলকে গ্বাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহ তা'আলার বে-ক্বাইফ হুজুরী (নিরাকার উপস্থিতি) দ্বারা অলংকৃত ও সুশোভিত করা।

সুতরাং ঐ লোকই বড়ো সৌভাগ্যবান যার হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাজাল্লির আয়না এবং বে-ক্বাইফ হুজুরীর নীড় বানিয়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তুমি এই অধমকে এই পরম সৌভাগ্য দান করো।

"তিনিই সুফি হতে পারেন, যিনি শরীয়তের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন।"

অন্তর হলো দেহের রাজা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلحَتْ صَلحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

"নিশ্চয় শরীরে একটি মাংসখণ্ড আছে, এটা যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে সমস্ত শরীরই সুস্থ হয়ে উঠে।" [সহীহ বুখারী] এই জন্যই অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি হলো এই শাস্ত্রের মূল। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে কর্ম সংঘটিত হয়, তার সংকল্পস্থল হচ্ছে অন্তর। সুতরাং অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক ও ইলম অর্জন করে নেয় এবং আক্বীদা বিনষ্টকারী জ্ঞান ও কর্ম থেকে পবিত্রতা অর্জন করে ফেলে, তাহলে যেনো সমস্ত মানুষটি পরিশুদ্ধ

হয়ে ওঠলো। হাত যা করে, মুখ যা বলে, পা যেদিকে চলে, চোখ যা কিছু দেখে এবং পেট যা কিছু ভক্ষণ করে তা সবকিছুই তো অন্তরের সংকল্পের ফলাফল। তাই নিয়ত ও সংকল্প যদি সুস্থ হয় এবং ইখলাস ও সত্যতা সৃষ্টি হয়- তবে তো সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হয়ে গেল। অন্তরের রোগ প্রচুর। আমরা এখানে কেবল মূল রোগগুলোর উপর আলোকপাত করবো।

অন্তরের রোগ-ব্যাধি ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন

"হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয়কে শিরক, কুফর, নিফাক, বিদআত, ইলহাদ, মন্দ সংকল্প ও লোভ থেকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিংসা, অহঙ্কার, ক্রোধ, রিয়া, কৃপণতা, আত্মম্ভরিতা, কাপুরুষতা, পার্থিব মোহ, যশ ও খ্যাতির আসক্তি, মাওলা থেকে গাফলতি, ওয়াসওয়াসুল খান্নাসের অনিষ্ট, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

শিরক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

-"নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।" (লুক্বমান (৩১) : ১৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, এছাড়া যাকে ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন।" (নিসা (৪) : ১১৬)

আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোকে শিরক বলে। এটার অনেক প্রকার আছে। প্রথমতঃ তিন প্রকার: ১. আল্লাহর সত্তার সাথে শরীক করা। অর্থাৎ অন্য কাউকে আল্লাহর মতো মনে করা। যেমন: কাউকে আল্লাহ তা'আলার মতো ওয়াজিবুল উজুদ (যার অস্তিত্ব আবশ্যক), ক্বাদিম (অবিনশ্বর) বা সিফাতে কামালিয়াত অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা। এ সবকিছুই শিরক। পক্ষান্তরে তাওহীদ ফীয্যাত তথা সত্তার একত্ববাদের মর্ম হলো আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদিক দিয়ে একক বিশ্বাস করা। এমনকি এই একক সত্তার প্রভাব তার দেহমনে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, তার মধ্যে দ্বিতীয় কোন সত্তার অনুভবই হবে না।

দ্বিতীয় কোন সত্তার প্রতি তার হৃদয়ে মনোনিবেশের সৃষ্টিই হবে না। ২. শিরক ফীস্সিফাত (গুণাবলীর সাথে অংশীদার করা) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এক বা একাধিক গুণের সাথে কাউকে সমান মনে করা। মনে করুণ ইলম হচ্ছে একটি সিফাত। এরকম বলা যে, আমাদের ইলম আল্লাহ তা'আলার ইলমের মতো বা তিনি যেভাবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, অনুরূপভাবে অমুক ওলি কিংবা নবীও জ্ঞান রাখেন। শিরক থেকে অন্তরকে পাক করা ফরয। এটাই হলো 'তাওহীদ ফী ইলমিল্লাহ' অর্থাৎ অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলার ইলম আমাদের ইলমের মতো নয়। আটলান্টিক মহাসাগরের সামনে এক ফোটা পানি যেরূপ তুচ্ছ, তদ্রূপ নবী-রাসূল, ফিরিশতা, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এবং সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমের সামনে তুচ্ছ।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এবং হযরত খিযির আলাইহিস্সালাম সম্পর্কিত একটি ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। হযরত খিযির আলাইহিসসালাম হযরত মূসা আলাইহিসসালামকে নিয়ে একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। তখন একটি পাখি নৌকায় বসে এক ফোটা পানি পান করে উড়ে গেল। খিযির আলাইহিসসালাম বললেন,

يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ

-"হে মূসা! আল্লাহর ইলমের সামনে আমার, তোমার এবং সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনা এতটুকু, যেটুকু এই সমুদ্রের এক ফোটা পানি পাখিটি পান করলো।" (সহীহ বুখারী : ৩১৪৯) ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহইয়া উলূমিদ্দীন গ্রন্থে 'তাফাক্কুর' [গবেষণা] অধ্যায়ে আলোচনা করেন: "যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের সামনে সমস্ত নবী, ওলি, ফিরিশতা এবং জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের জ্ঞান উপস্থাপন করা হয় তবে এসবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে"। সত্যের সন্ধানী! তুমি আল্লাহর ইলমের মতো তাঁর অন্যান্য গুণ যেমন, কুদরত, কায়্যিউমিয়াত (চিরন্তনতা), কুদ্দুসিয়াত (পবিত্রতা), আজমাত (মাহাত্ম্য), ইরাদা (ইচ্ছাশক্তি), কালাম (কথাবার্তা), সামা' (শ্রবণ), বাছর (দৃষ্টি) ইত্যাদি উপলব্ধি করে নাও। ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "সিফাত দু' প্রকার: যাতি সিফাত ও ফি'লী সিফাত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, যে সিফাত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি, তাহলো যাতি সিফাত। যেমন: কুদরাত, ইলম, ইয্যাত ও আযমাত। আর যেসব সিফাত নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য

ব্যবহার করেছেন তাহলো ফি'লী সিফাত। যেমন: রাহমাত, গযব, সাখাত (ক্রোধ)"। ইবনুল আলিম (লেখক) বলছি, একদল তত্ত্ববিদের মতে রাহমান হচ্ছে আল্লাহর যাতী সিফাত। কারণ, এ শব্দের অর্থ হলো দয়া-করুণার উৎস। আর রাহীম হচ্ছে ফি'লী সিফাত। কারণ, এর অর্থ হলো যাকে ইচ্ছা তার উপর তিনি করুণা ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি (মুহাম্মদ হলেন) মু'মিনদের উপর রাহীম তথা করুণাময়ী"। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার রচিত 'তাফসীরে লাতায়িফে রাব্বানিয়া'র মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩. শিরক ফীল আফআ'ল (অন্য কারো কর্মকে আল্লাহর কর্মের মতো মনে করা): আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসার মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করেন, অন্য কারো জন্য এই ক্ষমতা নেই এবং বিরোধিতা করারও শক্তি নেই। কুরআন শরীফে আছে:

مَن يَهْدِ اللّٰه فَهُوَ المهتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِدًا

-"আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না।" (কাহাফ (১৮) : ১৭)

কেননা, কোন ব্যক্তির মধ্যেই কাউকে উপকার দান করা কিংবা ক্ষতি করার স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ক্ষমতা নেই। কোন নবী, ওলি, আলিম, এমনকি শয়তান, ফিরাউন এবং যাদুকর এরা কারোর জন্য না উপকার করার কোন ক্ষমতা আছে, না ক্ষতি করতে তারা সক্ষম। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে যায় তবে তো এরকম হবেই। তাই হে সত্যের সন্ধানী! তুমি এরকমই আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য কর্ম যেমন, খালক (সৃষ্টি করা), রিজক (খাদ্য দান), রাহিমিয়াত (করুণা করা) এবং গাফুরিয়াত (ক্ষমা করা) ইত্যাদি বুঝে নাও। এসব গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ একক- তাঁর কোন শরীক নেই। তোমার মধ্যে যখন কামিল তাওহীদ সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন তুমি আল্লাহ এবং তাঁর কর্ম ছাড়া অন্য কোন কর্মী কিংবা কর্মের কথা চিন্তাই করবে না।

উল্লেখিত প্রকারগুলোর প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার: ১. ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত), ২. ক্বাওলী (কথাবার্তামূলক) এবং আমালী। শিরক প্রকাশ্যে হতে পারে আবার গোপনেও হতে পারে। যেমন, রিয়া হলো শিরকে খফি। শিরক প্রভুত্বের মধ্যে হতে পারে কিংবা ভালোবাসার মধ্যেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

-"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হতো যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" (বাক্বারাহ (২) : ১৬৫)

হে করুণাময়ের অন্বেষী! তোমাকে সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র হতে হবে। এর মুকাবিলায় তাওহীদকে তোমার অর্জন করতেই হবে।

তাওহীদ ফীল মুহাব্বাতের কামিল স্তর হলো অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভালোবাসার স্থান না দেওয়া। হ্যাঁ যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে মুহাব্বাত করতে নির্দেশ দেন তাহলে তো করতেই হবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সমস্ত নবী-রাসূল আলাইহিমুস-সালাম, ফিরিশতা, উলামায়ে রাব্বানী, তালিবে ইলম, মা-বাবা, শিক্ষকগুলী, মাশাইখ এবং নেক মু'মিনদেরকে মুহাব্বাত করা। তাঁদের সাথে মুহাব্বাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কারণ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অথবা আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা উভয়টিই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া, শিরকের আরো অনেক প্রকার আছে। যেমন, শিরক ফীত-তা'জিম (সম্মান প্রদর্শনে শিরক করা), ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

"ভয় তো একমাত্র আমাকেই করবে"। (বাক্বারা (২) : ৪০) শিরক ফীদদু'আ- যেমন কোন নবী কিংবা ওলীকে বিপদ দূরকারী কিংবা প্রয়োজন সমাধাকারী মনে করে তার নিকট দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

-“কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন?।” (নামল (২৭) : ৬২)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ

-“যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও।” (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৬৭)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

-“তখন তারা ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে।” (ইউনুস (১০) : ২২)

এখানে আমরা শিরকের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশক কুরআনে করীমের একটি দীর্ঘ আয়াত উল্লেখ করছি। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ *أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

-“বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা- তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই; অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়। বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে

পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।” (নামল (২৭) : ৫৯-৬১)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

-“বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।” (বাক্বারাহ (২) : ১১১)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

-“বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোণ্ডল ও ভূণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না।” (নামল (২৭) : ৬৫)

বি:দ্র: গ্বাইরুল্লাহকে সিজদা করা, যেমন কোন ওলির কবরে সিজদা দেওয়া অথবা কোন পীরকে সিজদা করা এ সবই শিরক। কোন ব্যক্তি যদি নামাযে সিজদার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা খানায়ে কাবার সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা করে, তবে তা-ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا

-“মসজিদসমূহ আল্লাহ তা’আলাকে সঽরণ করার জন্য অতএব, তোমরা আল্লাহ তা’আলার সাথে কাউকে ডেকো না।” (জিন (৭২) : ১৮)

কুফর অধ্যায়

কুফরের শাব্দিক অর্থ 'আবৃত করা'। পরিভাষায় বলা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন, এর কোন একটি অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা- যদিও এটা রাসূলুল্লাহর একটি সুন্নাত হউক না কেন। [আল-মুসায়ারা, রাদ্দুল মুখতার]

কুফরের অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। ১. জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করা। ২. পূর্ণ শরীয়তের উপর বিশ্বাস পোষণ করা কিন্তু এর কোন একটি অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা। ৩. পূর্ণ শরীয়ত সঠিক আছে বলে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করা। ৪. পূর্ণ শরীয়তের উপর বিশ্বাস আছে কিন্তু শরীয়তের কোন একটি বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

-"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" (তাওবাহ (৯) : ৬৫-৬৬)

যেমন: দাড়ি নিয়ে তামাশা করা। এটাকে শয়তানের আস্তানা বলা, উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ইত্যাদি সবকিছুই কুফরের অন্তর্ভুক্ত। তালিবে সাদিকের উচিৎ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ শরীয়ত, উলামায়ে রাব্বানী ও ইসলামী শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা। যদি এর বিপরীতমুখী কোন কথা বের হয়ে যায়, তাহলে অতি দ্রুত সংশোধন করে নেবে এবং নিজের ঈমানকে নতুন করে তাজা করবে।

বি:দ্র: ইসলামী শিক্ষার্থীদের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব লোক যারা দ্বীনকে জীবিত রাখতে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে জ্ঞানার্জন করে। পক্ষান্তরে যারা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষার্জন করে তারা তো ভালোবাসার যোগ্যই নয়- বরং এরা শয়তানের চেলা।

নিফাক অধ্যায়

নিফাক (কপটতা) দু’ প্রকার: ১. নিফাকে ই’তিক্বাদী (বিশ্বাসগত কপটতা) অর্থাৎ, ধোঁকা ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণের দাবী করা। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে আছে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

-“নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।” (নিসা (৪) : ১৪৫)

২. নিফাকে আমালী (কর্মের কপটতা)। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের হাদীসে এর নিদর্শন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার আমানত রাখা হয় তখন সে খিয়ানত করে। হাফিজ ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, নিফাক হলো মুখে ভালো কথা প্রকাশ করা এবং অন্তরে অনিষ্ট লুকিয়ে রাখা। এটা কয়েক প্রকার: ১. আক্বীদাগত নিফাক। আক্বীদাগত মুনাফিক সব সময় জাহান্নামে থাকবে। ২. কর্মের নিফাক। এটাও একটি কবিরা গুনাহ। ইনশাআল্লাহ! যথাস্থানে এর সবিস্তর আলোচনা হবে। অনুরূপ কথাই ইবনে জুরাইজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মুনাফিক হলো ঐ ব্যক্তি যার কর্মে ও কাজে মিল নেই। যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরে কোন সামঞ্জস্য নেই।

ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, এসমস্ত আয়াতের সার কথা হলো: মু’মিন দু’ প্রকার: ১. মুকাররাবূন তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং ২. আবরার তথা সৎ ও নেক। কাফিররাও দু’ প্রকার: ১. আহ্বানকারী এবং ২. অনুগামী। এভাবে মুনাফিকরাও দু’ প্রকার: ১. প্রকৃত মুনাফিক ও ২. নিফাকের কিছু নিদর্শন আছে এমন মুনাফিক।

সহীহাইনের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

-"যার মধ্যে চারটি কর্ম পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর একটিও পাওয়া যাবে তার মধ্যেও নিফাক আছে বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না সে এটা বর্জন করেছে। তাকে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করলে তাতে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিজ্ঞা করলে ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করলে অবাধ্যতা অবলম্বন করে।"

উলামায়ে কিরাম উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন, মানুষের মধ্যে হয় ঈমানের একটি শাখা অথবা নিফাকের একটি শাখা থাকবে। এটা কর্মগত হতে পারে, যেমন উক্ত হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। অথবা আক্বীদাগত হতে পারে যেমনিভাবে উপরোল্লিখিত আয়াতে করীমে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ

-"ক্বালব চার প্রকার: ১. উন্মুক্ত হৃদয়: এটা হচ্ছে চমকপ্রদ একটি বাতির মতো; ২. অবরুদ্ধ হৃদয়; ৩. অবনমিত হৃদয় এবং ৪. প্রশস্ত হৃদয়। উন্মুক্ত হৃদয় হলো মু'মিনের। এ হৃদয়ে আলোকপ্রদ একটি বাতি আছে। অবরুদ্ধ হৃদয় হলো কাফিরের; অবনমিত হৃদয় হচ্ছে মুনাফিকের, সে দীনের পরিচয় পাওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করলো; এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ঈমান ও নিফাক উভয়টি বিদ্যমান। তার ঈমানের উদাহরণ হলো শস্যের মতো, যাকে পরিস্কার ও পবিত্র পানি বাড়িয়ে তুলে। আর নিফাক হলো যখমের মতো যাকে পুঁজ

ও রক্ত বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখিত দু'টি অবস্থার মধ্যে যেটি প্রাধান্য লাভ করবে, সেটাই তার জন্য বিবেচ্য।" (আহমদ: ১০৭০৫)

বিদআত পরিচ্ছেদ

বিদআত দু' প্রকার। ১. ই'তিক্বাদী বা বিশ্বাসগত, অর্থাৎ এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ কোন আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন কাদরিয়া, যাবরিয়া, রাফিজী ইত্যাদি ফিরকার আক্বীদা-বিশ্বাস। ২. বিদআতে আমলী (কর্মগত) অর্থাৎ সওয়াব মনে এমন আমল করা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন, উরুস, কাওয়ালী ইত্যাদি। তালিবে রাহমানের জন্য আবশ্যক হলো, সব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং সর্বপ্রকার বিদআত থেকে বেঁচে থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার বিদআতকে পথভ্রষ্টতা বলেছেন। আর এখানে বিদআত বলতে শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য- শাব্দিক নয়। পরিভাষায় বিদআত বলা হয়, ধর্মের বাইরে কোন কিছুকে দ্বীন মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

-"যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করলো, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ বুখারী : ২৪৯৯) শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে ই'তিক্বাদী কিংবা আমালী যে কোন প্রকার বিদআতই হোক, তা সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত। ইবনে হাজার মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং উম্মাহর অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই মত পোষণ করেন। বিদআতকে যে হাসানা ও সায়্যিআয় বিভক্ত করা হয়েছে তা মূলত শাব্দিক অর্থে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির [বিদআতী কর্মকাণ্ডের] প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা ঈমানের নিদর্শন। পক্ষান্তরে [বিদআতী কর্মকাণ্ডের কারণে] তাকে ভালোবাসা কিংবা তাকে শ্রদ্ধা করা তা'লিবে রাহমানের জন্য বিষধর ঘাতক।

ইলহাদ পরিচ্ছেদ

হক থেকে বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়াকে ইলহাদ বলা হয়। এটা কয়েক প্রকারের হতে পারে। মুলহিদ (ধর্মত্যাগী), দাহরী (প্রকৃতিবাদী) এবং জিন্দিক

(ধর্মদ্রোহী) এরকম লোক ইলহাদের সাথে জড়িত। জিন্দিক ঐ লোককে বলে যে বাহ্যতঃ মুসলমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট। সে কুরআন ও হাদীসের রূপক অর্থ সাধারণ মানুষকে শুনিয়ে তার পথভ্রষ্টতার বিকাশ ঘটায়। যেমন সে বলে: মানুষ যখন কামিল হয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীনের স্তরে উপনীত হয় তখন তার বাহ্যিক ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। সে আরো বলে: মদ, আফিং, গাঁজা ইত্যাদি হারাম নয়! তোমরা শরীয়তের বাহ্যিক অনুসরণ করো, আর আমরা শরীয়তের অভ্যন্তরকে অনুসরণ করি। আমাদের কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সব সময়ই নির্দেশ আসছে। কুরআন শরীফের এই আয়াতের:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

-"এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।" (হিজর (১৫) : ৯৯) -অপব্যাখ্যা করে বলে, ইয়াক্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'হাক্কুল ইয়াক্বীন'। তারা হযরত মূসা ও হযরত খিযির আলাইহিমা আসসালাম এর মধ্যকার ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে। আল্লাহ যদি আমাদের তাওফিক দান করেন, তবে ভবিষ্যতে এর উপর সবিস্তর আলোচনা করবো।

অতীতকালে অনেক জিন্দিক দল ছিলো: যেমন, বাতিনিয়া, কেরামতিয়া, ইবাহিয়া, ইসমাঈলিয়া এবং নাসিরিয়া ইত্যাদি। বর্তমান যুগের কয়েকটি জিন্দিক দল যেমন, কাদিয়ানী, নেচারী সাইন্সপুরুস্ত (প্রকৃতি-পূজারী) এবং পথভ্রষ্ট সুফি দাবীদার। উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে এ সমস্ত ফিরকাই হলো বর্তমান যুগের দাজ্জাল। এরা ইসলামের বড়ো শত্রু তালিবের জন্য আবশ্যক হলো, এসব ভ্রান্ত ফিরকার ধ্যান-ধারণা ও তাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা।

তাদের শান-শওকত ভেঙ্গে দিতে সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সবচেয়ে বড় জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

-"আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না, নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে।" (হূদ (১১) : ১১৩)

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

-“তবে স§রণ হওয়ার পর জালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না।” (আন’আম (৬) : ৬৮)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

-“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও সুন্দর উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।” (নাহল (১৬) : ১২৫)

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

-“তাদের সাথে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।” (ফুরক্বান (২৫) : ৫২)

এসব দাজ্জালকে নিশ্চিহ্ন করা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের জন্য একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। জিযিয়া নিয়েও দারুল ইসলামে তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া যাবে না [রাদ্দুল মুখতার পৃ: ৩০৬, খণ্ড ৩]।

কখনো আল্লাহর নাম ও সিফাত নিয়ে ইলহাদ হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা’আলার কোন সিফাত মানা আর কোনটা না মানা অথবা অপব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। এ বিষয়েও আমরা সবিস্তর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ!

তালিবে রাহমানের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ তা’আলার যতো নাম ও গুণাবলী কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে, এগুলো সবই আল্লাহ তা’আলার জন্য। সবই তাঁর শানে রাব্বানীর উপযুক্ত, আমাদের গুণাবলীর মতো নয়। তাঁর জ্ঞান, করুণা, ভালোবাসা, অবতরণ ও চেহারা ইত্যাদি তাঁর শান অনুযায়ী বিবেচ্য হবে। আমাদের মতো এসব নয়। তাঁর শান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

-“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।” (শুরা (৪২) : ১১)

আমরা এই বলে বিশ্বাস করি, “আমরা আল্লাহ তা’আলার উপর ঈমান আনলাম, যেভাবে তিনি তাঁর নামাবলী গুণবিশিষ্ট অবস্থায় আছেন।”

উল্লেখিত অবস্থা হলো আমাদের মতো দুর্বল মানুষের। কিন্তু যারা ওলিয়ে কামিল হয়ে গেছেন, তারা তো আসমায়ে হুসনার মধ্যে নিমগ্ন থাকেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আল-জামুল আউয়াম' গ্রন্থে প্রথমে উলামা এবং আওয়াম লোকদেরকে আসমায়ে হুসনার বিশাল সমুদ্রে ডুব দিতে নিষেধ করেছেন। এর পরই কামিল আওলিয়াদের সম্পর্কে লিখেন, মা'রিফাতের সাগরে যারা সাঁতার কাটতে দক্ষ, তাদের জীবন অক্ষম হয়ে পড়ে। তারা পার্থিব আরাম-আয়েশ এবং সমগ্র সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাদের জ্ঞান ও কর্ম একমাত্র আল্লাহর জন্য। তারা শরীয়তের আইন-কানুন মেনে চলেন, নিষিদ্ধ কাজ ও কর্ম বর্জন করেন। হৃদয়কে তারা গাইরুল্লাহ থেকে একদম খালি করে দেন। আল্লাহর মুহাব্বাতের মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউস অর্জনের লক্ষ্যে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করেন। এসব লোকজনই পারেন মা'রিফাতের গহীন সাগরে ডুব দিতে। এতদসত্ত্বেও তারা বিরাট আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। তাদের দশ জনের মধ্যে একজনই কেবল গোপন মণি-মুক্তা লাভে ধন্য হোন। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

-"যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে।" (আম্বিয়া (২১) : ১০১)

টীকা ১: শিরক, কুফর, নিফাক, বিদআত এবং ইলহাদ ইত্যাদি থেকে ঈমানকে বাঁচানো একান্ত জরুরী। আর এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা পোষণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করতে থাকা, 'হে আল্লাহ! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার উপর আমার মৃত্যু দান করুন'। এই জামাআতই সীরাতে মুস্তাক্বিমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাফসীরে লাতাইফে রাব্বানিয়া, রূহুল মা'আনী এবং ইতহাফ ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার উপর সবচে উত্তম বই হলো ইমাম ইবনুল হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'আল-মুসামারাহ ফিল আক্বাইদিল মুনজিয়া ফিল আখিরাহ' এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুসায়ারাহ'। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছেই গ্রন্থদ্বয় রাখা একান্ত জরুরী। মাদারিসে ইসলামীয়ার পাঠ্যপুস্তকে এর অন্তর্ভুক্তি খুবই জরুরী। হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! আপনার নির্বাচিত রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহ ও তুফায়েলে আমাদের হৃদয়কে এসব বিষয় থেকে পবিত্র করে দিন যা আপনার মুশাহাদা ও মুহাব্বাত থেকে

আমাদেরকে দূরে রাখে। সুন্নাত ও জামাআত এবং আপনার সাক্ষাত লাভের অতিশয় আগ্রহের উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন।

টীকা ২: ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি ইহইয়ার মধ্যে এবং ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি ইতহাফের (খন্ড ৮, পৃ: ১৩৯) মধ্যে বলেন, সঠিক মত হলো, সাহাবায়ে কিরামই হলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কেননা, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন দলটি মুক্তিপ্রাপ্ত? তখন তিনি উত্তর করেছিলেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "যারা আমি এবং আমার সাহাবাদের রাস্তা অনুসরণ করছে।" (হাদীস : ২৫৬৫) 'ইফতিরাকে উম্মাতের' এই হাদীসখানা ইমাম তিরমিযিসহ অন্যান্য হাদীসবিদগণ স্ব-স্ব গ্রন্থে একটু শাব্দিক পরিবর্তসহ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসখানা ১৪ জন সাহাবা রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম জুবাইদী এর ব্যাখ্যায় বলেন, এসব বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল একমাত্র সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবেন। ইমাম গায্যালী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম পার্থিব যাকিছু গ্রহণ করতেন তা একমাত্র দ্বীনের জন্য- দুনিয়ার জন্য নয়। তাঁরা দুনিয়াকে একদম বর্জন করতেন না। কাজ কর্মে তারা মধ্য পন্থা অবলম্বন করতেন।

নিয়াত

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

-"সমস্ত কাজ নিয়াতের উপর নির্ভরশীল।" [সহীহ বুখারী (১), সহীহ মুসলিম]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

-"জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে।" (যুমার (৩৯) : ৩)

তিনি আরো বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

-"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বায়্যিনাহ (৯৮) : ৫)

নিয়ত হলো সবকিছুর মূল। নিয়ত শুদ্ধ হলে পুরো মানুষটিই শুদ্ধ। তালিবে সাদিকের জন্য আবশ্যক হলো তার অন্তরে কোন কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া মাত্রই শরীয়তের আলোকে তা যাচাই-বাছাই করে নেবে। যদি শরীয়তে তা অনুমোদিত হয় তবে এর সংকল্প করবে নতুবা পরিত্যাগ করবে। শরীয়ত অনুমোদিত কাজ সম্পাদনে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করবে। নফসের চাহিদা কিংবা শয়তানের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবেই অন্তরে ইখলাস পয়দা হবে এবং নিজেকে বানিয়ে দেবে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মুহাব্বাতের পাত্র। মুসনাদে আহমদ এবং মুসতাদরাকে হাকীমে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে:

اتق الله عند همك إذا هممت

-"যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করো, তখন আল্লাহকে ভয় করো।"

আমল তিন প্রকার: ১. শরীয়তে অপছন্দনীয় আমল। হারাম, মাকরুহ ও খিলাফে আওলা (অনুত্তম) এগুলো হলো এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। ২. শরীয়ত অনুমোদিত (মুবাহ) আমল। যদি কেউ শুদ্ধ নিয়তে এরকম কাজ করে তবে তা শরীয়তে খুবই প্রশংসিত। ৩. শরীয়তের পছন্দসই আমল। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব এর অন্তর্ভূক্ত।

তালিবে রাহমানের অন্তরে যদি প্রথম প্রকার আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখন তা থেকে নিয়াতকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে নেবে ও নফসকে তিরস্কার করবে। দ্বিতীয় প্রকার আমল যদি করতে হয়, তবে তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করবে এবং প্রয়োজনমাফিক করবে। তৃতীয় প্রকার আমলের ক্ষেত্রে কামিল ইখলাসের চেষ্টা করবে। সাথে সাথে তা বেশী বেশী করার প্রচেষ্টা চালাবে। যদি অক্ষমতার কারণে কাজ করতে না পারো, তবে দিলের মধ্যে খুবই আগ্রহ পোষণ করবে। কেননা, মন্দ কাজের নিয়াত যেমন মন্দ তেমনি ভালো কাজের নিয়াত করাও একটি ভালো কাজ। এর দ্বারা নূর সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

النَّاسَ يُبْعَثُونَ يوم القيامة بَعْدَ مَوْتِهِمْ على قدر نياتهم

-“কিয়ামতের দিন মানুষ তাদের নিয়তের আলোকেই উত্থিত হবে।” [মুসনাদে আহমদ]

অত্র অধ্যায়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাহাল ইবনে হানিফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

-“যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা’আলার নিকট শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।” [সহীহ মুসলিম (৩৫৩২), সুনানে নাসাঈ] হযরত মু’আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من سأل الله الشهادة مخلصا ، أعطاه الله أجر شهيد ، وإن مات على فراشه

-“যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা’আলার নিকট শাহাদাত কামনা করেন, আল্লাহ তাকে শহীদের বিনিময় দান করবেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে”। [সহীহ হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকীম] আবু কাবশা আনমারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ

-“আমি তিনটি বিষয়ের জন্য শপথ করছি। আর তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করছি তা স্মরণ রাখবে। যে তিনটি বিষয়ের শপথ করছি এগুলো হলো: ১. সাদাকা দ্বারা বান্দার মালের কোন হ্রাস হয় না, ২. বান্দাহ যখন জুলুমের উপর ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং ৩. বান্দাহ যখন ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ তখন দারিদ্র্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন। আমি তোমাদের কাছে যে হাদীসের বর্ণনা দিচ্ছি তা স্মরণ রাখো। পৃথিবী হচ্ছে চার ধরনের লোকের জন্য: ১. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন, সে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাতে আল্লাহর কী হাক্ব আছে তা সে জানে। সে শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত। ২. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন কিন্তু মাল দেন নি, সে নিয়তের মধ্যে নিষ্ঠাবান। সে বলে, যদি আমার মাল হতো আমি ঐ লোকটার মতো কাজ করতাম। তারা উভয়েই সমান বিনিময় পাবে। ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দেন নি, সে অর্থের কারণে স্বেচ্ছাচার হয়ে যায়। প্রভুকে ভয় করে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং অর্থের মধ্যে আল্লাহর যে প্রাপ্য রয়েছে, এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান রাখে না। এ লোকটি নিকৃষ্টতম স্তরে অধঃপতিত। ৪. যাকে আল্লাহ মাল এবং জ্ঞান কিছুই দেন নি। সে বলে যদি আমার মাল হতো তাহলে ঐ (৩য়) ব্যক্তির মতো কাজ করতাম। এটা হলো তার দৃঢ় সংকল্প। তারা উভয়ই সমান পাপের ভাগীদার হবে।” (আহমদ:১৭৩৩৯, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

লোভ অধ্যায়

কোন বস্তু অর্জনের পূর্ণ আশা পোষণ করা এবং তা অর্জনে পূর্ণ হিম্মাত প্রয়োগ করাই হলো লোভের প্রকৃত অর্থ। এটা দু'প্রকার: ১. ভালো কাজের লোভ- অর্থাৎ শরীয়তের পছন্দসই বস্তু অর্জনের চেষ্টা পোষণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا

-"আল্লাহ তোমার লোভ বৃদ্ধি করে দেন।" [সহীহ বুখারী : ৭৪১] এখানে লোভ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভালো কাজের প্রতি অতিশয় আগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

منهومان لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع ، ومنهوم في دنيا لا يشبع

"দু'জন লোভী কখনো পরিতৃপ্ত হয় না- (১) জ্ঞানের লোভী ও (২) সম্পদের লোভী"। [হাকীম] এটা আসলেই পরিষ্কার একটি কথা। উত্তম জ্ঞান ও হালাল মালের লোভী প্রকৃত অর্থেই প্রশংসিত। যেমন নিজ পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের জন্য কিংবা দরিদ্র, নিঃস্ব ইসলামী শিক্ষার্থী এবং ইসলামী বিদ্যালয়ের জন্য মাল উপার্জন করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বাতের খাতিরে ব্যয় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"তারা নিঃস্ব, ইয়াতীম ও বন্দীকে একমাত্র তাঁর ভালোবাসায়ই আহার করাতো। (তারা বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তোমাদেরকে আহার করাচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" (দাহর (৭৬) : ৭-৮)

হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত¡না দিতে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেদিকে একটু লক্ষ্য করুন:

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

-"আল্লাহর শপথ! তিনি কস্মিনকালেও আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করেন। অন্যের কাছে যে সদাচরণ পাওয়া যায় না তা আপনার কাছে পাওয়া যায়। আপনি অতিথিপরায়ণ। প্রত্যেক কাজে আপনি সব সময়ই হক্বের পথে সাহায্যে এগিয়ে আসেন"। (সহীহ বুখারী : ৩)

কুরআন শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হারিস' বলা হয়েছে,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

-"তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়"। (তাওবাহ (৯) : ১২৮)

২. নিষিদ্ধ কাজের লোভ: প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম লোভ। কুরআন-হাদীসে এই লোভের প্রতি খুবই নিন্দা এসেছে। সর্বপ্রকার অসৎ চরিত্র ও খারাপ কাজের মূল হলো সম্পদের এই লোভটিই। মানুষের অন্তর যদি অর্থলোভ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, তবে তো সর্বপ্রকার অসৎ চরিত্র থেকে পাক হয়ে গেল। অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, মিথ্যা, হিংসা, কৃপণতা, গীবত, নিপীড়ন, চুরি, আত্মসাৎ এবং ব্যভিচার এসব যাবতীয় বস্তুর মূলই হলো অর্থলোভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذهب لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

-"মানুষ যদি দু'টি স্বর্ণ টিলার অধিকারী হয় তবুও তৃতীয় আরেকটি অনুরূপ টিলার অনুসন্ধানে লেগে যাবে। একমাত্র কবরের মাটি আদম সন্তানের পেট ভরে

দিতে পারে- তবে আল্লাহ যাকে তাওবার তাওফিক দান করেন সে তাওবাপ্রাপ্ত হয়।” [সহীহ বুখারী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ

“আদমসন্তান যখন বৃদ্ধ হতে থাকে আর তার মধ্যে দু’টি বৈশিষ্ট্য যৌবনোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, একটি হলো সম্পদের লোভ আর অপরটি হলো জীবনের আকাঙ্ক্ষা।” [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম] সহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে, “বৃদ্ধ লোকের হৃদয় দু’টি বিষয়ে যৌবনোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে: ধনলিপ্সা এবং দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা।”

উপরে উল্লেখিত আলোচনাটি ছিলো হিরস (লোভ) সম্পর্কে। লোভের আরেকটি প্রকার তামা’ (লালসা)। এর মর্মার্থ হলো অন্য লোকের সম্পদ অর্জনের লালসা এবং তা অর্জনে জোর চেষ্টা করা। এই তামা’-ই হলো চুরি-ডাকাতি এবং অন্যান্য অপকর্মের মূল। অন্যের মালের প্রতি লোভ-লালসাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এবং হৃদয়কে তা থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যক করে দিয়েছে। তাও বলা হয়েছে, লালসা নামক অপকর্মটি তালিবে মাওলার পথে একটি বিরাট বাধা।

লোভ-লালসার চিকিৎসা

১. একথা চিন্তা করা যে, আমি আল্লাহ তা’আলার তালিব (অন্বেষী) তিনিই একমাত্র মাতলূব, মাহবুব ও মাওলা। তিনি লোভ-লালসাকে ঘৃণা করেন। তাই এ থেকে পবিত্রতা অর্জন আমার জন্য একান্ত আবশ্যক।

২. এ গর্হিত কাজের প্রতি হাদীস ও মাশাইখদের ভাষায় যেসব নিন্দাবাদ এসেছে তা গভীর মনোযোগসহ অধ্যয়ন করা।

৩. ভালো কাজের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণের মাধ্যমে এ মন্দ স্বভাব বদলে দেওয়া।

৪. যুহুদ ও কানাআতের ফজিলত সম্পর্কিত হাদীসের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এবং কানাআতের অলঙ্কার দিয়ে অন্তরকে সাজিয়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“যে ব্যক্তি তার পরিবার নিয়ে সকাল যাপন করলো সুস্থ শরীর ও নিরাপদে এবং তার কাছে এই দিনের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আছে, সে যেনো তুনিয়া লাভে সফল হলো।” (সুনানে তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

-“সফল ঐ ব্যক্তি যে মুসলমান হলো, প্রয়োজনমাফিক রিজিকপ্রাপ্ত হলো এবং আল্লাহ তা’আলা তাকে কানাআতের গুণে ভূষিত করলেন।” [সহীহ মুসলিম]

৫. জীবন-যাপন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ প্রয়োজনমাফিক খরচ করা, অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকা। শরীয়তের ভাষায় এটাকে বলে, ইক্বতিসাদ। এই বিষয়ে আমার রচিত গ্রন্থ “ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন”-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চাইলে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে নিতে পারেন। ইক্বতিসাদের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো অনেক হাদীস আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

-“নীরবতা অবলম্বন হচ্ছে একটি ভালো কাজ। ধীরতা এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন হলো নুবুওয়াতের ২৪ অংশের একাংশ।” [সুনানে তিরমিযি] সদরে মুনাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী সবই নির্ভরযোগ্য। আবদ ইবনে হুমায়দ, তাবারানী এবং যিয়া রাহামাতুল্লাহি আলাইহিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق

-“হে আবু যর! চিন্তা এবং গবেষণার মতো আর কোন বুদ্ধি নেই, বিরত থাকার মতো আর পরহেজগারী নেই এবং সৎ চরিত্রের মতো আর কোন বংশগৌরব নেই।” [সহীহ ইবনে হিব্বান]

৬. এই বিশ্বাস পোষণ করা,

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

-"আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আঁধার, পরাক্রান্ত।" (যারিয়াত (৫১) : ৫৮)

লোভ দ্বারা আমার মাওলার বণ্টনকৃত রিজিক থেকে আমি একটুও বেশী উপার্জন করতে পারবো না। সুতরাং কোন লোভ-লালসা ছাড়াই আমার কাছে যা অর্জন হয় এটাকেই যথেষ্ট মনে করা। দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা গাইরুল্লাহর নিকট প্রকাশ করা উচিৎ নয়। দলীল হিসাবে তাবারানীর হাদীসখানা পেশ করা যেতে পারে:

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها

-"যে ব্যক্তি সবকিছু থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে যাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন এবং রিজিক এমনভাবে দান করবেন, যা সে ধারণাই করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি পার্থিব মোহে আক্রান্ত হবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার উপর ছেড়ে দেবেন"। ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইতহাফের অষ্টম খণ্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "কামিল ঈমানদার দেখতে পায়, অদৃশ্য থেকে স্রষ্টার হাত দ্বারা তার রিজিক বেরিয়ে আসছে। উপায় উপাদানের মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে গেছে। সে যখন তা অবলোকন করে, তখন তার মাওলার কর্মকাণ্ড অন্তর চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকে।"

৭. লোভ ও লালসার মধ্যে যে অপদস্থতা আছে সেদিকে লক্ষ্য করা। তদ্রূপ সবর ও কানাআতের মধ্যে যে আত্মসম্মান ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত আছে তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ، وعزه استغناؤه عن الناس

"মু'মিনের সম্মান হচ্ছে, রাতের বেলা নামায পড়া এবং মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়া।" [তাবারানী, হাকিম]

৮. একথা চিন্তা করা, ইয়াহুদী-নাসারা এবং কাফির-ফাসিকগণ লোভ-লালসায় আক্রান্ত। এরা দুনিয়ালোভী, অর্থলিপ্সু, অর্থপ্রেমী। অন্যদিকে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কিরাম না দুনিয়ার লোভী না দুনিয়ার প্রেমিক- তাঁদের একমাত্র মাহবুব হলেন আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে আমরা যদি সালিক ইলাল্লাহ হয়ে থাকি- তাহলে একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরামকে অনুসরণ করতে হবে।

৯. সম্পদের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিম্নমানের তার দিকে লক্ষ্য করা। উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তির দিকে দৃকপাত না করা। কারণ, হযরত আবুযর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার বন্ধু আমাকে উপদেশ দেন,

وَأَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي

-"তুমি তোমার নিম্নস্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য করো ঊচ্চস্তরের লোকের দিকে তাকিও না।" [আহমদ, ইবনে হিব্বান] অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

-"মানুষ যেনো তার নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকায়, ঊচ্চস্তরের লোকের দিকে যেনো দৃষ্টিপাত না করে।" সহীহ মুসলিমে এই হাদীসের সাথে অতিরিক্ত আছে,

فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

-"এটাই হলো তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে বাঁচার সবচেয়ে উত্তম পন্থা"। হাফিজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এটা এজন্য যে, নিম্নস্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য করলে নিজের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও শুক্রের আগ্রহ জন্মে।"

১০. ক্বালবকে আল্লাহ থেকে গাফিল না রাখা। বরং সদা-সর্বদা একমাত্র আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ রাখা।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ

قُلْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-"আমি আমার মুখমণ্ডল একনিষ্ঠমনে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিলাম, যিনি আকাশগুলী ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে নই। নিশ্চয় আমার নামায, কুরবানী, জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল জগতসমূহের প্রতিপালক।" [সহীহ বুখারী, সুনানে আবু দাউদ ইত্যাদি]।

যদি কখনো উদাসীনতার কারণে লোভ-লালসা, বাজে কল্পনা অথবা কোন কুমন্ত্রণা এসে যায়, তখন নিতান্ত নিঃস্বতা ও অনুনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। নিজের শক্তি-ক্ষমতাকে একদম অর্থহীন মনে করে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ' বলা। অতঃপর অত্যন্ত অনুনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দু'আ করা, "হে আল্লাহ! লোভ-লালসা থেকে আমার হৃদয়কে পবিত্র করুন। আমি আপনার কাছে লোভ-লালসা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।" হৃদয়ের ভাষা দিয়ে আরো বলতে থাকা, "হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার মাকসুদ। তোমার সন্তুষ্টিই আমার লক্ষ্য। আমি একমাত্র তোমার জন্য দুনিয়া-আখিরাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার উপর তোমার করুণা পরিপূর্ণ করে দাও। তোমার পরিপূর্ণ সাক্ষাতে আমাকে ধন্য করো।" এর পরও যদি কুমন্ত্রণা বেড়ে যায়, তখন এক স্থানে বসে অন্তত ১০০ বার 'أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ' পাঠ করা এবং কয়েকবার ইস্তিগফার করে নেওয়া।

টীকা: আলোচিত পদ্ধতিগুলো বেশ উপকারী। সমস্ত আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার মহৌষধ। এর দ্বারা সর্বদা আল্লাহর মুরাক্বাবা এবং মুশাহাদা অর্জন হয়। আল্লাহই একমাত্র পথপ্রদর্শক, তাঁর কাছেই আমরা তাওফিক কামনা করি। সারকথা হলো, লোভ-লালসা থেকে পরিশুদ্ধি খুবই জরুরী। আর এখানে এসেই যুহদ, কানাআত ও সবরের দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে তোলতে হয়।

ক্রোধ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

'আল-ইতহাফে' আছে, "সমস্ত উলামায়ে কিরামের মতে মানুষের মৌলিক শক্তি হলো তিনটি: বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও ক্রোধ। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে উষ্ণতা ও সিক্ততা রাখা হয়েছে। এছাড়াও তার মধ্যে আরেকটি সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত আছে, যাকে বলে ক্রোধের আগুন। এ শক্তির উদ্দেশ্য হলো আত্মরক্ষা। মানুষ যখন তার উদ্দেশ্য সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তার মধ্যে এই অন্তর্নিহিত শক্তিটি উতলে উঠে। এ থেকে ধোঁয়া নির্গত হয়ে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে তার চিন্তা-ফিকির, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয়। সে মধ্যপন্থায় অটল থাকতে পারে না। কতিপয় লোকদের মতে মানুষের মৌলিক শক্তি হলো দু'টি: এর একটি বুদ্ধি শক্তি আর অপরটি হচ্ছে প্রবৃত্তি শক্তি। আমি অধম গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রামাণ্য আলোচনা করেছি এবং বলেছি মানুষ হচ্ছে উষ্ণতা এবং সিক্ততা এই উভয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষ যখন

তার কোন প্রবৃত্তি পূরণে অগ্রসর হয়- হোক সেটা কোন মুনাফা অর্জনের আশায় কিংবা কোন প্রকার ক্ষতি প্রতিরোধে, তখন যদি সে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে বাধাদানকারীর প্রতি তার এক প্রকার প্রতিরোধ ক্রিয়া জেগে ওঠে। তার মধ্যে যে সিক্ততা আছে, এই শক্তিটি তার ক্রোধ শক্তিকে দমন করতে একদম অক্ষম হয়ে পড়ে। প্রকৃতিতে মধ্যম পন্থার আর কোন রাস্তাই বাকী থাকে না। ধোঁয়া ও বাষ্প মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যায়। তার জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কখনো এই উষ্ণতা এত প্রবল হয় যে, তার সিক্ততা একদম নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন সে মৃত্যুবরণ করে কিংবা পাগলে পরিণত হয়। ক্রোধের প্রভাব তার শরীরে ছড়িয়ে পড়লে মুখ দিয়ে অসংলগ্ন কথা বের হয়, মারধর করে, কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলে। পক্ষান্তরে ক্রোধের প্রভাব যখন অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার বিরোধী ব্যক্তির প্রতি হিংসা-শত্রুতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে।”

সারকথা, ক্রোধ একটি শক্তি, এর জন্য রিয়াজত-মুজাহাদা খুবই আবশ্যক। এ মুজাহাদার অর্থ হলো, এই শক্তিকে শরীয়তের সম্পূর্ণ অনুগামী বানিয়ে দেওয়া। শরীয়ত যেখানে এটা প্রয়োগ করতে অনুমতি দিয়েছে কেবলমাত্র সেখানেই তা এমনভাবে কার্যকর করবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেছেন। যেখানে তিনি নিষেধ করেছেন সে ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা যাবে না। আর এটাই হচ্ছে শরয়ী ইসলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে একদম ধ্বংস করে দিতে চায় সে তো পথভ্রষ্ট। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ক্রোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা-হীনতা এবং কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়। আমর বিন মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ) এর কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে থাকে না। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خير أمتي أحداؤها

-“আমার উম্মাতের তেজস্বী লোকেরাই হলো সর্বোত্তম।” [তাবারানী, বাইহাকী] ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْحِدَّةُ تَعْتَرِي خِيَارَ أُمَّتِي

-"আমার উম্মাতের মধ্যে যাদের তেজ আছে তারাই সর্বোত্তম।" [আবু ইয়'লা, তাবারানী] ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ঘৃণিত ও প্রশংসিত ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটির কারণে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয়টির বেলা এরকম হয় না। অধিকাংশ সময় শেষোক্তটাই দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

-"আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (নূর (২৪) : ২)

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন,

لا يغضب للدنيا فاذا أغضبه الحق لم يقم لغضبه شئ حتى ينتصر له

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব কোন কিছুর জন্য ক্রোধান্বিত হতেন না, তাঁর ক্রোধ হতো একমাত্র সত্যের জন্যই। প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার ক্রোধ থামতো না।" [শামাইলে তিরমিযি, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।" (মায়িদা (৫) : ৫৪)

প্রকৃতপক্ষে যদি মানুষের মধ্যে ক্রোধশক্তি না থাকে, সে 'আমর বিল মা'রুফ' এবং 'নাহি আনিল মুনকারে'র কোন একটি কাজও আঞ্জাম দিতে পারবে না। জিহাদ করতে পারবে না। হোক সেটা কুরআনী জিহাদ। ইসলামী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ

কিংবা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। সে সত্যের পথে সহযোগিতাও করতে পারবে না। আর না বাতিল প্রতিরোধে তার মধ্যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা দেখা যাবে।

টীকা: শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রয়োগ হলে বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার অন্তর্ভূক্ত। আর প্রয়োগ না করাটা হবে কাপুরুষতা, আত্মমর্যদাহীনতা এবং নির্লজ্জতার পরিচায়ক।

ক্রোধের কারণ ও এর ঔষধ

১. বড়ত্ব, এর ঔষধ হলো বিনয়। ২. আত্মম্ভরিতা, যার ঔষধ হলো আত্মপরিচয়- তথা সে যে মাটি ও কাদার সৃষ্ট তা অনুধাবন। ৩. গৌরববোধ- এর ঔষধ হলো, একথা অনুভব করা যে, সকল মানুষ হযরত আদম আলাইহিস্সালামের সন্তান। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল সৎ ও অসৎ চরিত্রের মাধ্যমে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য খুবই নিম্নমানের। এগুলো থেকে যদি পরিশুদ্ধি অর্জন না হয়, তাহলে কারো উপরই তোমার কোন মর্যাদা থাকলো না। ৪. ঠাট্টা-তামাশা- এর ঔষধ হলো, দ্বীনি কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা। ৫. বাচালতা। ৬. ঝগড়া। ৭ অহেতুক বিতর্ক। ৮. প্রতারণা। ৯. অপবাদ দেওয়া। ১০. কাউকে লজ্জা দেওয়া। এসব রোগের একমাত্র ঔষধ হলো, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। বিশেষ করে ইলমে দ্বীনের সাথে জড়িয়ে থাকা। ১১. অর্থলোভ। ১২. যশ-খ্যাতির লোভ। এ দু'টি হলো সকল অপকর্মের মূল। এগুলো থেকে পরিশুদ্ধি লাভ হলে, সর্বপ্রকার অসৎ চরিত্র থেকে যেনো বেঁচে গেল। এর ঔষধ হলো, অল্পেতুষ্টি, পরকাল নিয়ে চিন্তা, প্রচারবিমুখতা এবং এ সম্পর্কিত হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করা। ১৩. বংশগৌরব, সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদ। এসবের ঔষধ হলো আদল ও ইনসাফ এবং সত্যের প্রতি ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (নিসা (৪) : ১৩৫)

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

-"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন।" (নাহল (১৬) : ৯০)

তাই আদল ও হক্বের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং অসত্য ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ সকল মুসলমানের জন্য ফরজ। সালিক যদি এর উপর আমল করে তবে সে নিন্দিত ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার মধ্যে প্রশংসিত ক্রোধ বিরাজমান থাকবে। হক্ব ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যায় ও অসত্য প্রতিরোধের জন্য ক্রোধ অবলম্বন করা শুধু বৈধই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়ে যায়। ১৪. লেনদেন ও সামাজিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা। বর্তমান সময়ে এগুলোর কারণেই মানুষের মধ্যে ক্রোধ ও অন্যান্য রোগ প্রকট হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা-মুজারাআ (বর্গাচাষ), অংশীদারিত্ব এবং ঋণের ক্ষেত্রে খুবই অনিয়ম ও ঝগড়া-ফাসাদ দেখা যায়। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী, মা-সন্তানাদি এবং পাড়া-পড়শীর মধ্যে বাদ-বিবাদ, মামলা-মুকাদ্দমা এবং শত্রুতা ইত্যাদি এসব কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সালিকের জন্য আবশ্যক হলো, সে তার আত্মসম্মান পূর্ণভাবে রক্ষা করবে। লেনদেন ও সমাজ-জীবনে শরীয়তের আইন-কানুনের খুবই অনুগামী হবে। নিজের কিংবা তার সাথীর ক্ষেত্রে কোন প্রকার শরীয়ত-বিরোধিতা সে সহ্য করবে না। অথবা তার একক ক্ষেত্রে সে শরীয়তের পাবন্দ থাকবে এবং বন্ধুর ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হলে, কিছু না করতে অপারগ হলে নীরব থাকবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

-"হৃদয়বান ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও চাহিদাতে আল্লাহর করুণা বর্ষণ হোক।" [সহীহ বুখারী]

টীকা: ক্রোধের যেসব কারণ এখানে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ হয়েছে, এগুলো মূলত প্রবৃত্তি শক্তির বিভিন্ন রূপ। আসলে ক্রোধের মূল হলো প্রবৃত্তি। আর এটাই হচ্ছে সর্বপ্রকার ফাসাদের কারণ। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত" (নাযিআত (৭৯) : ৪০-৪১)

নিন্দিত ক্রোধের ঔষধ

১. এরূপ কল্পনা করা যে, এই অভ্যাসটি আমার মাহবুবের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আমি যদি বাস্তবে তাঁর তালিব (অন্বেষী) হয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই এ থেকে আমাকে পাক হতে হবে।

২. ক্রোধের প্রতি নিন্দা প্রকাশমূলক হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

-"যখন কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত।" (ফাৎহ (৪৮) : ২৬)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِّمْنِي شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيهِ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ

-"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি জিনিস শিক্ষা দিন- তবে বেশী বলবেন না- ফলে আমি তা স্মরণ রাখতে সক্ষম হবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি রাগ করবে না। সে কয়েকবার একই অনুরোধ করলো, তিনিও বারবার বললেন, তুমি রাগ করবে না।" [সহীহ বুখারী, তিরমিযি] হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন,

مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَغْضَبْ

-“কোন্ কাজ আমাকে আল্লাহর গজব থেকে দূরে রাখতে পারবে? তিনি বললেন, তুমি রাগ করবে না।” [আহমদ]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

-“কুস্তিগিরি বীরত্ব নয় বরং বীর পুরুষ তো সে-ই যে ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।” [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

৩. প্রশংসিত ক্রোধের দ্বারা নিন্দিত ক্রোধকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা।

৪. আত্মসংযম, করুণা, উদারতা এবং ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা।

৫. কুরআন এবং হাদীসে ক্ষমা ও উদারতা সম্পর্কিত উৎসাহমূলক কথাবার্তা অধ্যয়ন। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

-“যারা রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ১৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

-“অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম¡রগণ সবর করেছেন।” (আহক্বাফ (৪৬) : ৩৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

-“রহমান- এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।” (ফুরক্বান (২৫) : ৬৩)

ইবনে আবী রাবাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আয়াতে উল্লেখিত ‘হাওনান’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, “এটার অর্থ ধৈর্যের সাথে” (হযরত ইবনে আবি হাতিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে বর্ণিত)। হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

“তারা ঘোরাফেরা করে ধৈর্যশীল ও বিনয়ী হয়ে।” [বাইহাকী] আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

-“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (শুরা (৪২) : ৪০)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

-“আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়; যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।” (নাহল (১৬) : ১২৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশবাহ আব্দুল কায়েসকে বলেন,

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

-“‘তোমার মধ্যে অবশ্যই দু’টি বৈশিষ্ট্য আছে, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল খুবই ভালোবাসেন। এগুলো হলো ধৈর্য এবং গাম্ভীর্যতা।” [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম : ২৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

-“ক্রোধের যে ঢোক বান্দাহ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সংবরণ করলো, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।” [সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৭৯, আহমদ] মুনজিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

-“আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাক।” (আরাফ (৭) : ১৯৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

-“যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী।” (বাক্বারাহ (২) : ২৩৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

-“সাদকার দ্বারা বান্দার মালের মধ্যে কোন স্বল্পতা আসে না। কোন নির্যাতিত মানুষ যদি নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। কোন মানুষ যদি ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেবেন।” [সুনানে তিরমিযি] মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ এবং বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম অনুরূপ বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صل من قطعك ، واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك

-“যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক গড়ো, যে নিপীড়ন করে, তাকে ক্ষমা করো আর যে অসদাচরণ করে তার সাথে সদাচার করো।” [তাবারানী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাজে নম্রতা পছন্দ করেন।” [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا أَحب اللهُ أَهْلِ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الرِّفْقَ

-"আল্লাহ যখন কোন ঘরের মানুষকে ভালোবাসেন, তাদের মধ্যে তিনি করুণা সৃষ্টি করে দেন।" [আহমদ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা করুণাময়, তিনি করুণা ভালোবাসেন।" [সহীহ মুসলিম]

সারকথা, এসবের উদ্দেশ্য হলো, আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নম্রতা ও উদারতা অবলম্বন করা। 'রিফকুন' শব্দের অর্থ হলো, কথা ও কর্মে নম্রতা এবং সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ পথ অবলম্বন করা। অনুরূপভাবেই ইতহাফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস আছে।

৬. যার প্রতি ক্রোধ তার উপর আপনার যেটুকু ক্ষমতা আছে, এর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা আপনার উপর আল্লাহর তা'আলার আছে- এ কথার চিন্তা করা।

৭. এ কথা কল্পনা করা যে, রাগ-গোস্বা হলো বাঘ, কুকুর এবং দুনিয়া পূজারীদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ধৈর্য, ক্ষমা, করুণা এবং উদারতা হলো আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আহলুল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আর আহলুল্লাহকেই আমাকে অনুসরণ করতে হবে, যদি সত্যিকার অর্থে সালিক হই।

৮. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়া। এই ঔষধটি সহীহাইনে বর্ণিত আছে। আর সুনানে আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে আছে اللهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

৯. নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে একদম ভুলে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলার শক্তির আশ্রয় চেয়ে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পড়তে থাকা। আর দু'আ করা -"হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে ক্রোধ ও শত্রুতা থেকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্রোধ, শত্রুতা এবং হিংসা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

১০. গোসল অথবা অযু করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ক্রোধ হলো আগুনের অংশ। আর আগুন থেকেই শয়তানের সৃষ্টি। পানি হলো এর ঔষধ।" [আবু দাউদ, আবু নাঈম]

১১. সিজদায় পড়ে যাবে। অর্থাৎ নামায শুরু করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

-"জেনে রাখো, ক্রোধ হলো বনী আদমের পেটের একটি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার, তোমরা কি তার চোখে এই অঙ্গার দেখতে পাও না বা তার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠতে দেখো না? কেউ যদি এরকম কিছু অনুভব করে, সে যেনো তার গাল মাটির সাথে মিশিয়ে রাখে (অর্থাৎ মুখমণ্ডল)" [আহমদ, তিরমিযি] **১২.** আল্লাহ তা'আলার ধ্যান করা। অন্তরের একান্ত নিঃস্বতা ও অনুনয়-বিনয়সহ মাওলার সামনে পড়ে থাকা।

শত্রুতা অধ্যায়

মানুষ যখন তার ক্রোধ অনুসারে কাজ করতে অক্ষম হয়ে যায় এবং তা দমন করতেও পারে না, তখন এই ক্রোধ তার ভেতরে বন্দী থেকে শত্রুতার রূপ ধারণ করে। এই শত্রুতাই হলো নিম্নে বর্ণিত সকল ফাসাদের মূল। ১. হিংসা। ২. প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট কামনা ও তার দুঃখ-কষ্টে খুশী হওয়া। ৩. তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। ৪. তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ৫. তার গীবত করা। ৬. তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা। ৭. তাকে কষ্ট দিতে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকা। ৮. তার শরয়ী অধিকার যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ঋণ আদায়, পাড়া-পড়শীর প্রাপ্য, রোগ-ব্যাধির সময় দেখাশোনা ইত্যাদি আদায়ে খুবই অনীহা প্রদর্শন করা। এ সবই হারাম।

শত্রুতাও দু' প্রকার: প্রথমতঃ প্রশংসিত শত্রুতা, যা কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। যেমন, বিদআতী কর্মকাণ্ডের কারণে কোন বিদআতীর সাথে, ইলহাদের কারণে কোন মুলহিদের সাথে, পথভ্রষ্টতার কারণে কোন জিন্দিকের সাথে এবং অবাধ্যতার কারণে কোন ফাসিকের সাথে শত্রুতা পোষণ করা কেবল জায়িযই নয় বরং ঈমানের পূর্ণতার একটি নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ وَأَعْطَى لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

-"যার ভালোবাসা, শত্রুতা, দান করা ও দান না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তার ঈমান পরিপূর্ণ।" [আহমদ, আবু দাউদ] কুরআন শরীফে আছে,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

-"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে

দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখুন, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (মুজাদালাহ (৫৮) : ২২)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

-"আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না নতুবা তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে।" (হূদ (১১) : ১১৩)

হাদীস শরীফে আছে,

-"যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখবে, তার কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।" দ্বিতীয়তঃ নিন্দিত ও ঘৃণিত শত্রুতা, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য হবে না, এটা হারাম।

শত্রুতার চিকিৎসা

১. এ কথা অনুভব করা যে, শত্রুতা পোষণ করা আমার মাওলার নিকট পছন্দনীয় নয়। ২. শত্রুতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলেন,

يا بني ، إن ذلك من سنتي ، فمن أحب سنتي ، فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة

-"হে প্রিয় বৎস! এটা হচ্ছে আমার আদর্শ। যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে জ্যান্ত করলো, সে আমাকে ভালোবাসলো। আর আমাকে যে ভালোবাসবে জান্নাতে সে আমার সাথেই থাকবে।" [আহমদ, তিরমিযি]। এই অধ্যায়ের অনেক হাদীস নিম্নোক্ত অধ্যায়ে আসবে। আর কিছু ইতোমধ্যে ক্রোধ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

হিংসা অধ্যায়

ইমাম গায্যালী এবং উম্মাতের অন্যান্য আকাবীরের অভিমত হলো, শত্রুতা থেকে সৃষ্ট বড় একটি রোগ হচ্ছে হিংসা। হিংসার অর্থ হলো অন্যের কোন নিয়ামত বিনষ্ট হওয়ার আকাক্সক্ষা পোষণ করা।

হিংসা দু' প্রকার: **১. প্রশংসিত হিংসা:** ফাসিক, বিদআতী, মুলহিদ অথবা কাফির নিয়ামত পেয়ে যদি তা দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত বা অত্যাচার করে, তাহলে এরকম ব্যক্তির এই নিয়ামত বিলীন হওয়ার আকাক্সক্ষা পোষণ জায়িয আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা উত্তম ইবাদাত। কুরআন শরীফে আছে,

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

-"মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, আপনি ফিরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছেন, এবং সম্পদ দান করেছেন- হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে! হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তর কঠোর করে দিন যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে।" (ইউনুস (১০) : ৮৮)

২. নিন্দিত ও ঘৃণিত হিংসা: প্রথম প্রকার ছাড়া বাকী সর্বপ্রকার হিংসা ঘৃণিত এবং হারাম। কেননা, নিয়ামতের দাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাই নিয়ামত নিঃশেষ হওয়ার আকাক্সক্ষা পোষণ মানে হলো আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার মুকাবিলা ও তাঁর উপর অভিযোগ আনা। কুরআন ও হাদীসে হিংসা হারাম হওয়ার উপর অনেক দলীল আছে। তবে এটা হারামের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, যে আলীম তার ইল্ম দ্বারা রাতদিন সঠিকভাবে ইসলামের খিদমাত করে যাচ্ছেন, তার নিয়ামত লয় হওয়ার আকাক্সক্ষা পোষণ করা যেটুকু হারাম, কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসার নিয়ামত নিঃশেষ হওয়ার আকাক্সক্ষা পোষণ ততো কঠোর হারাম নয়। কেননা, ইলমের নিয়ামত হলো আম্বিয়ায়ে কিরামের মিরাস, এর সাথে শত্রুতা

করা এবং নুবুওয়াতের নিয়ামতের সাথে শত্রুতা করা একই কথা। হিংসা তো মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اغد عالما ، أو متعلما ، أو مستمعا ، أو محبا ، ولا تكن الخامسة فتهلك

-"তুমি আলিম, শিক্ষার্থী, তাদের কথার উপর মনোযোগী অথবা তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী হও। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত হয়ো না, এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (বাযযার, তাবারানী) আল্লামা ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এখানে পঞ্চম শ্রেণীর অর্থ হলো আলিম বা শিক্ষার্থীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা। এমনকি তাদের প্রতি ভালোবাসা না রাখলেও শত্রুতা বিবেচিত হবে। তাতে ধ্বংস নিহিত। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তুমি যদি একজন আলিমের সাথে হিংসা পোষণ কর, দ্বীনি বিষয়াদিতে তার ভুল-ভ্রান্তি কামনা কর, মানুষের মধ্যে তার অপদস্থতা এবং তালিম ও তাআল্লুম থেকে তাকে একদম নির্বাক করতে চাও, তাহলে এরচেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে?

হিংসার কারণসমূহ

১. শত্রুতা: কারো প্রতি শত্রুতা থাকলে তার নিয়ামত লয় হওয়ার কামনা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়।

২. তা'আযযুজ: নিজের উপর অন্য কারো মর্যাদা দেখে জ্বলেপুড়ে ওঠা।

৩. অহঙ্কার: নিজেকে সবচেয়ে বড় মনে করা। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে মক্কার কুরাইশদের যে হিংসা ছিলো, তার মূল কারণ হলো এই তা'আযযুজ এবং তাকাব্বুর। এজন্যই তারা বলেছিল,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

-"তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না?" (যুখরুফ (৪৩) : ৩১)

৪. তা'আজ্জুব (আশ্চর্যবোধ): কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতের নিয়ামত, ওহী এবং আল্লাহর সাথে সন্তুষ্টির উপর

আশ্চর্যবোধ করতো। কেননা, তারাও তো তাঁর মতো মানুষ ছিল। আর এখানে এসেই তারা হিংসা শুরু করতো।

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

-"তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।" (ইয়াসীন (৩৬) : ১৫)

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

-"যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (মু'মিনূন (২৩) : ৩৪)

قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

-"আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন?" (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৯৪)

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ

-"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে?" (আরাফ (৭) : ৬৩)

৫. কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য: কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা. মর্যাদা কমে যাওয়া এবং নিজের গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা। যেমন, এক শিক্ষকের দু'জন শিক্ষার্থী, এক পীরের মুরীদান, বিভিন্ন বক্তা এবং মুফতির মধ্যে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যশ-খ্যাতি, সম্মান এবং মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা। ৬. নেতৃত্ব ও সম্মানের লোভ: মানুষ যখন কোন বিষয়ে অতুলনীয় হওয়ার ইচ্ছা করে, তখন যদি তার সমকক্ষ কোন ব্যক্তির সন্ধান পায়- তখন সে তার প্রতি হিংসা শুরু করে। একমাত্র নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ইয়াহুদী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনে নি। ৭. জন্মগত হিংসা: এমন কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের কল্যাণ দেখে অহেতুক হিংসা করে।

হিংসার চিকিৎসা

১. হিংসা একটি আত্মিক রোগ। এর চিকিৎসা খুবই আবশ্যক তা চিšতা করা। ২. এটা মনে করা যে, হিংসা হচ্ছে আমি ও আমার মাওলার মধ্যে বড় একটি পর্দা। ৩. আসলে এটা তো আমার মাওলা ও মাহবুবের মর্জির সম্পূর্ণ খিলাফ। ৪. পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে অন্তরকে আল্লাহর সাথে রাখা, তাঁর প্রেমে ডুবে যাওয়া। ৫. হিংসার নিন্দা প্রকাশক কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস অধ্যয়ন করা। যেমন,

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

-"নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে।" (নিসা (৪) : ৫৪)

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

-"আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়।" (বাক্বারাহ (২) : ১০৯)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا

-"তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিংসা, শত্রুতা ও একে অন্যের পশ্চাদ্বাবন করো না। সবাই আল্লাহর বান্দা ও ভাই-ভাই হয়ে যাও।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يطلع عليكم الا ن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، قال : فاطلع رجل من أهل الا نصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال ، فسلم ، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل على مثل المرة الاولى ، فلما كان اليوم الثالث قال

النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاول ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت ، قال : نعم ، قال أنس : كان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ، [و] ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ، قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا ، مضت الثلاث وكدت أحتقر عمله قلت : يا عبد الله ! لم يكن بيني وبين والدي هجرة ولا غضب ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات : يطلع الان عليكم رجل من أهل الجنة ، فاطلعت ثلاث مرات ، فأردت أن آوي إليك لانظر ما عملك ، فأقتدي بك ، فلم أراك تعمل كبير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا

-"আমরা আল্লাহর রাসূলের দরবারে বসা ছিলাম যখন তিনি বললেন, এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী লোকের আগমন হবে। এরপরই আমাদের নিকট একজন আনসারী সাহাবী এসে উপস্থিত হলেন। তার দাড়ি থেকে অযুর পানি গড়িয়ে পড়ছিলো। বাম হাতে জুতা বহন করছিলেন। তিনি সালাম জানালেন। দ্বিতীয় দিনও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বললেন। এদিনও ঐ আনসারী ব্যক্তির আগমন হলো। এরপর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবার থেকে উঠলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ আনসারী সাহাবীর সাথে চললেন। তিনি তাকে অনুরোধ জানালেন, আমি শপথ করেছি, তিনদিন পর্যন্ত আমার বাবার গৃহে যাবো না। আপনি অনুমতি দিলে আপনার সাথেই এই তিনদিন কাটাতে চাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ- আপনি থাকতে পারেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর সাথে তিন রাত যাপন করলেন। এসময় ঐ আনসারীকে কোন বিশেষ আমল করতে তিনি দেখলেন না- শুধু

শয্যাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। ভোরে সালাতুল ফযর আদায়ের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। এছাড়া তাঁর কাছ থেকে ভালো কথা ছাড়া আর কোন কথা শোনেন নি। এভাবে তিনদিন কেটে গেল। (হযরত আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন) আমি তাঁর আমলকে তুচ্ছ মনে করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিতার সাথে কোন রাগ-গোস্বা হয় নি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এরকম কথা শ্রবণ করেছি, তাই আপনার আমল পর্যবেক্ষণ করতে চাইলাম। কিন্তু অধিক হারে কোন আমল করতে তো দেখলাম না। তাই বলুন, কোন্ আমল আপনাকে এই স্তরে উন্নীত করলো? তিনি জবাব দিলেন, আপনি যা দেখেছেন তা-ই। তাছাড়া কোন মুসলমানের উপর আল্লাহ-প্রদত্ত কল্যাণ নিয়ে আমি হিংসা বা শত্রুতা পোষণ করি না।" (আহমদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

-"হিংসা ও ক্রোধ হলো তোমাদের পূর্বেকার জাতির বৈশিষ্ট্য। ক্রোধ তো হচ্ছে কর্তনকারী- তবে সে চুল নয় দ্বীনকে কেটে দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা যতক্ষণ না মু'মিন হয়েছো ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর একে অন্যকে ভালো না বাসলে তোমার মু'মিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো, কী কাজ দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচার করো।" (তাইয়ালাসি, আহমদ (২৪৩৪), তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سيصيب أمتي داء الأمم ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، وما داء الأمم ؟ قال ﷺ : الأشر ، والبطر ، والتدابر ، والتنافس في الدنيا ، والتباغض ، والبخل ، حتى يكون البغي ، ثم يكون الهرج

-"পূর্ববর্তী উম্মাতের রোগে অচিরেই আমার উম্মাত আক্রান্ত হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের রোগটি কি ছিল? তিনি জবাব দিলেন, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা এবং হিংসা। এসবের পরিণামে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধে হবে।" (তাবারানী (১১০৭০), হাকিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا

-"আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করছি না বরং তোমাদের উপর যে দুনিয়া ছড়িয়ে পড়বে- আমি সে ভয় করছি।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে একটু বাড়তি আছে:

أَنَّهُ قَالَ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ

تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ... .....

-"তোমরা যখন পারস্য ও রুম জয় করবে, ... তোমরা তখন প্রতিযোগিতা, হিংসা ও শত্রুতায় জড়িয়ে পড়বে।" ৬. একথা অনুভব করা, শয়তান হযরত আদম আলাইহিসসালাম এর সাথে হিংসা করেছে। এখানেই শেষ নয়, সে তো কিয়ামত পর্যন্ত সকল বান্দাদের সাথে হিংসা করে যাবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালামের ভাইগণ তাঁর সাথে হিংসা করেছিলেন। ইয়াহুদী আলিম ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিংসা করেছে। আমাকে তো অনুসরণ করতে হবে, হযরত আদম (আ:), হযরত ইউসুফ (আ:) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে- এসব হিংসুকদের নয়। ৭. যার সাথে হিংসা সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে সদাচার, সালাম-কালাম এবং হাদিয়া-তুহফা পেশ করা। কুরআন শরীফে আছে,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

-"জওয়াবে তাই বলুন, যা উৎকৃষ্ট; তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (ফুস্সিলাত (৪১) : ৩৪)

৮. হিংসা দূরীকরণে লোভ ও ক্রোধ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসাসমূহ অনুসরণ করা উচিৎ।

গিবতা এবং মুনাফাসার অর্থ

কারো নিয়ামত দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে বিলীন হওয়ার জন্য নয় বরং তা নিজে অর্জনের জন্য আকাক্সক্ষা পোষণ করাকে গিবতা এবং মুনাফাসা বলে। রূপক অর্থে এটাকে হাসাদ তথা হিংসা বলা হয়। গিবতা কেবল জায়িযই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, শরয়ী ওয়াজিবাতের ক্ষেত্রে এটা আবশ্যক। ফজিলতের ক্ষেত্রে উত্তম। মুবাহের ক্ষেত্রে বৈধ। আর হারামের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

-"এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।" (মুতাফিফফীন (৮৩) : ২৬)

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

-"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে।" (হাদীদ (৫৭) : ২১)

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

-"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে ছুটে যাও।" (ইমরান (৩) : ১৩৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

-"দু'জন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হিংসা পোষণ করা যেতে পারে: ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সত্যের পথে খরচ করে এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন এবং সে তা অনুযায়ী আমল করে ও মানুষকে শিক্ষা দেয়।" [সহীহ বুখারী : ৭১] 'জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হিংসা করা' অধ্যায়ে ইমাম বুখারী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসখানা বর্ণনা করেন। এখানে 'হাসাদ' দ্বারা 'গিবতা' উদ্দেশ্য। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে শিরোনাম ও অধ্যায় তৈরী করে হাদীসের শাব্দিক জটিলতা নিরসন করেন। হাফিজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ হলো শ্রেষ্ঠ ঈষা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ

-"আমার উম্মতের উদাহরণ হলো চার ধরনের ব্যক্তির মতো: ১. যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম দান করেছেন। ইলম অনুযায়ী সে আমল করে এবং মাল যথাস্থানে খরচ করে। ২. যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন কিন্তু মাল দেন নি, সে বলে হে প্রভু! যদি আমার মাল হতো তাহলে ঐ লোকটার মতো আমি কাজ করতাম। বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই উভয় লোকই সমান সমান। ৩. যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন কিন্তু ইলম দেন নি। সে স্বেচ্ছাচার হয়ে যায়। অপাত্রে মাল ব্যয় করে। ৪. যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম কোনটাই দেন নি- সে বলে আমার যদি মাল হতো ঐ লোকটার (৩ নং) মতো আমি কাজ করতাম। অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এই উভয় লোক সমান সমান।" [আহমদ (১৭৩৩৬), তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, তাবারানী ইত্যাদি]

অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা

অহঙ্কার হলো একটি আত্মিক অবস্থা। অহঙ্কারী নিজেকে অগ্রাধিকার দেয় এবং অন্য থেকে নিজেকে ভালো মনে করে। আত্মম্ভরিতা হচ্ছে, কেবল নিজেকেই পছন্দ করা। পক্ষান্তরে অন্য থেকে নিজেকে ভালো মনে করাকে অহঙ্কার বলা হয়। এটা

একটি জঘন্য অভ্যাস। এ থেকে তাযকিয়া লাভ করা ফরয। কিবির প্রথমত ২ প্রকার:

১. অভ্যন্তরীণ- যার আলোচনা একটু পূর্বে করা হয়েছে।

২. বাহ্যিক- অর্থাৎ আত্মিক অবস্থার ফল স্বরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে যে কাজকর্মের প্রকাশ হয়। এর আনুষঙ্গিক বিষয়-আশয়ের আলোকে আরো অনেক প্রকার আছে। আমরা এখানে কেবল উল্লেখযোগ্য প্রকার নিয়েই আলোচনা করছি। অহঙ্কারী তার প্রতিদ্বন্দ্বী অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত: ১. আল্লাহর উপর অহঙ্কার, ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহঙ্কার এবং ৩. আল্লাহর সৃষ্টির উপর অহঙ্কার। এই তিন প্রকার অহঙ্কার হারাম। প্রথমোক্তটি দু'টি কারণে একজন মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর প্রথম প্রকার তো খুবই জঘন্য। এর দ্বারা মানুষ ফিরাউনের স্তরে পৌঁছে যায়- যার ঠিকানা হলো জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বর। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যকে কবুল করলো না আর নিজেকে আল্লাহ তা'আলার দাস মনে করতে লজ্জাবোধ করে- সে তো ফিরাউনের স্তরেরই উপযুক্ত। ফিরাউন নিজেকে মাওলায়ে হাক্বিকীর গোলাম মনে করতে খুবই লজ্জাবোধ করেছিল। সে বলেছিল,

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

-"আমি ছাড়া যে তোমাদের কোন উপাস্য আছে, তা আমার জানা নেই।" (ক্বাসাস (২৮) : ৩৮)

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

-"আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" (নাযিআত (৭৯) : ২৪)

কুরআন শরীফের অনেক আয়াতের মধ্যে অহঙ্কারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে কেবল কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

-"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব; যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (মু'মিন (৪০) : ৬০)

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

-"মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না; বস্তুত: যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।" (নিসা (৪) : ১৭২)

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

-"পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব।" (নিসা (৪) : ১৭৩)

ইবলিসের অহঙ্কার এবং রাহমানকে সিজদা করতে মক্কা শরীফের কুরাইশগণ যে অহঙ্কার প্রদর্শন করেছিল এগুলো ছিলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর দাস মনে করতে লজ্জাবোধ করে না কিন্তু আল্লাহর কোন হুকুমকে নিজের অবস্থানের বিপরীত মনে করে বা ইনসাফ বিরোধী মনে করে- তবে সে লোক যদিও ফিরাউনের স্তরের উপযুক্ত নয় কিন্তু অবশ্যই ইবলিসের স্তরের উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

-"তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল।" (হিজর (১৫) : ৩০)

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

-"ইবলিস ব্যতীত (সবাই সিজদা করলো), সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করল, ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (বাক্বারাহ (২) : ৩৪)

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

-"(আল্লাহ ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন) আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?" (ছোয়াদ (৩৮) : ৭৫)

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

-“সে (ইবলিস) বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।” (আরাফ (৭) : ১২)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

-“তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায় [সিজদা]।” (ফুরক্বান (২৫) : ৬০ - *এটা সিজদার আয়াত*)

দ্বিতীয় প্রকার হলো আল্লাহর রাসূলের সাথে অহঙ্কার। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষও- তাই তাঁর আনুগত্যে সন্দেহ করা, তাঁকে হেয় করা, তাঁর শরীয়তের বিশেষ কোন হুকুম নিয়ে ঠাট্টা করা, তিনি বিশ্ববাসীকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা নিজের অবস্থানের বিপরীত মনে করা, এগুলোর মাহাত্ম্য গ্রহণে কিংবা আনুগত্যকরণে লজ্জাবোধ করা - যেমনটি, পাশ্চাত্য জ্ঞানের পিপাসুদের মধ্য থেকে হচ্ছে, নিজেকে এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় বড় মনে করা। এসবই তাকাব্বুরের উল্লেখিত দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। এরকম মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের অঙ্গণ থেকে বহি®কৃত। এর বি¯তারিত আলোচনা বড় বড় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। অধম গ্রন্থকার এখানে ক’টি মাত্র আয়াতে কারীমার উল্লেখই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

-“তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না?” (জুখরুফ (৪৩) : ৩১)

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

-“আমরা কি আমাদের মতো দু’জন মানুষের উপর ঈমান আনবো?” (মু’মিনূন (২৩) : ৪৭)

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

-“তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ!” (ইব্রাহীম (১৪) : ১০)

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

-“যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (মু’মিনূন (২৩) : ৩৪)

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

-“এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।” (আন’আম (৬) : ৯৩)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

-“বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে; কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।” (যুমার (৩৯) : ৭২)

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

-“তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।” (নামল (২৭) : ১৪)

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

-“তার কি স§রণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফিরের আশ্রয়স্থল হবে?” (আনকাবুত (২৯) : ৬৮)

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

-“ আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম; আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?” (তাওবাহ (৯) : ৬৫)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

-"ছলনা কর না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" (তাওবাহ (৯) : ৬৬)

অহঙ্কারের তৃতীয় প্রকার হলো সৃষ্টির সাথে অহঙ্কার পোষণ। যদিও এটা প্রথমোক্ত দু'প্রকার থেকে নিম্ন স্তরের তথাপি, শরীয়তের নির্দেশনা ছাড়া কাউকে তুচ্ছ মনে করা এবং নিজেকে তার থেকে উত্তম জ্ঞান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বড়ত্ব এবং আজমতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। মানুষ যে-ই হোক না কোন, সে তো এক দুর্বল সৃষ্টি এবং এক প্রভুর মালিকানাধীন। সুতরাং রবের পক্ষ থেকে কোন সার্টিফিকেট ছাড়া অন্য থেকে নিজেকে উত্তম মনে করার অর্থ হলো, সৃষ্টিকর্তার সাথে বিবাদ করা। হ্যাঁ, মালিকের পক্ষ থেকে যদি কোন অনুমতি থাকে তবে তাতে কোন নিন্দা নেই। যেমন মুসলমানগণ কাফির ও মুলহিদ থেকে নিজেকে ভালো মনে করবে। অনুরূপভাবে কোন বিদআতী থেকেও নিজেকে উত্তম মনে করবে। আবু দাউদ শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, -"জিহাদের ময়দানে অহঙ্কার করা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়"। অনুরূপ, কোন মুলহিদ বা ফাসিকের সামনে কোন আলিম যদি অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, এটাও সমস্ত উলামার কাছে বেশ প্রশংসিত। দায়িরাতুল মা'আরিফ পৃষ্ঠা ৪৫-এ আছে: "উলামায়ে কিরাম বলেন, ধনীদের সাথে অহঙ্কার প্রদর্শন বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অহঙ্কার হচ্ছে আত্মসম্মানবোধের পরিচায়ক।" হাদীস শরীফে আছে,

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ

-"কোন মু'মিনকেই নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিৎ নয়।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

-"যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে।" (আরাফ (৭) : ১৪৬)

ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ধনীর নিকট অনুনয় বিনয় করলো, লোভ করে তার কাছে নিজেকে হেয় করলো, তার দ্বীন এবং ব্যক্তিত্বের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল"। হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব কিছু পাওয়ার জন্য কোন ধনী লোকের কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করলো, তার দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।" (তাবারানী) হযরত

আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل عليه

-"যে ব্যক্তি কোন ধনী লোকের কাছে পার্থিব কিছু লাভের আশায় অনুনয়-বিনয় করে, সে আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে।" (তাবারানী)

অহঙ্কারের চিকিৎসা

ক্রোধ ও লোভ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসাবলী এ ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। এখানে বিশেষ কিছু চিকিৎসার আলোকপাত করা যাচ্ছে। ১. এই বিশ্বাস করা, আমি আল্লাহর পথের একজন সালিক ও পথিক। ইবলিস, ফিরআউন এবং মক্কার কাফিরদের অনুসরণ করা আমার জন্য একদম অনুচিৎ। আমাকে তো অনুসরণ করতে হবে হযরত আদম (আঃ), হযরত মূসা কালিমুল্লাহ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। প্রথমোক্ত দলের অনুসরণে জাহান্নামই হবে আমার ঠিকানা। আর আম্বিয়ায়ে কিরাম, বিশেষ করে সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আমি পৌঁছে যাবো মাহবুবে হাক্বিকীর দরবারে। সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আমাকে বলে দিচ্ছে, যদি মানুষের হৃদয় অহঙ্কার ও অন্যান্য বদ অভ্যাস থেকে পবিত্র হয়, তবে দুনিয়াতেই সে মাহবুবে হাক্বিকীর বেকায়েফ হুজুরী লাভে ধন্য হবে। আর পরকালের জীবনে মাহবুবে হাক্বিকীর অতিথিশালায় পৌঁছে তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হবে।

২. নিজের মূলের দিকে লক্ষ্য করবে। আমি তো এক অপবিত্র পানির বিন্দু থেকে সৃষ্ট। আর পরিশেষে অপবিত্র লাশেই পরিণত হবো। আর মধ্য জীবনে আমি তো মল-মূত্রের বাহক মাত্র। এ বাস্তবতা স্বীকার করে নিলেই আর অহঙ্কারের কোন যোগ্যতাই থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

-"অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে।" (তারিক্ব (৮৬) : ৫)

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

-“মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!। তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন।” (আবাসা (৮০) : ১৭-১৯)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

-“আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে- এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।” (দাহর (৭৬) : ২)

৩. যেসব আয়াত ও হাদীসে অহঙ্কারের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা বর্ণিত হয়েছে তা মনোযোগসহ অধ্যয়ন করা। ১. আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

-“নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।” (নাহল (১৬) : ২৩)

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

-“অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।” (আন’আম (৬) : ৯৩)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

-“এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী- স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন।” (মু’মিন (৪০) : ৩৫)

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

-“(পয়গম¡রগণ) ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থকাম হল।” (ইব্রাহীম (১৪) : ১৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

-“যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।” (মু’মিন (৪০) : ৬০)

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

-"কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।" (যুমার (৩৯) : ৭২)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

-"যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। প্রশ্ন করা হলো, মানুষ তো সুন্দর জামা ও জুতা পছন্দ করে? তিনি জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছো সত্যকে অবজ্ঞা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।" (সহীহ মুসলিম (১৩১), আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি) অনুরূপ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সয়িব ইবনে ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু রায়হানা এবং ইবনে সা'আদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ ولا ابالي

-"অহংকার আমার চাদর। আর সম্মান আমার লুঙ্গি। এর কোন একটি নিয়ে যদি কেউ টানাহেঁচড়া করে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। তাতে আমি কোন পরোয়া করি না।" (মুসলিম, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

-"যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (আহমদ (৬৭১৯), বাইহাকী) হযরত সালামাহ ইবনে আকওআ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَكَبَّرُ وَيَذْهَبُ بنفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ مِنَ الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ

-"মানুষ অহঙ্কার করতে করতে অহঙ্কারী ও প্রতাপশীলদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। তারা যেরূপ বিপদগ্রস্ত হয় সে-ও অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়।" (তিরমিযি, তাবারানী (৬১৩১)) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي

-"জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। জাহান্নাম বললো, অহঙ্কারী ও প্রতাপশীলদের দ্বারা আমাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জান্নাত বললো, আমার কাছে তো কেবল দুর্বল, নিঃস্ব ও অসহায় মানুষের আগমন হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি হচ্ছ আমার করুণা। যে বান্দাকে ইচ্ছা করবো তাকে তোমার দ্বারা করুণা বর্ষণ করবো। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তি। যে বান্দাকে ইচ্ছা করবো, তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দেবো।" (বুখারী (৪৪৭২), আহমদ, মুসলিম) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَأَنْهَاكَ عَنْ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ قَالَ قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ

قَالَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ لَا قَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا قَالَ لَا قَالَ الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا قَالَ لَا قَالَ أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ قَالَ لَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْكِبْرُ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ

-"আল্লাহর নবী নূহ (আলাইহিসসালাম) যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হলেন তখন তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু সদোপদেশ দিতে চাই। তোমাকে দু'টি কাজের নির্দেশ ও দু'টি কাজ থেকে বাঁধা দিচ্ছি। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর (অর্থাৎ এর উপর দৃঢ় থেকে পাঠ করতে), কারণ যদি সপ্ত আকাশ ও জমিন এক হাতে রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর হাতে রাখা হয় তাহলে, এই কালিমার পাল্লা ভারী হবে। যদি সাত আসমান ও জমিন বৃত্তাকার ধারণ করে তবুও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটাকে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম। আমি নির্দেশ দিচ্ছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' এর (অর্থাৎ তা পাঠ করার) এটা হলো সৃষ্টজগতের প্রার্থনা। এর বিনিময়ে গোটা সৃষ্টি রিজিকপ্রাপ্ত হয়। তোমাকে নিষেধ করছি 'কুফর' এবং 'অহঙ্কার' থেকে। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অহঙ্কার কি? কোন মানুষ যদি সুন্দর জোড়া কাপড় পরিধান করে, আর (প্রাণী) সওয়ারীর মালিক হয়- এগুলোও কি অহঙ্কার? তিনি জবাবে বললেন, না। অহঙ্কার হলো তুমি সত্যকে অবজ্ঞা করবে আর মানুষকে তুচ্ছ মনে করবে।" (আহমদ : ৬২৯৫, বুখারী, হাকিম, তাবারানী) অনুরূপ হাদীস ইবনে আবি শাইবা, আবদ ইবনে হুমায়িদ, ইবনে আসাকির, আবু ইয়া'লা এবং বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম হযরত জাবির এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা অহঙ্কারের সংজ্ঞা জানা গেল। অর্থাৎ হক্বকে প্রত্যাখ্যান মানেই আল্লাহর সাথে অহঙ্কার আর মানুষকে ছোট মনে করার অর্থ হলো সৃষ্টির সাথে অহঙ্কার করা। হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহহাব আল খুজাই রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

-"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সংবাদ দেবো না? প্রতিটি দুর্বল ও অসহায় মানুষ জান্নাতী। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। আমি কি জাহান্নামী লোকদের সংবাদ দেবো না? প্রত্যেক ঔদ্ধত্য ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ও অহঙ্কারী হলো জাহান্নামী।" (বুখারী (৫৬১০), মুসলিম, আহমদ, তায়ালাসী, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ইত্যাদি কিতাবাদি)

দুনিয়া তথা সম্পদ ও সম্মানের আসক্তি

অত্র কিতাবে বার বার আলোচনা হয়েছে, দুনিয়ার মোহই হলো সব পাপের মূল। আগে উল্লেখিত সপ্তম নীতিতে একাধিকবার তাযকিয়ার হাক্বিকাত সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। তাই কেবল জরুরী বিষয়াদির উপর তাম্বীহ পেশ করা গেল। জেনে রাখুন, দুনিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু। সুতরাং যেসব কাজ-কর্ম আবেগ-অনুভূতি, আক্বীদা-বিশ্বাস, হাল-অবস্থা এবং যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হবে, তা দুনিয়ার আওতাধীন নয়। আর এসবের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে তা-ই দুনিয়া। কুরআন শরীফের এই আয়াতে দুনিয়ার ব্যাখ্যা এসেছে:

فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-"তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (নাযিআত (৭৯) : ৩৭-৪১)

উক্ত আয়াত দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা জানা গেল। প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই হচ্ছে দুনিয়া। আর ইলাহী বিধানের অনুসরণ করাই হলো দ্বীন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে- বিশেষ করে মাওলার পথের সালিকদের জন্য আবশ্যক হলো নফসের সাথে জিহাদ করা। নফসকে প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে বের করে ইলাহী বিধানের অনুগামী বানিয়ে দেওয়া- আর এটাই হলো তাযকিয়া। 'ইতহাফে'র মধ্যে

আছে, "ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রবৃত্তির সমষ্টি হলো ৫টি বিষয় যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

-"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়, আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি; এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" (হাদীদ (৫৭) : ২০)

পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির এই পাঁচটি সমষ্টি অর্জনে আরো সাতটি বিষয় যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

-"মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ- রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত- খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী; এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু, আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।" (ইমরান (৩) : ১৪)

প্রথম আয়াতে প্রবৃত্তির প্রসিদ্ধ প্রকারগুলোর বর্ণনা এসেছে আর দ্বিতীয় আয়াতে প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের আলোচনা এসেছে। এখন এই ৭টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন"।

১. নারীদের প্রতি আসক্তি: নফস যদি এই আসক্তির স্বাধীন অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে গেল। পার্থিব জীবনে ব্যভিচার, চুরি, সন্ত্রাস, হত্যা-লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে সে জড়িয়ে পড়বে। এভাবে বিভিন্ন শারীরিক রোগেও সে আক্রান্ত

হবে। আর পরকালের জীবনে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যদি এই প্রবৃত্তি পূরণে আল্লাহর বিধানের অনুগামী হয়ে যায়, সঠিক পন্থায় বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে যদি সৎ সন্তানলাভের আশা পোষণ করে, তবে তো সে প্রকৃত দ্বীনদার। পরকালের জীবনে মুত্তাকী লোকদের সাথে জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

২. সন্তান আসক্তি: এই আসক্তি যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়, যেমন মুসলমানদের জামাআত বৃদ্ধি করা এবং আল্লাহর জাকিরীনের সংখ্যা বাড়ানো- তবেই তা হবে প্রকৃত দ্বীন। আর যদি সাম্প্রদায়িকতা বা বর্ণবাদের শক্তি বর্ধন উদ্দেশ্য হয়- তবে এটাই হবে প্রকৃত দুনিয়া। এভাবে সন্তানের ভরণপোষণ এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে কোন মানুষ যদি অর্থোপার্জনে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। বা কৃপণতার মতো বদ আখলাকের শিকার হয়, তবে নিঃসন্দেহে এই লোকটি দুনিয়াদার।

৩-৭. অন্যান্য আসক্তি: এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

-"(মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে) রাশিকৃত স্বর্ণ- রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত- খামারের মত আকর্ষণীয় ব¯তু সামগ্রী।" (ইমরান (৩) : ১৪)

আয়াতে বর্ণিত এই চারটি বিষয় তথা সোনা-রূপা, অশ্ব, চতুষ্পাদ প্রাণী এবং ক্ষেত-খামারই হলো দুনিয়ার মোহ। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু'টি বিষয়কে দুনিয়ার স্তম্ভ নির্ণয় করেছেন, ১. অর্থালোভ এবং ২. যশ-সম্মান ও খ্যাতির মোহ। তবে আমাদের যুগে অর্থ ছাড়া সম্মানলাভ প্রায় অসম্ভব, তাই অর্থালোভই হচ্ছে দুনিয়ার মূল খুঁটি। যে ব্যক্তি অর্থোপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইলাহী বিধান মেনে চলবে, সে অবশ্যই দ্বীনদার। আর যদি ইলাহী বিধানের গণ্ডি অতিক্রম করে তবে সে প্রকৃত দুনিয়াদার। অর্থোপার্জনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার অর্থ হলো, হারাম, মাকরুহ এবং সন্দেহযুক্ত পন্থা থেকে বেঁচে থাকা। এভাবে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত হয়ে কোন ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত আদায়ে কোন প্রকারের শিথিলতা প্রদর্শন না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

-“হালাল ও হারামের ব্যাখ্যা শরীয়তে খুবই পরিষ্কার। এতদুভয়ের মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে- এগুলোর হালাল-হারাম নিয়ে সংশয় আছে। যে নিজেকে সংশয় থেকে বাঁচাতে পারলো সে তার দ্বীনকে পরিষ্কার রাখলো।” [সহীহ বুখারী (৫০) ইত্যাদি] সন্দেহযুক্ত বিষয় কথাটির অনেক অর্থ আছে: ১. যেখানে হালাল ও হারামের প্রমাণাদি সাংঘর্ষিক থাকে। যেমন বায়-বিল-ওয়াফা। (স্বাভাবিকভাবে যদি করয নিয়ে কেউ করযদাতাকে কোন কিছু বন্ধক দেয় তখন এ থেকে করযদাতা কোন প্রকার ফায়দা গ্রহণ করতে পারবেনা। এক্ষেত্রে একটি কৌশল হলো ঋণগ্রহীতা এই বন্ধকটি করযদাতার নিকট বিক্রি করে দেবে। এতে করে ঋণদাতা বন্ধক থেকে ফায়দা নিতে পারবেন। এটাকে বলে ‘বায় বিল ওফা’। যেহেতু এখানে ব্যবসা হচ্ছে তাই এ পদ্ধতি জায়য। অন্যদিকে যেহেতু এটা একটি কৌশল, মূলত ব্যবসা উদ্দেশ্য নয়, এজন্য তা সন্দেহ মুক্তও নয়। (শামী) -অনুবাদক) ২. যে ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ৩. এমন বৈধ কাজ যা হারাম কিংবা মাকরুহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মাল ব্যয় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের আহকাম মেনে চলার অর্থ হলো: মালের শরঈ হাক্ব যেমন, যাকাত, ফিতরা, কুরবানী এবং হজ্জ ইত্যাদি ইখলাস ও আল্লাহর মুহাব্বাতের সঙ্গে আদায় করা। নিজের এবং পরিবার পরিজনের হক্ব আদায়ে ইসরাফ ও কার্পণ্য না করা। যেমন খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় এবং বাড়ি-ঘরের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ইসরাফ এবং কার্পণ্য ছাড়াই ব্যয় করা। যেসব হাদীসে এই কর্মের প্রতি উৎসাহ এসেছে এসব অন্তরে সর্বদা উপস্থিত রাখা এবং ইখলাসের সাথে ব্যয় করা। বিধবা, ইয়াতীম, ফকীর, মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান এবং মুসাফিরদের প্রয়োজন সমাধানে সাধ্যানুযায়ী প্রাণখুলে দান করা। এ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সব সময় স্মরণ করা এবং ইখলাসের চর্চা করা। ইসলামের হিফাজত, তাবলীগ ও ইশাআতের জন্য পূর্ণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে রিক্তহস্তে মাল খরচ করা। বরং এটাই যেনো অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। তা-ই ছিলো হাযারাত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের আদর্শ। যে কাজে অর্থব্যয়ে শরীয়তের কোন অনুমতি নেই তা-তে ব্যয় করাটাই হলো ইসরাফ তথা অপব্যয়। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

টীকা: উল্লেখিত ক্ষেত্রে কোন চিন্তা-ফিকির ছাড়া অর্থ ব্যয় করাকেই বলে সাখাওয়াত। আর ব্যয় না করা বা মানসিক কষ্ট নিয়ে ব্যয় করাকে বলে বুখল। সর্বোত্তম সাখাওয়াত হচ্ছে ইসার- অর্থাৎ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া,

নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখে অন্যকে আহার করানো- যা ছিলো সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ। কুরআন শরীফে আছে:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-"নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।" (হাশর (৫৯) : ৯)

আর সর্বনিকৃষ্ট বুখল (কার্পণ্য) হলো, নিজের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ব্যয় না করা। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সাখাওয়াতের সর্বোত্তম স্তর হচ্ছে ইসার- নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তা দান করা। আর বুখলের সর্বনিকৃষ্ট স্তর হচ্ছে, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করতে কার্পণ্যবোধ করা। এমন অনেক বখিল আছে যারা অর্থ সঞ্চয় করে ঠিকই কিন্তু কার্পণ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থতার সময় চিকিৎসার জন্যও তা ব্যয় করে না।" দানশীল লোক মালকে একটি মাধ্যম মনে করে। কখনও এটাকে আসল উদ্দেশ্য মনে করে না। তবে তা থেকে সেবা পেয়ে সে আনন্দ লাভ করে। এটাকে সাময়িকভাবে ভালোবাসতে পারে। যেমন নাকি প্রেমাস্পদের সেবকের সাথেও মানুষের সাময়িক একটি ভালোবাসা থাকে।

কুরআন শরীফে আছে,

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

-"বলে দাও- যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর।" (বাক্বারাহ (২) : ২১৫)

সুলাইমান আলাইহিস্সালামের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ

-"আমি তো সম্পদের মুহাব্বাতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি।" (ছোয়াদ (৩৮) : ৩২)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

-"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত¡নার বাণী শোনাও।" (নিসা (৪) : ৫)

অন্যদিকে কৃপণ লোক মালকে মাকসাদ ও মাহবুব জ্ঞান করে। বরং পরিণামে এটাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ মাহবুবে পরিণত হয়। এ জন্য সে তার প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়।

হুব্বে দুনিয়া : প্রথম অধ্যায়

দুনিয়াকে আবাসস্থল মনে করা, এর সাথে অন্তর জড়িয়ে দেওয়া এবং দ্বীন ও আখিরাতের উপর এটাকে প্রাধান্য দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এটা তো ফিরাউন, নমরূদ এবং সমস্ত দুনিয়ালিপ্সুদের অনুকরণ। পক্ষান্তরে দুনিয়া থেকে বিতৃষ্ণ থাকা, সম্পর্কহীন থাকা এবং এ থেকে পলায়নের চেষ্টা করা হলো বিচক্ষণতার পরিচায়ক। আর এটাই হলো হাযারাত আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

-"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়, পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।" (আনকাবুত (২৯) : ৬৪)

فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

-"তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে; এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" (নাযিয়াত (৭৯) : ৩৭-৩৯)

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

-"অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে, তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই।" (নুজুম (৫৩) : ২৯-৩০)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

-"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন

ছাড়া কিছু নেই; তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।” (হূদ (১১) : ১৫-১৬)

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

-“নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।” (দাহর (৭৬) : ২৭)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

-“আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।” (ইমরান (৩) : ১৮৫)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

-“বস্তুত: তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।” (আ’লা (৮৭) : ১৬-১৭)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

-“অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন, সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।” (ইউনুস (১০) : ৭-৮)

হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কুরআনে করীমের অধিকাংশই দুনিয়ার নিন্দা এবং তা থেকে সম্পর্কহীন থাকা ও আল্লাহ তা’আলার সাথে কামিল সম্পর্ক স্থাপনের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আসলে এটাই নবী-রাসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য”।

আলোচ্য বিষয়ের উপরে কুরআন শরীফ থেকে কিয়দাংশ উল্লেখ করার পর এখন নবী আলাইহি ওয়াসসালাতু সালামের কিছু হাদীসের বর্ণনা দিচ্ছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

-"আল্লাহর রাসূল আমার কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে একজন মুসাফির বা পথিকের মতো জীবন-যাপন করো।" (বুখারী (৫৯৩) ও অন্যান্য) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন,

"مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ"

তারপর বললেন,

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য মুক্ত হও। আমি তোমার হৃদয়কে প্রাচর্যে ভরে দেবো। তোমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করবো। আর যদি এরূপ না করো তবে তোমার হৃদয় (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেবো আর কখনো দারিদ্র্যমুক্ত করবো না।" (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি, হাকিম, ইবনে হিব্বান) হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

-"যে ব্যক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার কাজকর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। তার নয়নযুগলের সামনে দরিদ্রতা দাঁড় করে দেবেন। সে এটুকু দুনিয়াই অর্জন করবে, যেটুকু তার ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যার লক্ষ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তা'আলা তার কাজকর্মকে সুশৃঙ্খল করে দেবেন। প্রাচুর্য দ্বারা ভরে দেবেন তার হৃদয়কে। দুনিয়া তার কাছে চলে আসবে কিন্তু সে হবে এর প্রতি একদম বিতৃষ্ণ।" (ইবনে মাজাহ : ৪০৯৫) আল্লামা মুনযিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। অনুরূপ হাদীস তিরমিযি, বায্যার, ইবনে হিব্বান, হাকিম এবং বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন হযরত আনাস, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন এবং হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ

-"যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার মূল উদ্দেশ্যে বানালো, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়াবী কাজকর্ম সমাধান করে দেবেন। আর যে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা পার্থিব আসক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে দুনিয়ার কোন্ উপত্যকায় পড়ে মৃত্যুবরণ করলো-সেদিকে আল্লাহর কোন দৃকপাত নেই।" (ইবনে মাজাহ : ২৫৩) রাফে ইবনে খাদিজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء

-"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তার কাছ থেকে দুনিয়া সরিয়ে রাখেন, যেরূপ কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।" (তাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকিম, খুজাঈ : ১২৮৬) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اللهُ مَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا

-"হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারকে প্রয়োজনমাফিক খাবার দান করুন।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম) হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত ছাগল দেখে বললেন,

وَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ

-"তোমাদের কাছে এই মৃত ছাগলটি যেরূপ তুচ্ছ, এই দুনিয়াটা আল্লাহর নিকট এরচেয়েও অধিকতর তুচ্ছ।" (সহীহ মুসলিম) হযরত সাহাল ইবনে সা'আদ

রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

-"আল্লাহর নিকট যদি এই পৃথিবীর মর্যাদা মাছির ডানা পরিমাণও হতো তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি : ২২৪২) হযরত আমর ইবনে আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

-"যখন হযরত আবু উবাইদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে আসলেন, তখন আনসার সাহাবীগণ তাঁর কাছে ছুটে চলে গেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামায আদায় করে মুচকি হেসে বললেন, মনে হয় তোমরা আবু উবাইদার আগমনের সংবাদ পেয়েছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা খুশীর সংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার ভয় করছি না। আমি তো ভয় করছি দুনিয়া যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, অনুরূপ তা তোমাদের উপর ছড়িয়ে পড়বে। তারা যেভাবে দুনিয়াতে প্রতিযোগিতা করে ধ্বংস হয়েছিল, তোমরাও অনুরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী (২৯২৪), মুসলিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ التَّكَاثُرَ

-"আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করছি না, তবে আশঙ্কা করছি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার।" (আহমদ (৭৭২৮) ইবনে হিব্বান, হাকিম) ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنما هلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم

-"দীনার ও দিরহাম তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছিল। আর এ দু'টো তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।" (বায্যার : ১৩৩৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

-"আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পার্থিব সৌন্দর্য উন্মুক্ত করবেন, আমি তা নিয়ে আশঙ্কা বোধ করছি।" (সহীহ বুখারী (১৩৩৭), মুসলিম) হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার পেট ভরে লাগাতার দু'দিন পর্যন্তও যবের রুটি আহার করেন নি।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম : ৫২৭৬) হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ نَاوَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

-"ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এক টুকরো যবের রুটি তুলে দিলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনদিন পর এটাই হলো তোমার বাবার প্রথম খাবার।" (আহমদ : ১২৭৪৬) হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর ঘুমনোর কারণে পবিত্র দেহে দাগ পড়ে যায়। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি একটু নরম বিছানা তৈরি করে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? পৃথিবীতে আমি তো একজন আরোহীর মতো, যে একটি গাছের নীচে ছায়া গ্রহণ করে চলে গেলো।" (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি (২২৯৩), তাবারানী) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

-"দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত।" (সহীহ মুসলিম (৫২৬৫), আহমদ) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

-"পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থ সবকিছু অভিশপ্ত একমাত্র আল্লাহর জিকিরকারী, আলিম ও তালিবে ইলম ছাড়া।" (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, তিরমিযি: ২২৪৪) হযরত আবু মূসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

-"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসলো সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিল; আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসলো, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। তাই তোমরা ক্ষণস্থায়ীর উপর চিরস্থায়ীকে প্রাধান্য দাও।" (আহমদ : ১৮৮৬৬, বায্যার, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ইত্যাদি) মুনযিরির মতে, মুসনাদে আহমদে বর্ণিত

এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মুত্তালিব আবু মূসা থেকে শ্রবণ করেন নি। তবে ইবনুল আলীমের (গ্রন্থকারের) মতে, উলামায়ে কিরামের ভাষ্য হলো, বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হন তখন তার জন্য না শোনা ক্ষতিকর নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য রাওয়ির ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা আছে। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

-"দুনিয়া নিগৃহের জন্য বাড়ি, সম্পদহীনের জন্য ধন। আর এ দুনিয়ার জন্য নির্বোধরাই অর্থ সঞ্চয় করে।" (আহমদ : ২৩২৮৩) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

-"আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেনো আপনার উম্মাতের জন্য প্রশস্ততা দান করেন। পারস্য ও রূমবাসীরা তো আল্লাহর উপাসনা করে না, কিন্তু তাদের নিকট দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে আছে। আল্লাহর রাসূল বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই অবস্থায় আছো? এসব লোকদের তো সৎকর্মের পুরস্কার পার্থিব জীবনেই দেওয়া হয়ে গেছে।"(সহীহ মুসলিম : ২৭০৭) অন্য বর্ণনায় আছে,

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ

-"তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও, তাদের জন্য হবে পার্থিব জীবন আমাদের জন্য হবে পরকালীন জীবন।" (আহমদ, সহীহ বুখারী: ৪৫৩২) হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ : إن النور إذا دخل الصدر انفسح

فقيل : يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف ؟ قال ﷺ : نعم ، التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

-"আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন§ুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে", অতঃপর বললেন, হৃদয়ে যখন জ্যোতির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তা উন্মুক্ত ও বিস্তৃত হয়ে যায়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন, এর নিদর্শন হলো, প্রতারণার গৃহ থেকে বিতৃষ্ণা, চিরস্থায়ীর প্রতি আগ্রহ, এবং মৃত্যুর আগেই এর প্রস্তুতি গ্রহণ।" (হাকিম : ৭৯৭৪, শুয়াবুল ঈমান)

"হে ভাই! কোন মানুষের কাছেই দুনিয়া স্থায়ী থাকবে না। তাই তোমার হৃদয়কে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পৃক্ত করে দাও।"

হুব্বে দুনিয়া : দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থ-সম্পদকে প্রিয় এবং উদ্দেশ্য জ্ঞান করা শরীয়তের খেলাফ। এটাকে সেবক বা বাহন মনে করাই হচ্ছে শরীয়তের নির্দেশনা। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তার সেবক থেকে বেশী কর্ম করিয়ে নিতে চায়। সেবককে একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না। অনুরূপভাবে শরীয়তের নিয়মানুসারে অর্থোপার্জন করা, তাকে সেবক মনে করে, শরীয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনচিত্তে প্রয়োগ করাই হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা। এটাকে বলে ছাখাওয়াত তথা আর্থিক বদান্যতা। এর চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে ইসার। যেটা হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) এর অনুপম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

-"পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।" (বাক্বারাহ (২) : ২-৫) ব্যয়কারীদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

-"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।" (ইমরান (৩) : ১৩৪)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

-"এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে; যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতের।" (মাআরিজ (৭০) : ২৪-২৫)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

-"তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে: কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" (দাহর (৭৬) : ৮-৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

-“হে মু’মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।” (সাফ (৬১) : ১০-১১)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-“যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।” (বাক্বারাহ (২) : ২৭৪)

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, দীর্ঘ একটি হাদীসের মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“নিশ্চয় অর্থ-সম্পদ হলো সবুজ, শ্যামল ও সুস্বাদু। যে ব্যক্তি সঠিক পন্থায় তা অর্জন ও স্বস্থানে তা প্রয়োগ করবে, তার জন্য মাল হবে উত্তম সহায়ক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন করলো, সে তো ঐ লোকের মতো যে খাবার খায় ও তৃপ্ত থাকে। কিয়ামতের দিন এই অর্থ-সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষী হবে।” (সহীহ বুখারী, মুসলিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن مسألة ، وسعيا على أهله ، وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان

-“যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা, পরিবার পরিজনকে সাহায্য করা ও প্রতিবেশীর প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য হালাল পন্থায় দুনিয়া অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য দুনিয়া অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।” (শুয়াবুল ঈমান : ৯৯৮৮) হযরত আবু

কাবাশা আনমারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ

-"আমি তিনটি বিষয়ের জন্য শপথ করছি। তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করছি তা স্মরণ রাখবে। যে তিনটি বিষয়ের শপথ করছি এগুলো হলো: ১. সাদাকা দ্বারা বান্দার মালের কোন হ্রাস হয় না, ২. বান্দাহ যখন জুলুমের উপর ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং ৩. বান্দাহ যখন ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ তখন দারিদ্র্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন। আমি তোমাদের কাছে যে হাদীসের বর্ণনা দিচ্ছি তা স্মরণ রাখো। পৃথিবী হচ্ছে চার ধরনের লোকের জন্য: ১. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন, সে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাতে আল্লাহর কী হাক্ব আছে তা সে জানে। সে শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত। ২. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন কিন্তু মাল দেন নি, সে নিয়তের মধ্যে নিষ্ঠাবান। সে বলে, যদি আমার মাল হতো আমি ঐ লোকটার মতো কাজ করতাম। তারা উভয়েই সমান বিনিময় পাবে। ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দেন নি, সে অর্থের কারণে

স্বেচ্ছাচার হয়ে যায়। প্রভুকে ভয় করে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং অর্থের মধ্যে আল্লাহর যে প্রাপ্য রয়েছে, এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান রাখে না। এ লোকটি নিকৃষ্টতম স্তরে অধঃপতিত। ৪. যাকে আল্লাহ মাল এবং জ্ঞান কিছুই দেন নি। সে বলে যদি আমার মাল হতো তাহলে ঐ (৩য়) ব্যক্তির মতো কাজ করতাম। এটা হলো তার দৃঢ় সংকল্প। তারা উভয়ই সমান পাপের ভাগীদার হবে।" (আহমদ : ১৭৩৩৯, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

-"দু'জন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কেবল ঈর্ষা পোষণ করা যেতে পারে: ১. যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সৎ পথে তা ব্যয় করে। ২. যাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, সে এর দ্বারা সুবিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ বুখারী : ৭১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

-"দু'জন লোকের ক্ষেত্রে কেবল হিংসা করা যেতে পারে: ১ যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, সে রাতদিন তা তিলাওয়াত করে এবং ২. যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং রাতদিন সে সাদকা করে।" (সহীহ বুখারী : ৪৬৩৭) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ

آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

-"দু'জন লোকের ক্ষেত্রে কেবল হিংসা করা যেতে পারে: ১. যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সে তা দিবানিশি তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তিলাওয়াত শ্রবণ করে বলে, আমাকেও যদি কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে আমিও তার মতো তিলাওয়াত করতাম এবং ২. যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেন, সে তা সৎপথে ব্যয় করে। অন্য একজন লোক তা দেখে বললো, হায়! যদি আমারও মাল থাকতো তাহলে আমিও তা সৎপথে ব্যয় করতাম।" (সহীহ বুখারী : ৪৬৩৮) হিংসা অধ্যায়ে হাসাদ এবং গীবতার মধ্যস্থ পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، إلا ما كان منها لله عز وجل

-"দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত একমাত্র ঐসব ছাড়া যা কেবল আল্লাহর জন্য।" (যিয়া, আবু নাঈম, শুয়াবুল ঈমান : ১০১২২) হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি এভাবে এসেছে: "যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হবে।" (তাবারানী) হযরত আবু যার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُّونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

-"যারা অধিক সম্পদশালী তারাই সওয়াবের দিক দিয়ে স্বল্পের অধিকারী, কিন্তু যারা এরূপ-ওরূপ ব্যয় করেন। আবু শিহাব তার সাম্মুখ ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন এবং বলেন, এরূপ লোক খুব কম আছে।" (সহীহ বুখারী : ২২১৩, মুসলিম) হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

-"সৎ লোকের সৎ সম্পদ কতোই না ভালো!" (আহমদ : ১৭৯৬, মুসলিম, তাবারানী) হযরত আবু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

-"মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করে- তাও সাদকা হবে।" (সহীহ বুখারী : ৫৩) হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

-"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা-ই তুমি ব্যয় করো- তার বিনিময় তুমি পাবে। এমনকি নিজের স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিলেও বিনিময়প্রাপ্ত হবে।" (সহীহ বুখারী : ৫৩)

ইসার: অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেওয়াকে ইসার বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন ত্যাগ ও কুরবানী, ইসার ও সহমর্মিতার জীবন্ত নমুনা। সহীহ বুখারীতে আছে, যখন তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন মনে গারে হিরা থেকে ফিরে আসেন, তখন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, তাঁকে এসব কথা বলে সান্ত¡না প্রদান করছিলেন:

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

-"আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করেন। অন্যের কাছে যেসব সদাচরণ পাওয়া যায় না তা আপনার কাছে পাওয়া যায়। আপনি অতিথিপরায়ণ। প্রত্যেক ঘটনায় আপনি সব সময়ই হক্বের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।" (সহীহ বুখারী : ৩) সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

-“মানবসমাজের সবচেয়ে দানশীল এবং কল্যাণময় ব্যক্তি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি রমজানে বেশী দানশীল হয়ে যেতেন।” (সহীহ বুখারী : ১৭৬৯) হাফিজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার অবস্থান অনুযায়ী যুৎসই কোন বস্তু প্রদান করাকে জুদ ও ছাখাওয়াত বলা হয়। এটা সাদকা থেকে ব্যাপক। এ কারণেই জুদে মতলক আল্লাহ তা'আলার সত্তা। সমগ্র মাখলুকাতই হলো তাঁর জুদ ও করমের ফল।”

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الم * اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

-“আলিফ লাম মীম। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।” (ইমরান (৩) : ১-২)

সমস্ত সৃষ্টির জীবন ও অবস্থান ‘আল-হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম’ সত্তার নামের ছায়াতলেই নিহিত। আমাদের জীবন এই শাশ্বত সত্তার মুখাপেক্ষী। তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে নব থেকে নবতর জীবন প্রদান করছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

-“আর ইয়াহুদীরা বলে: আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে; তাদেরই হাত বন্ধ হোক! একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।” (মায়িদা (৫) : ৬৪)

সহীহ মুসলিমে আছে:

سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

-“দিনে ও রাতে তিনি কেবল দানই করতে আছেন।” সুনানে তিরমিযিতে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ

-“আল্লাহ তা'আলা পরম দানশীল, তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন।”

সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শ্রেষ্ঠ দানশীল। নুবুওয়াতপূর্ব জীবনচরিতে আমরা হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মুখ থেকেও এ কথার ভাষ্য একটু আগে বর্ণনা করেছি। কাসিদায়ে লামিয়া অধ্যয়ন করলে আবু তালিবেরও ভাষ্য আমরা জানতে পারি। এখানে একটি পংক্তি উল্লেখ করা যাচ্ছে,

يستسقي الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل ابيض

-"তিনি লাল বর্ণময় সাদা চেহারাসম্পন্ন ছিলেন, তাঁর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল সামনে নিয়ে প্রার্থনা করলে করুণার বারিধারা বর্ষণ হতো। তিনি ইয়াতীমদের লালন-পালন করতেন। বিধবা নারীদের সসম্মানে জীবন ধারণের জন্য ব্যবস্থা করতেন।"

তাঁর নুবুওয়াতপরবর্তী জীবনচরিত সমস্ত মুসলমানদের জানা আছে। তিনি যদি অতুলনীয় ত্যাগ-কুরবানী এবং ইসারের দৃষ্টান্ত না রাখতেন, তবে তো পৃথিবীতে এক আল্লাহর উপাসনা হতো না। না তওহীদের উচ্চারণকারী কেউ থাকতো। আর না আমরা মাহবুবে হাক্বিকীর সন্ধান পেতাম। আমরা তো প্রকৃত জীবনের জ্ঞানই রাখতাম না। জীবনপথের আলোর দিশারী ওহির সন্ধান পেতাম না। না কোথাও এর চর্চা হতো। আর না থাকতো মসজিদ-মাদ্রাসার অস্তিত্ব। তাঁর সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগ-কুরবানী ও ইসারের চর্চা তাঁর সাথেই হচ্ছিলো। এখানে তাঁদের জীবন থেকে আর্থিক বদান্যতা ও ইসারের দু-চারটে ঘটনা উল্লেখ করছি।

আনসার সাহাবীগণ মুহাজিরদের সাথে ইসারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা হাদীসের কিতাবাদিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

কুরআনে কারীমে আছে:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-"সংকীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দিতেন।" (হাশর (৯): ৫৯)

অতি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আনসারী সাহাবীরা নিজেদের উপর মুহাজির ভাইদের প্রাধান্য দিতেন। সুফফা মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে নিজের ক্ষুধার্ত পরিবার-পরিজনের সামনে একজন আনসারী সাহাবী যে আপ্যায়ন করিয়েছিলেন, এটা হাদীস গ্রন্থাদির এক সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু

হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কাছে হযরত মুয়াওয়িয়া অথবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইয়িরের পক্ষ থেকে এক লক্ষ মুদ্রা আসতো। কিন্তু তিনি সূর্যাস্তের পূর্বেই তা খায়রাত করে দিতেন। ইফতারের সময় কোন খাবারই থাকতো না। (তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ)

ইয়ারমুকের যুদ্ধে একজন সাহাবী রক্তাক্ত অবস্থায় পানির জন্য হাহাকার করছেন। যখন তাঁর কাছে পানি নিয়ে আসা হলো, তখন পাশে আরেকজন হাহাকারকারী পিপাসু মুজাহিদের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, তাঁকে আগে পান করাও। যখন তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হতো তিনিও তৃতীয় আরেক পিপাসুর দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, তাঁকে আগে পান করাও। সারকথা, এভাবেই সবাই পানি পান না করে শাহাদাতের সুধা পান করলেন। (নুসবুর রায়া)

সুনানে তিরমিযির এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মানবসমাজের মধ্যে আমিই হলাম সর্বাধিক দানশীল। আমার পরে ঐ লোকই হলো সবচেয়ে বড় দানবীর যে আমার জ্ঞানের শিক্ষা দেয় ও তা প্রচার করে।" হে আল্লাহ! অধমের এই লেখনী কবুল করো। আমার জন্য এবং তোমার অন্যান্য অপরাপর বান্দাদের জন্য এটাকে মুক্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও। আ-মিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হুব্বে দুনিয়া : তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ-সম্পদকে লক্ষ্য ও প্রিয় মনে করা, এটা ব্যয় না করা অথবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা বোধ করাই হলো কৃপণতা। কৃপণতা খুবই অপবিত্র এবং এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। তাই হৃদয়কে তা থেকে পবিত্র করে নেওয়া মাওলার পথে সালিকের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। তার মাওলা ও মাহবুব তো পরম দানশীল। দানশীলতা তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর কৃপণতা হলো অতি নিন্দনীয়। যেমন, সুনানে তিরমিযিতে বর্ণিত হাদীসে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

-"মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে।" (নিসা (৪) : ১২৮)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

-"যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" (হাশর (৫৯) : ৯)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে; বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।" (ইমরান (৩) : ১৮০)

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

-"যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে।" (নিসা (৪) : ৩৭)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللهُ مَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهُ مَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

-"মানুষ যে সকালই যাপন করুক, দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানশীলকে বিনিময় দিন। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ক্ষতিগ্রস্ত করুন।" (বুখারী : ১৩৫১, মুসলিম) হযরত সাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اللهُ مَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ

-"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কার্পণ্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (সহীহ বুখারী : ৪৩৩৮, মুসলিম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ

-"মু'মিনের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্যের সমাগম হতে পারে না: ১. কার্পণ্যতা ও ২. অসৎ চরিত্রতা।" (তিরমিযি : ১৮৮৫, তাইয়ালাসী, বায্যার) হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

-"যুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকার রূপ লাভ করবে। কার্পণ্য থেকে বেঁচে থাকো। এটার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন ধ্বংস হয়েছে। তাদের মধ্যে রক্তপাত ও খুনাখুনি সংঘটিত হয়েছিল, তারা হারাম কাজকে হালাল বানিয়ে দিল।" (সহীহ মুসলিম : ৪৬৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

-"তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন ধ্বংস হয়েছে। শয়তান তাদেরকে কৃপণতা, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত করেছিল।" (আবু দাউদ : ১৪৪৭, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান) হযরত

আবু বাকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ

-"প্রতারক, খোঁটাদানকারী এবং কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (তিরমিযি : ১৮৮৬) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

-"অপদস্থতা সৃষ্টিকারী কৃপণতা এবং প্রকাশ্য কাপুরুষতা হলো মানুষের মন্দ বৈশিষ্ট্য।" (আবু দাউদ : ২১৫০, বুখারী, হাকিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أي داء أدوى من البخل

-"কৃপণতার চেয়ে আর কোন ব্যাধি বেশী ভয়ঙ্কর হতে পারে?" (হাকিম : ৪৯৫৩, আদাবুল মুফরাদ) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

-"কোন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধূলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হতে পারে না। কৃপণতা এবং ঈমান বান্দার হৃদয়ে কখনো একত্র হতে পারে না।" (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

-"উত্তম লোক যখন তোমাদের শাসক হবে, ধনীরা যখন দানশীল হবে এবং কাজকর্ম যখন পরামর্শের মাধ্যমে হবে, তখন ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে উত্তম হবে। পক্ষান্তরে যখন মন্দ লোকেরা তোমাদের শাসক হবে, ধনীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের কাছে অর্পিত হবে, তখন ভূগর্ভ তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে উত্তম হবে।" (তিরমিযি : ২১৯২)

হুব্বে দুনিয়া : চতুর্থ অধ্যায়

বুজুর্গানে দ্বীনের একটি কথা হলো, حب الدنيا رأس كل خطيئة "দুনিয়ার প্রেমই হলো সমস্ত পাপের মূল" (বাক্যটি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস। মিশকাত) যদিও পার্থিব আসক্তির সাথে অন্তরের সমস্ত মন্দ গুণের সম্পর্ক আছে, তথাপি নিম্ন বর্ণিত রোগসমূহের সম্পর্ক খুবই গভীর। আসলে এগুলোই হলো অন্যান্য রোগের মূল।

১. লোভ, ২. অহঙ্কার, ৩. কৃপণতা, ৪. খ্যাতির আসক্তি এবং ৫. মাওলা থেকে উদাসীনতা। লোভ ও অহঙ্কার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কৃপণতা সম্পর্কে অনেক আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফেরও বর্ণনা হয়েছে। এসব পাপ থেকে পবিত্রতা লাভ করা তালিবে মাওলার জন্য একান্ত জরুরী। যাকে আল্লাহ তা'আলা সীরাতে মুস্তাক্বীম দান করেছেন, সে যেনো মুসলিম সমাজকে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসখানা বুঝিয়ে দেন। উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃপণতার অশুভ পরিণাম যেমন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত, হারামকে হালাল জ্ঞান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ত্যাগ করা, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতারণা এবং জুলুম-নিপীড়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উম্মতে মুসলিমার জন্য আবশ্যক হলো, আজ তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে অর্থ সঞ্চয়ের যেসব নতুন নতুন পন্থাবলম্বন করছে, আর কৃপণতার চরম স্তরকে নিতান্ত নৈপুণ্যতা জ্ঞান করছে, তা থেকে অতি দ্রুত তাওবাহ করা। কারণ, এগুলোই হলো ধ্বংসের মূল কারণ।

খ্যাতির লোভ

এটি একটি ব্যাধি। এ থেকে পবিত্রা অর্জন অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

-“এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না, খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।” (ক্বাসাস (২৮) : ৮৩)

হযরত কাব ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

-“বকরির পালে প্রেরিত দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের চেয়েও মানুষের অর্থলোভ এবং যশের আসক্তি দ্বীনের জন্য বেশী ভয়ঙ্কর।” (আহমদ, তিরমিযি, দারিমী : ২৭৮৬) অনুরূপ হাদীস হযরত আসিম ইবনে আদি, হযরত উসামা ইবনে যায়িদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের সার কথা হলো, ছাগলের পালের জন্য নেকড়ে বাঘ যতটুকু ভয়ঙ্কর, এ থেকে দ্বীনের জন্য ভয়ঙ্কর হলো অর্থ ও খ্যাতির লিপ্সা। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “খ্যাতির আসক্তি আসলেই খুব নিন্দিত। তবে সে লোকের ক্ষেত্রে নয়, যাকে আল্লাহ তা’আলা তাঁর দ্বীনের প্রচারের জন্য খ্যাতি দান করেছেন। খ্যাতির কোন অনুসন্ধান এবং কৃত্রিমতাও তার মধ্যে নেই। যেমন মুজতাহিদ ইমামগণ”।

মাওলা থেকে উদাসীনতা

প্রকৃতিগতভাবেই সম্পদের মধ্যে ভালোবাসা ও আকর্ষণ রয়েছে। মাল তার অনুসন্ধানীকে অতি দ্রুত তার প্রেমিকে পরিণত করে দেয়। আর এ জন্যই কুরআনে করীমে এটাকে ফিতনা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

-“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।” (তাগ্বাবুন (৬৪) : ১৫)

কাব ইবনে আয়াজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

-"নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটি ফিতনা আছে, আর আমার উম্মাতের ফিতনা হলো মাল।" (সুনানে তিরমিযি : ২২৫৮, সহীহ ইবনে হিব্বান) এখানে ফিতনা শব্দের অর্থ পরীক্ষা। মানুষের অন্তর একই সময় দুই প্রেমাস্পদের প্রেমিক থাকে না। যদি সে মালের আশিক হয়, তবে মাওলায়ে হাক্বিকী থেকে অবশ্যই গাফিল বা উদাসীন। আর যদি মাওলার আশিক হয়, তবে সে সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত। এ জন্যই বলা হয়েছে, অধিকাংশ জান্নাতী নির্বোধ, দূর্বল ও দরিদ্র হবে। দুনিয়ালিপ্সুদের দৃষ্টিতে তারা আসলেই নির্বোধ, অপরিচিত এবং অনুপযুক্ত। এ-ও বলা হয়েছে, দরিদ্র লোকজন ধনীদের পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে যাবে। ধনীরা তো জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্থ-সম্পদের হিসাবই দিতে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

-"আমি জান্নাতে গিয়ে দেখেছি, এর অধিকাংশ লোকই গরীব।" (সহীহ বুখারী : ৩০০২, সহীহ মুসলিম) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি গ্রহণযোগ্য সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে, "আমি জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীকে মহিলা এবং ধনী দেখেছি"। হযরত উসামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ

-"আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়েছি। আমি দেখেছি, যারাই জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিঃস্ব। ধনীরা তো আটকে আছে।" (সহীহ বুখারী : ৬০৬৫, সহীহ মুসলিম) হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ

-"দরিদ্র মুসলমানরা ধনীদের পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে যাবে।" (সুনানে তিরমিযি : ২২৭৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে ইবনে মাযাহ - ইবনে উমর থেকে)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ كَانَا فِي الدُّنْيَا فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ

-"জান্নাতের দরজায় দু'জন মু'মিনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। পার্থিব জীবনে একজন ছিলো ধনী আর অপরজন দরিদ্র। গরীব লোকটি জান্নাতে চলে গেল। আর ধনী লোকটি বাধাপ্রাপ্ত হলো। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা তাকে আটকে রাখেন।" (মুসনাদে আহমদ : ২৬৩৪)

টীকা: উল্লেখিত হাদীসসমূহে দরিদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ গরীব লোকটি যার অন্তর ধনী, তার মধ্যে লোভ-লালসার কোন নাম-নিশানা নেই। দরিদ্র অবস্থায় সে অত্যন্ত ধৈর্যশীল থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মুখাপেক্ষিতা পেশ করতে সে লজ্জাবোধ করে। তার বাহ্যিক দরিদ্রতা সবসময় হৃদয়কে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখার এবং অনুনয়-বিনয় ও ভালোবাসার সাথে তাঁর সামনে উপস্থিত থাকার জন্য সহায়ক হয়। আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

-"অর্থের প্রাচুর্যে ধনাঢ্যতা নিহিত নয়। হৃদয়ের প্রাচুর্যই হলো আসল ঐশ্বর্য।" (সহীহ বুখারী : ৫৯৬৫) যে দরিদ্র লোকটির অন্তর ধনী নয় বরং লোভ-লালসায় আসক্ত, ধৈর্য ধারণ থেকে অনেক দূরে এবং গাইরুল্লাহর কাছে সওয়াল করতে অভ্যস্ত- হাদীসে বর্ণিত দরিদ্র দ্বারা এরকম দরিদ্র ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। আসলে সে প্রশংসার উপযুক্তও নয়। সে তো সৃষ্টির অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

أعوذ بك من الفقر والكفر

-"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দরিদ্রতা ও কুফর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসাঈ, তিরমিযি, সহীহ ইবনে হিব্বান : ১০২৯) আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة

-"ঐ লোকটি হলো সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব যার মধ্যে পার্থিব দরিদ্রতা এবং পরকালীন শাস্তির সমন্বয় ঘটে।" [সুনানে ইবনে মাযাহ, হাকীম) হাদীসে বর্ণিত ধনী দ্বারা ঐ লোক উদ্দেশ্য যে শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সদা মত্ত। অহঙ্কার লোভ লালসা এবং কৃপণতা থেকে তার হৃদয় অনেক দূরে। দিনে রাতে মাওলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদার মনে ব্যয় করতে সে অভ্যস্ত। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তার হৃদয় অর্থলিপ্সা থেকে বিচ্ছিন্ন, আর মাওলার প্রেমে পরিপূর্ণ। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل الصائم الصابر

-"কৃতজ্ঞপরায়ণ আহার গ্রহণকারী ব্যক্তির বিনিময় হলো ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর সমতুল্য।" (হাকীম : ৭৩০২, ইবনে হিব্বান) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরহেজগার এবং লুকিয়ে থাকা ধনী লোককে ভালোবাসেন।" (সহীহ মুসলিম : ৫২৬৬) আসলে, এসব ভালো গুণ অনেক কম ধনী লোকদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধিকাংশ জান্নাতবাসী দরিদ্র ও নিঃস্বদের মধ্য থেকে হবে। কারণ, অর্থ-সম্পদের পরীক্ষা দরিদ্রতার পরীক্ষার চেয়ে অনেক কঠিন। আর কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্যা আসলেই কম হয়ে থাকে।

সম্পদ ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা দু'টি ভিন্ন জিনিস। এই দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণকারীদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ ধার্য হবে, সে বিষয়টি বিশ্লেষণসাপেক্ষ। মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও সুফিয়ায়ে ইযাম এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফাতহুল বারী'তে পরিতৃপ্তিকর আলোচনা করেছেন। আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও 'ইতহাফে'র মধ্যে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। কুরআনে কারীম, হাদীসে নববী এবং মাশাইখে দ্বীনের লেখনী থেকে এই অধমের কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে

তাহলো, উভয় বিষয় সম্পর্কেই অনেক হাদীসের বর্ণনা এসেছে। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা গেল, গরীবরা ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। এতে দারিদ্র্যতার ফজিলত প্রমাণিত হয়। একইভাবে যেসব হাদীসে খাবার খাওয়ানো, মালের মাধ্যমে ইসলামের খিদমাত করা এবং দরিদ্র, ইয়াতীম ও বিধবার জন্য অর্থব্যয়ের ফজিলত এসেছে, তা মূলত ধনী লোকেরই ফজিলত। যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

-“বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য সাহায্যের প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ, নিরলস নামাযী এবং লাগাতার রোযাদারের মতো।” (সহীহ বুখারী : ৫৫৪৮) অপর বর্ণনায় আছে, “সে হচ্ছে নামাযে দণ্ডায়মানকারী লোকের মতো যে নাকি কখনো অলস হয় না এবং ঐ রোজাদারের মতো যে ইফতার করে না”। অন্য আরেকটি হাদীসে আছে,

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

-“‘জান্নাতের মধ্যে আমি এবং ইয়াতীমের জিম্মাদার অনুরূপভাবে থাকবো’ একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন।” (সহীহ বুখারী : ৪৮৯২)

ইসলামের খিদমাতে অর্থব্যয়ের মতো বড় ফজিলত আর কী হতে পারে? আর এজন্যই এক লোকের উপর আরেক লোকের একচেটিয়া প্রাধান্য দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। মালের পরীক্ষা এতো কঠিন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক ব্যক্তির জন্য প্রথমসারীর স্তরে উপনীত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়। যদি সে দুনিয়াতে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবে তো জান্নাতের ভর্তি পরীক্ষায় তাকে অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ শত বছর। পক্ষান্তরে দরিদ্রের পরীক্ষা অত্যন্ত সহজ, দুনিয়ার জীবনে যদি কেউ এই সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে তো সে চূড়ান্ত সফল। কারণ, তার জন্য জান্নাতের কোন ভর্তি পরীক্ষা নেই। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুসসালাম এবং আউলিয়ায়ে কিরাম রাহিমাহুমুল্লাহ এই উভয় পরীক্ষার ভালো-মন্দ পরিণাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের কথা ও কর্ম দ্বারা মানুষকে দারিদ্র্যের পরীক্ষার হলের দিকে আহ্বান করেছেন। যাতে মানুষ অত্যন্ত সহজে তার মাওলা ও মাহবুবের

সান্নিধ্য পেয়ে যায়। মাহবুবে হাক্বিকীর রাস্তা বেশ বিপদসঙ্কুল। এজন্য খুব ধীর-স্থির ও শান্তভাবে যাত্রা করা একান্ত জরুরী। এটা স্পষ্ট কথা, যে লোকের বোঝা কম, সে-ই বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ

-"হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (ফাতির (৩৫) : ৫)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور

-"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যুর; আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে; তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।" (ইমরান (৩) : ১৮৫)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

-"সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।" (আলাক্ব (৯৬) : ৬-৭)

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر

-"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে।" (তাকাছুর (১০২) : ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

-"মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স§রণ থেকে গাফিল না করে; যারা এ কারণে গাফিল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুনাফিকুন (৬৩) : ৯)

ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

-"আমি জান্নাতে গিয়ে দেখেছি, এর অধিকাংশ লোকই গরীব।" (সহীহ বুখারী : ৩০০২) হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أن بين أيدينا عقبة كؤودا ، لا يصعدها إلا المخفون

-"নিশ্চয় তোমাদের সামনে একটি স্তুপের উপত্যকা আছে। একমাত্র হালকা-পাতলা মানুষই তা থেকে রেহাই পেতে পারে।" (বায্যার, তাবারানী : ৪৯৬৫) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

-"যে ব্যক্তি মুসলমান হলো, প্রয়োজনমাফিক রিযিক পেলো এবং আল্লাহ তা'আলা যা দিয়েছেন তার উপর তুষ্ট থাকলো- সে-ই সফলতা লাভ করলো।" (মুসলিম : ১৭৪৬, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ) হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى

-"সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই এর দু' বাহুতে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তারা ঘোষণা দেন, মানব ও জিন ছাড়া এ ঘোষণা জমিনের সবকিছু শোনতে পারে: হে মানবসমাজ! তোমরা প্রভুর দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাও। আর জেনে রাখো, অর্থহীন অধিক জিনিস থেকে প্রয়োজনমাফিক অল্প জিনিসই উত্তম।" (আহমদ : ২০৭২৮, ইবনে হিব্বান, হাকিম) আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ

-"দীনার ও দিরহামের দাস ধ্বংস হোক! যে লোক কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয় সে ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক!।" (সহীহ বুখারী : ২৬৭৩) হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার একনাগাড়ে দু'দিন যবের রুটিও তৃপ্তিসহ আহার করেন নি।" (সহীহ বুখারী) হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ

-"এক দীনার ঋণ থাকাবস্থায় উহুদ পাহাড়ও যদি আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার জন্য সুখবর নয়।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম) হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি উরওয়াহকে বলেন,

ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَار

-"হে আমার বোনপুত্র! তিন মাস পর্যন্ত চলে গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গৃহে আগুন ছিলো না।" (বুখারী : ২৩৭৯, মুসলিম) হযরত আবু বুরদ্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ

-“আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা একটি চাদর ও একটি গাঢ় লুঙ্গি বের করে বলেন, এই দু’টি পোশাক পরেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন।” (সহীহ বুখারী : ৫৩৭০, মুসলিম) হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

-“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন, তখনো তাঁর ত্রিশ ছা পরিমাণ যবের বিনিময়ে একটি বর্ম জনৈক ইয়াহুদির নিকট বন্ধক ছিলো।” (সহীহ বুখারী : ২৭০০, মুসলিম) ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَهْلَ الشِّبَعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوعِ فِي الآخِرَةِ غَدًا

-“পৃথিবীতে যারা পরিতৃপ্ত থাকে পরকালের জীবনে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে।” (তাবারানী : ১১৫২৭) ইমাম গায্যালী এবং আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পথিকের মতো জীবন-যাপন করেছেন। তিনি দালানকোঠা নির্মাণ করেন নি, দীনার-দিরহাম রেখে যান নি, আর না কাউকে বন্ধু হিসেবে বেছে নেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ

-“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ৩১)

যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তারাই হলো তাঁর প্রকৃত উম্মাত। দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণ আর আখিরাতমুখী ব্যক্তিই অনুসরণ করতে পারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি আহ্বান করেছেন পরকালীন জীবনের প্রতি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

-“তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে; এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।” (নাযিয়াত (৭৯) : ৩৭-৪১)”

এখানে স্মরণ রাখা জরুরী, গরীব দ্বারা এ লোক উদ্দেশ্য নয়, যে নিজেকে হীন মনে করে বরং উদ্দেশ্য হলো, ঐ লোক যার হৃদয় ধনী। আর তার কাছে এ পরিমাণ মাল আছে যা, তাকে অন্যের কাছে সাওয়াল করা থেকে রক্ষা করে। আর এটাই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের ভাষ্য যা তিনি দু’আর মধ্যে বলতেন,

اللهُ مَّ ارْزُقْ آل محمد كفافا

-“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের পরিবারকে প্রয়োজন-মাফিক রিজিক দান করুন”।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আমার মুখাপেক্ষিতা পেশ করছি আর কারো কাছে নয়। আপনার কাছেই আমি ছোট অন্য কারো কাছে নয় এবং আমি আপনারই ভয় কামনা করি, অন্য কারো নয়। হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “স্বীয় মাহবুব আল্লাহ তা’আলার মুখাপেক্ষী হওয়াই হলো রূহের আসল মুখাপেক্ষিতা। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে ধণাঢ্যতা হলো মাহবুবে হাক্বিকীর হুজুরী হাসিলের মাধ্যমে অন্য সব থেকে বিমূখ হয়ে যাওয়া”।

পেটের চাহিদা পূরণে পাপ থেকে পবিত্রতা অর্জন

খানাপিনার মধ্যে পবিত্রতা অর্জন: হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদারিজুস সালিকীনে লিখেন: পানাহারে মূলত ক্ষতিকর বিষয় হলো দু’প্রকার। ১. যা সত্তাগতভাবেই ক্ষতিকর। যেমন হারাম বস্তুসমূহ। এটাও আবার দু’প্রকার: (ক) যা আল্লাহর নিকট অস্তিত্বগতভাবে হারাম, যেমন রক্ত, মদ, ‘আনইয়াব’ তথা তীক্ষè দাঁতধারী প্রাণী যেমন- হাতী, সিংহ এবং শূকর ইত্যাদি। এভাবে হিংস্র পাখিও নিষিদ্ধ। (খ) যেসব হারাম বস্তুকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অধিকার রক্ষার্থে হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন চুরি, আত্মসাৎ এবং কারো অসন্তুষ্টিতে গৃহীত মাল। এই প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়াদির সাথে আরো অনেক

প্রকার আছে যা মাকরুহ এবং মুশতাবাহ (সন্দেহযুক্ত) বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সালিককে অবশ্যই নিজের পেটকে সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখতে হবে। সহীহ্ বুখারীতে আছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হালাল ও হারাম উভয়টাই পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়ে গেছে। উভয়টার মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে। যে সন্দেহজনক বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলো, সে তার দ্বীনকে হিফাজত করলো।” ২. ঐ হারাম বস্তু যা সত্তাগত দিক দিয়ে ক্ষতিকর নয় কিন্তু আপেক্ষিক দৃষ্টিতে আখিরাতের পথের সালিকের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং অতিরিক্ত খাওয়া এবং অতিরিক্ত ব্যয় করা যাকে ইসরাফ বলা হয়, তা-ই এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ করা কিংবা কোন মাকরুহ অথবা সন্দেহযুক্ত পথে অর্থ ব্যয় করা। যেমন নাচ, গান, তামাশায় টাকা-পয়সা খরচ করা। ইসরাফ করা হারাম। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

-“নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।” (বনী ইসরাঈল (১৭) : ২৭)

জিহ্বার আপদসমূহ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ, আপনার যাত ও সিফাত সম্পর্কে শরীয়তের খিলাফ কোন কথা, গীবত, চুগলখোরী, অতিভক্তি, হাঙ্গামা, গালিগালাজ, নির্লজ্জতা, ঠাট্টা-মশকরা, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ও অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

মাওলার পথের সালিকের জন্য আবশ্যক হলো নিজ যবানকে হিফাজত করা। এই জিহ্বার মাধ্যমেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা যায় আর শয়তানের পথেও। এর দ্বারা যেমন হক্বের হিফাজত হয় তদ্রূপ বাতিলেরও। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

-“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেনো কল্যাণকর কথা বলে, না হয় নিশ্চুপ থাকে।” (সহীহ বুখারী : ৫৫৯) হাদীসের ভাষ্য

হলো, যেনো এমন কথা বলে, যার দ্বারা সে আখিরাতে উপকারপ্রাপ্ত হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَمَتَ نَجَا

-"যে নীরব থাকলো সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযি : ২৪২৫ ও তাবারানী) সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাক্বাফী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا

-"আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিসের শিক্ষা দিন, যা আমি আকড়ে ধরবো। তিনি উত্তর দিলেন, তুমি বলো আমার প্রভু হলেন আল্লাহ। অতঃপর তুমি অটল-অবিচল থাকো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কোন্ বিষয়টি ভয়ঙ্কর বলে আপনি মনে করেন? তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেন, এটা।" [সুনানে তিরমিযি : ২৩৩৪, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ

-"সে-ই হলো প্রকৃত মুসলিম, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর সে লোকই হলো প্রকৃত মুহাজির যে আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত কর্ম ত্যাগ করলো।" (সহীহ বুখারী : ৯ ও মুসলিম) উক্ববা ইবনে আমীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

-"আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসে নিহিত? তিনি বললেন, অকল্যাণ থেকে তুমি তোমার জিহ্বাকে ফিরিয়ে রাখো।" (সুনানে তিরমিযি : ২৩৩০) সাহল ইবনে সা'আদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

-"যে ব্যক্তি আমার জন্য তার মুখ ও লজ্জাস্থানের দায়িত্বশীল হলো, আমি তার জন্য জান্নাতে দায়িত্বশীল হবো।" (সহীহ বুখারী : ৫৯৯৩, সুনানে তিরমিযি) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

-"আমি কি তোমাকে দ্বীনের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে সংবাদ দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বাকে রুখে রাখো। আমি বললাম, ইয়া নবীআল্লাহ! আমাদের কথাবার্তা দ্বারাও কি আমরা পাকড়াও হবো? তিনি বললেন, হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুন! মানুষের অনর্থক কথাবার্তাই তো তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (মুসনাদে আহমদ : ২১০০৮, সুনানে তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) আবু ওয়াইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَكْثَرُ خَطَايَا ابنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ.

-"আদমসন্তানের অধিকাংশ ভুলই তার রসনার মধ্যে নিহিত।" (বাইহাকী, তাবারানী : ১০২৯৪) আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ

-"মানুষ এমন কথা বলে, সে মনে করে এর দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এটাই তাকে সত্তুর বৎসরের জন্য জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযি : ২২৩৬) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

-"তোমরা আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিরিক্ত কথা বলো না, যিকরুল্লাহ ছাড়া অতিরিক্ত কথা দ্বারা অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়। আর কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে।" (সুনানে তিরমিযি : ২৩৩৫, বাইহাকী) আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِي رَجُلًا أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ

-"জনৈক লোক মৃত্যুবরণ করলেন। অপর এক ব্যক্তি বললেন, লোকটি জান্নাতের সুসংবাদ পেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি শ্রবণ করে বললেন, তুমি কি জানো না, সে হয়তো অনর্থক কোন কথা বলেছে অথবা কৃপণতা করেছে।" (সুনানে তিরমিযি : ২২৩৮)

জিহ্বার আপদ তো অনেকই। আমরা কেবল বড়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করবো:
১. কিয্ব (মিথ্যা): অবাস্তব কথাকেই 'মিথ্যা' বলা হয়। যদি এটা কথার বিশেষণ হয় তখন এর অর্থ হলো, বাস্তবতার বিপরীত। আর যদি কোন কাজ ও অবস্থার বিশেষণ হয় তখন এর অর্থ হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও অবস্থার বিপরীত পন্থাবলম্বন করা। অন্যদিক বিবেচনায় বলা যায়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখাই হলো, সিদ্ক বা সত্যতা। আর বজায় না রাখা হলো, কিয্ব বা মিথ্যাবাদিতা। মাওলার পথে সালিকের জরুরী হলো, প্রথমতঃ নিজের জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করা আর দ্বিতীয়তঃ নিজের কর্ম ও অবস্থাকে কিয্ব তথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور

-"সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।" (হাজ্জ (২২) : ৩০)

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

-“অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক।” (যারিয়াত (৫১) : ১০)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

“তোমাদের জন্য সত্যবাদিতা আবশ্যক। সত্যই কল্যাণের পথ দেখায়। আর কল্যাণ দেখায় জান্নাতের পথ। মানুষ যখন সত্য বলতে থাকে এবং সত্য নিয়ে চিন্তা করে, তখন শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ তা’আলার দরবারে সিদ্দীক হিসাবে বিবেচিত হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামের পথপ্রদর্শন করে। মানুষ যখন সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে ও মিথ্যার ধ্যান করে, তখন সে আল্লাহর কাছে কায্যাব তথা বড় মিথ্যুক হিসাবে বিবেচিত হয়ে যায়।” (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি : ১৮৯৪) সামুরা ইবনে জুনদুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

-“মি’রাজের রাতে যে ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছিল তার ঠোঁট ছেড়া হচ্ছে, সে ছিলো একজন মিথ্যুক। কিয়ামত পর্যন্ত এই ব্যক্তির শাস্তি এরূপ হতে থাকবে।” (সহীহ বুখারী : ১২৯৭) আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

-“মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি, সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে এবং চুক্তি করলে তখন প্রতারণা করে।” (সহীহ বুখারী,

মুসলিম) ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, “যদিও সে সালাত কায়েম করে, সিয়াম সাধনা করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে”। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ’স রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

-“যার মধ্যে চারটি কর্ম পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক বিবেচিত হবে। কারোর মধ্যে এই চারটির একটিও যদি থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকী চরিত্র বিদ্যমান বলে বিবেচিত হবে, সে এটা বর্জন না করা পর্যন্ত। এই চারটি বিষয় হলো: যখন তাকে আমানতদার সাব্যস্ত করা হবে তখন সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে তখন প্রতারণা করে। আর যখন ঝগড়া করে তখন অবাধ্যতা অবলম্বন করে।” (সহীহ বুখারী, মুসলিম : ৮৮, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “বান্দা ঈমানের খাঁটি স্তরে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না সে ঠাট্টা-মশকরা, মিথ্যা এবং পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ ত্যাগ না করেছে, ঝগড়ার ক্ষেত্রে যদিও সে সত্যপন্থী হয়।” (আবু ইয়া’আলা, আহমদ, তাবারানী, হযরত আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে) আবু উমামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

-“মু’মিন খিয়ানত ও মিথ্যাচারিতা ছাড়া অন্য সব চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।” (আহমদ : ২১১৪৯) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ

-“মিথ্যা কথা বলার ফলে বান্দার মুখ থেকে যে দুর্গন্ধ বের হয়, ফিরিশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে সরে পড়েন।” (সুনানে তিরমিযি, ইবনে আবিদ দুনইয়া) হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً

-"সাহাবায়ে কিরামের নিকট মিথ্যাবাদিতা জঘন্যতম স্বভাব বলে বিবেচিত হতো। আল্লাহর রাসূলের কাছে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলতো, তখন তিনি তার উপর খুবই অতন্তুষ্ট হতেন, যতক্ষণ না এই লোকটি তাওবাহ করেছে কি না জানতে পরেছেন।" (আহমদ : ২৪০২৭) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كذبَةٌ

-"যদি কোন মানুষ কোন শিশুকে বলে, এদিকে এসো! এই নাও! এবং তাকে কিছু না দেয়, তাহলে এটাও হলো মিথ্যাবাদিতা।" (আহমদ (৯৪৬০, এর সমর্থক আরো অনেক হাদীস আছে) বাহয ইবনে হাকীম তাঁর বাবার কাছ থেকে, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

-"আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শোনেছি, ধ্বংস ঐ লোকের জন্য যে মানুষের সাথে কথা বলার সময় তাদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। সে ধ্বংস হোক! সে ধ্বংস হোক!।" (আবু দাউদ, তিরমিযি : ২২৩৭, নাসাঈ, বাইহাকী) 'সে ধ্বংস হোক' কথাটি বার বার বলেছেন একারণে যে, মিথ্যা হলো সব অপকর্মের মূল। এই অপকর্মের সাথে যখন হাসি-মশকরা যুক্ত হয়, তখন তা আরো জঘন্য রূপ ধারণ করে। কারণ, হাসি-ঠাট্টার দ্বারা অন্তর মরে যায় এবং অবাধ্যতার সৃষ্টি হয়। আহমদ ও তাবারানী উক্ত হাদীসটি হাকিমের দাদা হযরত মুয়াওয়িয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবিল হামাসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ

-"নুবুওয়াতের পূর্বে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম: এক স্থানে আমি অবস্থানরত ছিলাম, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি এখানে থাকুন আমি আসছি। কিন্তু আমি ভুলে যাই। আমি যখন তৃতীয় দিন ফিরে আসলাম, তখন তাঁকে উক্ত স্থানেই পেলাম।" (সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৪৪) হযরত আবু বাকরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

-"আমি কি তোমাদেরকে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবগত করবো না? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার বানানো এবং মাতা-পিতার অবাধ্যতা করা। একথা বলে তিনি হেলান দিয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো! তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো! এ কথাটি বার বার বলতে থাকেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, আহ! তিনি যদি নীরব হয়ে যেতেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طعمة

-"চারটি বৈশিষ্ট্য যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে দুনিয়ার সবকিছুই যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও তোমার ক্ষতি হবে না: ১. সত্য বলা, ২. আমানতের হিফাজত, ৩. সদাচার এবং ৪. খাবারে পবিত্রতা।" (মুসনাদে আহমদ : ৬৩৬৫, তাবারানী, বাইহাকী)

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এই পাপের দ্বারা অন্তরাত্মা কালো হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

-"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।" (বাক্বারাহ (২) : ২৮৩)

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (নিসা (৪) : ১৩৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

-"এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।" (ফুরক্বান (২৫) : ৭২)

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ

-"আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? (এটা হলো) মিথ্যা বলা বা তিনি বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" (সহীহ বুখারী : ৫৫২০, সহীহ মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّار

-"মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার পা ততক্ষণ পর্যন্ত সরতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য আগুন আবশ্যক করে দেন।" (সুনানে ইবনে মাযাহ : ২৩৬৪, হাকিম) তালিবে মাওলার জন্য অতি জরুরী, এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। যদি এই জাগরণ ও সতর্কতার আগে এরকম পাপ ঘটে থাকে, এজন্য তাওবায়ে নাসূহা করে নেওয়া। আর যদি কোন মুসলমানের প্রাপ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তা তালাফি করে দেওয়া।

মিথ্যা শপথ

অতীত কোন বিষয়ের উপর জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কবীরা গুনাহসমূহ হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা করা, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।" (সহীহ বুখারী) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

-"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করলো, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত।" (সহীহ বুখারী : ৪১৮৫, মুসলিম, আহমদ, তাইয়ালাসি)

আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত এবং দ্বীনের খিলাফ কথাবার্তা

এটা একটি জঘন্য কাজ এবং হারাম। কখনো কখনো কোন মানুষ এরকম কথা বলে কাফির, যিন্দিক ও মুলহিদে পরিণত হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত জ্ঞানের উল্টো কথা বলা হারাম এবং এটা কুফরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। তাঁর ইলম হলো ইলমুল ওয়াহী। ইলমুল ওয়াহী ছাড়া বাকী অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তরীকতের মাশাইখের মতে জল্পনা-কল্পনা এবং কিছু ধারণার নাম। এসবকে ইলম জ্ঞান করাই মূর্খতা। এটাই (অর্থাৎ ইলমুল ওয়াহী) হলো ইলমে হাক্বিকী যার দ্বারা মানুষ তার সূচনা ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং এ থেকে সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগ্রহ জন্মে। হৃদয়ে খালিক ও রাহীমের সাথে নিতান্ত ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। একজন আশিক যেমন তার মাশুকের সাক্ষাতে ব্যস্ত থাকে ঠিক এভাবে প্রকৃত একজন মানুষও তার মাওলায়ে হাক্বিকী ও মাহবুবে আযমের সাক্ষাতের প্রস্তুতিতে সব সময় ব্যস্ত থাকে। এই প্রস্তুতির ব্যস্ততা মাহবুব ছাড়া অন্য সবকিছুর সামনে সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এ অবস্থা সৃষ্টি হয় একমাত্র

ইলমুল ওয়াহীর মাধ্যমে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ যতোই অগ্রসর হোক, ততোই সে তার মাওলায়ে হাক্বিকী থেকে অপরিচিত হয়ে যায়। যে অক্সফোর্ড অথবা ক্যাম্ব্রিজ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করছে, সে তো মাওলার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। আর এজন্যই তরীকতের ব্যাখ্যাকারগণ এসব জ্ঞানকে মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সারকথা, যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়, এটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। আর যা কিছু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তা মূলত জাহালাত ও মূর্খতা। তাই যে লোক যতো বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সে ততো বড় আলিম। যে আল্লাহ থেকে যতো বেশী দূর হবে সে ততো বড় জাহিল ও মূর্খ বলে আখ্যায়িত হবে। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করে, তরীকত বিশ্লেষকদের মতে সে সবচেয়ে বড়ো মূর্খ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

-"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না; নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬)

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

-"আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে।" (আরাফ (৭) : ১৮০)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا

-"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়।" (ফুস্সিলাত (৪১) : ৪১)

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

-"অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই।" (নুজুম (৫৩) : ২৯-৩০)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

-“তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।” (রূম (৩০) : ৭)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

-“বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।” (কাহাফ (১৮) : ১০৩-১০৪)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

-“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই (উলামা) কেবল তাঁকে ভয় করে।” (ফাতির (৩৫) : ২৮)

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত সবচেয়ে বড় পাপ হলো আল্লাহ তা’আলার দিকে কোন মিথ্যা কথা সম্বন্ধ করা। এটা প্রকাশ্য কুফর। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ

-“ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসে নি।” (আন’আম (৬) : ৯৩)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মিথ্যাকথা সম্বন্ধ করাও বড় একটি পাপ। তবে এটা কুফর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দু’টি মত আছে। প্রথম অভিমত হলো, সে কাফির হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো কাফির হবে না, কিন্তু বড় গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। এটিই হলো অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

-“যে ব্যক্তি জেনে শোনে আমার উপর মিথ্যারোপ করলো, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।” (সহীহ বুখারী : ১০৭, সহীহ মুসলিম) বিশেষজ্ঞদের মতে এই হাদীসটি মুতাওয়াতির (অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বর্ণিত)। মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর

'মওযুয়াত' গ্রন্থে বলেন, শতাধিক সাহাবী উক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে এরকম কোন ক্বওলি (বাচনিক) হাদীস আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় নি। হাফিজ যাইনুদ্দীন ইরাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুত্তাকী হাদীস বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি পায় নি, তার জন্য আল্লাহর রাসূলের হাদীস বর্ণনা বৈধ নয়। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য হলো মিথ্যা বলা হারাম। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলা যে আরো কত বড়ো পাপ তাতো সহজেই অনুমেয়। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কাজ ও কর্ম হলো শরীয়ত। তাবারানী স্বীয় গ্রন্থ 'মু'জামে আওসাতে' ইবনে আদি তাঁর 'কামিলে' এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস লম্বা একটি বর্ণনায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যার সারকথা হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ধর্মীয় ও পার্থিব কোন বিষয়-আশয়ের উপর মিথ্যারোপ করে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, হে তালিবে সাদিক! যদি হিদায়াত লাভে ধন্য হও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাবার্তা বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে।

গীবত

কারো পশ্চাতে সমালোচনা করাকে গীবত বলা হয়। এটা জঘন্য একটি অপরাধ এবং হারাম। সমালোচিত ব্যক্তি যদি সমালোচককে ক্ষমা না করে তবে আর ক্ষমা পাওয়ার আশা নেই। হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা গীবতকারীর সমস্ত নেকী এবং পূণ্য তার সমালোচিত ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন। তার যদি পূণ্য না থাকে বা যথেষ্ট না হয়, তাহলে সমালোচিত ব্যক্তির সমস্ত পাপ তাকে প্রদান করবেন। মাওলার পথে সালিককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

-"(মু'মিনগণ) তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে, তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?।" (হুজুরাত (৪৯) : ১২)

আবু বাকরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের খুতবায় বলেন,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

-"তোমাদের পরস্পরের রক্ত, অর্থ-সম্পদ এবং সম্মানহানি একে অন্যের জন্য হারাম, যেমন নাকি তোমাদের এই শহর, এই মাস এবং আজকের এই দিন তোমাদের জন্য হারাম। আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" (সহীহ বুখারী : ১৬২৫, মুসলিম)

আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মর্যাদা রক্ষা করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডল থেকে আগুনকে বারণ করে রাখবেন।" (সুনানে তিরমিযি) ইমাম আহমদ আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে এই হাদীসটি একটু অতিরিক্ত বাক্যসহ বর্ণনা করেন, "আল্লাহর জন্য এটা আবশ্যক হয়ে যায় যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।" (আহমদ)

টীকা: কোন মুসলমান যদি ন্যায়পরায়ণ হন, অথবা তার অবস্থা যদি অজানা থাকে, তবে তার গীবত করা হারাম। কেউ যদি প্রকাশ্য ফাসিক, অত্যাচারী শাসক অথবা পথভ্রষ্টকারী আলিম হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে গীবত করা হারাম নয়। হযরত হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখয়ী এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনের বক্তব্য হলো,

ثلاث ليس لهم غيبة : الظالم ، والفاسق ، وصاحب البدعة

"তিনদল মানুষের সমালোচনা করা গীবত নয়: ১. অত্যাচারী শাসক, ২. বিদআতী ও ৩. প্রকাশ্যে পাপাচারী।" (ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২২৫, ইত্যাদি) হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ে গবেষণা ও ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করা কেবল জাইযই নয় বরং দ্বীনের হিফাজতের জন্য তা ওয়াজিব। এটাই হলো উম্মতের ইজমা। এ ব্যাপারে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহার একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একব্যক্তিকে বলেছিলেন,

بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ

-"আশিরার ভাই বা পুত্র খুবই নিকৃষ্ট।" (সহীহ বুখারী : ৫৫৯৪) গীবতের কাফফারা হলো সমালোচিত ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। কোন কোন হাদীসে এরকম বর্ণনাও পাওয়া যায়, যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তরা জন্য দু'আ করা। এতে আশা করা যায় ক্ষমা পাওয়া যাবে। তালিবে মাওলাকে বান্দাগণের অধিকারের প্রতি

খুব সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহর হক্বের (হাক্কুল্লাহ) ক্ষেত্রে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তো তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

-"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?" (ইনফিতার (৮২) : ৬)

পক্ষান্তরে মানুষের হক্বের (হাক্কুল ইবাদ) ব্যাপারে ক্ষমা পাওয়া খুব কঠিন। প্রথমত বান্দার মধ্যে এই দয়া কোথায় আছে? আর দ্বিতীয়ত, তোমার গীবত তো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি বড় ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। রূহের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

-"কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে কিয়ামতের আগে যেনো সে তা পরিশোধ করে নেয়। কারণ, সেদিন তো দীনার ও দিরহাম পাওয়া যাবে না। তখন তার পূণ্য কাজ তার প্রাপককে দেওয়া হবে। আর তার যদি পূণ্য কাজ না থাকে তাহলে প্রাপকের পাপ তাকে দেওয়া হবে। এতে তার পাপের বোঝা দ্বিগুণ হবে।" (সহীহ বুখারী : ২২৭৯, মুসলিম)

চুগলখোরী করা

চুগলখোরী হলো একজনের কথা অন্যের কাছে খারাপ নিয়তে বর্ণনা করা অথবা কারো গোপন কথা প্রকাশ করা। এটা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

-"যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে।" (ক্বালাম (৬৮) : ১১)

হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

-"চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম : ১৫১, আবু দাউদ, তিরমিযি) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। বড় কোন পাপের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না, বরং একজন চুগলখোরী করে ঘুরে বেড়াতো আর অপরজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করত না।" (সহীহ বুখারী : ৫৫৯২, সহীহ মুসলিম) মাওলার পথের সালিককে অবশ্যই চুগলখোরী থেকে বেঁচে থাকতে হবে। চুগলখোরীর সর্বনিম্ন স্তর হলো দু'জন মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া অথবা দু'জনের মধ্যস্থ শত্রুতাকে আরো বৃদ্ধির চেষ্টা করা। আরবী ভাষায় এরকম ব্যক্তিকে 'যুল ওয়াজহাইন' এবং 'যুল লিসানাইন' বলে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

-"কিয়ামতের দিন তোমরা দুমুখী মানুষকেই সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অবস্থায় পাবে, যে নাকি একদল মানুষের কাছে এক রকম আর অন্যদলের নিকট আরেক রকম কথা বলতো।" (সহীহ বুখারী ; ৫৫৯৮, মুসলিম, আহমদ) আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

-"দুনিয়াতে যে মানুষ দুমুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মধ্যে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে।" (ইমাম বুখারী প্রণীত আল-আদাবুল মুফরাদ, আবু দাউদ : ৪২৩০) কোন মানুষের সামনে তার প্রশংসা করা আর তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করাও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কিরাম এটাকেও নিফাক মনে করতেন। এমনকি যালিম সরকারের কোন মন্ত্রীর সামনে তার প্রশংসা করা এবং তার পশ্চাতে তাকে যালিম বলাও সাহাবায়ে কিরামের নিকট নিফাক বলে বিবেচিত ছিলো। ইমাম বুখারী এবং ইমাম তাবারানীসহ অনেক মুহাদ্দিস হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রশংসা

প্রশংসা মূলত কোন খারাপ কাজ নয়। এ সম্পর্কে দু' ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। কুরআন শরীফে নবী-রাসূলগণের প্রশংসা করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে সিদ্দীকে আকবার রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাবাণীতে হাদীসের কিতাব ভরপুর। এতদসত্ত্বেও প্রশংসা এবং প্রশংসাকারীদের ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে নিন্দাও এসেছে। হযরত মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেনো প্রশংসাকারীর মুখে মাটি নিক্ষেপ করি।" [আহমদ : ২২৭০৭, মুসলিম] আসলে প্রশংসা যদি শরয়ী কোন ফায়দার উদ্দেশ্যে হয়, তবে এটা জাইয। কিন্তু শর্ত হলো, মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত যেনো হয় না। যদি মিথ্যা হয় তবে তা হারাম। আর অতিরঞ্জিত হলে এর প্রকার অনুসারে হুকুম আরোপিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

-"বলুন: হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না।" (মায়িদা (৫) : ৭৭)

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ

-“এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না।” (নিসা (৪) : ১৭১)

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا مدح الفاسق غضب الرب ، واهتز له العرش

-“যখন ফাসিকের প্রশংসা করা হয়, তখন মহান রব ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁর আরশ ক্ষেপে উঠে।” (বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৪৬৯২)

ঠাট্টা-মশকরা

কাউকে নিয়ে মশকরা করা, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হারাম। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

-“(হে মু’মিনগণ) কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।” (হুজুরাত (৪৯) : ১১)

মানুষকে কষ্ট দেওয়া

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

-“যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান।” (সহীহ বুখারী : ৯, মুসলিম) আবু শুরাইহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

-"আল্লাহর শপথ! মু'মিন হতে পারবে না, আল্লাহর শপথ! মু'মিন হতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! মু'মিন হতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ লোকটি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তর দিলেন যার কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (সহীহ বুখারী : ৫৫৫৭) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

-"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" (সহীহ বুখারী : ৪৭৮৭)

ঝগড়া-ফাসাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

-"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ঝগড়াটে লোকদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে।" (সহীহ বুখারী : ২৭৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ محق بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ

-"কেউ যদি নিজের হক্ব থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করে, তাহলে জান্নাতে তার জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ করা হবে।" (তিরমিযি : ১৯১৬)

গালিগালাজ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

-"মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপাচার, আর তাকে হত্যা করা কুফর।" (সহীহ বুখারী : ৪৬ ও মুসলিম)

অহেতুক কথাবার্তা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

-"অনর্থক কথাবার্তা বর্জনের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।" (সহীহ বুখারী, মিশকাত : ৪৮৩৯)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আপদসমূহ

দুই হাত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

-"যার হাত এবং জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে-ই হলো প্রকৃত মুসলমান।" (সহীহ বুখারী : ৯) সালিকের জন্য খুবই জরুরী, নিজের হাত দ্বারা যেনো অন্যকে কষ্ট না দেয়। ধর্ম ও সৃষ্টির সেবায় নিজের হাতকে কাজে লাগাবে।

"সৃষ্টির সেবা ছাড়া তরীকাত অর্জন হয় না"।

দুই পা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জালিমকে শক্তি যোগানোর জন্য তার সাথে চলে, তার ঘাড় থেকে যেনো ইসলামের লেবাস খুলে পড়লো।" (বাইহাকী :) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

-"পৃথিবীতে দম্ভভরে পাদচারণা করো না; নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না।" (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৭)

সৎকাজে বিচরণের দ্বারা প্রতিটি কাজে পুণ্য লাভ হয়। আর অসৎ কাজে চলাফেরা করলে, শাস্তি অবধারিত। কিয়ামতের দিন মানুষের পা-যুগল সাক্ষ্য প্রদান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

-“পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর।” (লুক্বমান (৩১) : ১৯)

কর্ণ ও চক্ষু: আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

-“আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।” (ইয়াসীন (৩৬) : ১২)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

-“আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।” (ইয়াসীন (৩৬) : ৬৫)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

-“নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।” (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬)

যৌন চাহিদা

সাধারণের ভাষায় লজ্জাস্থানের চাহিদাই হল আসল প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি পূরণে কোন প্রকার কৃচ্ছতা কিংবা সীমালঙ্ঘনের পথ না খুঁজে মধ্যপন্থা অবলম্বনই হল ইসলামের নির্দেশনা। সমাজ ও জাতির কল্যাণ মূলত: এই মধ্যপন্থার মধ্যেই নিহিত। বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় গ্রন্থাদিতে আছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এটুকু বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বীর্য হল মানব সম্প্রদায় টিকে রাখার প্রধান মাধ্যম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

-“অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর।” (বাক্বারাহ (২) : ১৮৭)

আর এ উদ্দেশ্য সাধনে ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যা হল বীর্যপাতের একমাত্র স্বীকৃত পথ। এছাড়া যৌন চাহিদা পূরণের অন্যান্য যত পথ আছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত যত পথের উদ্ভাবন হবে সবই অবৈধ। এরূপ অবৈধ কোন পথের

পথিক ইসলামের ভাষায় মানব সমাজের উপর অত্যাচারী সীমালংঘনকারী আখ্যায়িত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

-"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।" (মু'মিনূন (২৩) : ৫-৭)

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ অপচয়ের চেয়েও জঘন্য হল অবাধ যৌনাচার। অর্থ সম্পদ হল জীবিকা রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا

-"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না।" (নিসা (৪) : ৫)

যারা অবাধ যৌনাচারী তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون

-"তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।" (মু'মিনূন (২৩) : ৭)

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

-"তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।" (আরাফ (৭) : ৮১)

মানবজাতি টিকে থাকা বা সম্প্রসারণের একমাত্র মাধ্যমই হল বীর্য। তাই বীর্যপাতের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহারসহ সব প্রাসংগিক বিষয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ফিকহ্ ও হাদিসের গ্রন্থাদিতে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনা এসেছে। ব্যভিচার ও সমকামিতার শাস্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে।

তালিবে মওলানার জন্য জরুরী হলো, নফসকে সকলপ্রকার বীর্যসম্পর্কিত অপচয় থেকে নিয়ন্ত্রণ ও বাঁচিয়ে রাখা। যৌনক্ষুধা জাইয উপায়ে মেঠানো তথা নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাস করতে হবে। যৌন চাহিদা পূরণে অন্তরে মহৎ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য লাভের কামনা করতে হবে। আর সংক্ষেপে এর উদ্দেশ্য বলা যায়, ১- মানব সম্প্রদায়ের স্থিতি ও সম্প্রসারণ, ২- মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ৩- সৎ সন্তান লাভ, যে নাকি অস্ত্র, ভাষা ও কলম দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এরকম সৌভাগ্যবান হিসাবে কবুল করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এই নিয়ামত দান করুন।

হযরত আবু হুরাইরাহ রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

-"জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা সৎ বান্দাদের দরজা বুলন্দ করে দেবেন। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে এ মর্যাদা পেলাম? আল্লাহ বলবেন, সন্তান তোমার জন্য যে মাগফিরাত কামনা করেছে, এটা হলো তারই বিনিময়।" (আহমদ : ১০২০২) শরীয়তবর্ণিত নির্দেশনা ছাড়া অন্য রাস্তায় যৌন চাহিদা পূরণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

-"কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময় মু'মিন থাকে না।" (বুখারী : ২২৯৫)

তাহলিয়া তথা অলঙ্করণ অধ্যায়

পূর্বে বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছিল, পবিত্রতা হলো ঈমানের অঙ্গ। ইসলামের একাংশ হলো পবিত্রতা। আর অপরাংশ হলো অলঙ্করণ। তাযকিয়া সম্পর্কে ইতোমধ্যে সবিস্তর আলোচনা হয়েছে। এখন তাহলিয়ার উপর একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাযকিয়ার সূচনা হয় বাহ্যিক পবিত্রতার দ্বারা। আর গাইরুল্লাহ থেকে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করাই হলো এর চূড়ান্ত স্তর। ঠিক তদ্রূপ তাহলিয়ার সূচনা হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' থেকে আর শেষ স্তর হলো ঈমানে তাহক্বিকী এবং মাহবুবে হাক্বিকীর প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভ। সূচনা এবং শেষের মধ্যে সমস্ত আক্বীদা, সৎকর্ম এবং উচ্চ স্তরসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। সঠিক আক্বীদার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নাতে জামাআতের আক্বীদা। এ সম্পর্কে শত-সহস্র পুস্তকাদি লিখা হয়েছে। তাই এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এর আলোচনা নি®প্রয়োজন। তবে সালিকের কাছে এতটুকু নিবেদন, সে যেনো প্রথমেই নিজের আক্বীদাকে সুন্নাত জামাআতের আক্বীদা মুতাবিক গড়ে তুলে। এরপর ফিকাহর কিতাব অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের বাহ্যিক কাজকর্মের সংশোধন করে নেয়। এজন্য চার মাযহাবের কোন একটিকে যেনো সে অনুসরণ করে। নিজেকে মুজতাহিদ মনে করবে না। আর আজকাল তো কারো মধ্যে ইজতিহাদের শর্ত-শারাইত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলে, চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করেও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করা যাবে। আর এরকম যোগ্যতার অধিকারী না হলে, প্রতিটি কাজ-কর্মে কোন দ্বীনদার আলিমের দ্বারস্থ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون

-"অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (নাহল (১৬) : ৪৩)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

-"অক্ষমতা সমস্যার সমাধান হলো প্রশ্ন করা।" (আবু দাউদ) সহীহ আক্বীদা এবং নেক কাজের উপর অটল থাকলে, হৃদয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বা

কাইফিয়্যাত সৃষ্টি হয়। এই কাইফিয়্যাত দ্বারাই মূলত দায়িমী তাজাল্লি ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে পৌঁছা যায়। এই শাস্ত্রের আলিমদের মতে এগুলোই হলো আহওয়াল ও মাক্বামাত। অত্র গ্রন্থে এই আহওয়াল ও মাক্বামাত নিয়েই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে।

হাল ও মাক্বামের সংজ্ঞায় উলামায়ে কিরামের অনেক অভিমত আছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোকপাত সম্ভব নয়। তবে প্রসিদ্ধ ক'টি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে।

আল-ইমামুল হুমাম আবু তালিব মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত গ্রন্থ 'কুতুল কুলুব' (হৃদয়ের খোরাক) এর মধ্যে বলেন:

أصل مقامات المتقين التي ترد إليها فروع أحوال اليقين وهي تسعة: أوّلها التوبة ثم الصبر ثم الشكر ثم الرجاء ثم الخوف ثم الزهد ثم التوكل ثم الرضا ثم المحبة

-"ইয়াক্বীনের মূল স্তর হলো ৯টি। আর এগুলোই মূলত মুত্তাকী লোকের আহওয়ালের মূল ভিত্তি। ১. তাওবাহ, ২. সবর, ৩. শুকর, ৪. রাজা (আশা-আকাক্সক্ষা), ৫. খাওফ (ভয়), ৬. যুহদ (পার্থিব মোহ ত্যাগ), ৭. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা), ৮. রিযা (সন্তুষ্টি) এবং ৯. মুহাব্বাত"। অধমের মতে, এই তালিকার সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোও যুক্ত করা জরুরী।

১০. উনস (প্রশান্তি), ১১. ইখলাস (নিষ্ঠা), ১২. সিদ্বক্ব (সত্যবাদিতা), ১৩. 'উবুদিয়াত (উপাসনা), ১৪. মুশাহাদা (প্রত্যক্ষদর্শন) এবং ১৫. তাওহীদ। ইলমে তাসাওউফের মধ্যে এই পনেরটি মাক্বামাত নিয়ে আলোচনা হয়। এসব বিষয়ের শুরুর ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও তাদের গন্তব্যস্থল একই। আর এগুলো মূলত তাওহীদে বিভিন্ন কাইফিয়্যাতের কারণে হয়ে থাকে।

"একক সত্তাকে দেখি, একক সত্তার সাথে কথা বলি আর অনুসন্ধান করি সেই একক সত্তাকেই।"

তাওবাহ অধ্যায়

তাওবাহ অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। এটা যদি মানুষের বিশেষণ হয় তাহলে এর অর্থ হবে, নিজের কৃত পাপের উপর লজ্জিত হয়ে মাওলার নিকট ফিরে যাওয়া, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে আর পাপ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করা। আর যখন তা আল্লাহর বিশেষণ হবে তখন এর অর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর করুণা বান্দার দিকে ধাবিত করে দিলেন এবং স্বীয় ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

তাওবার প্রকার

তাওবার অনেক প্রকার আছে। ১. পাপ থেকে তাওবাহ। ২. সৎকাজ সম্পাদনে যে অক্ষমতা ও উদাসীনতা হয় তা থেকে তাওবাহ করা। ৩. প্রভুর সামনে শিষ্টাচারিতা পালনে যে শিথিলতা হয় তা থেকে তাওবাহ করা। ৪. গাইরুল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া থেকে তাওবাহ করা। ৫. গাইরুল্লাহর অনিষ্ট থেকে তাওবাহ করা। ৬. মাহবুবের মুশাহাদায় ডুবে থাকতে যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয় তা থেকে তাওবাহ করা, অর্থাৎ মাহবুবের শান অনুযায়ী তাঁর জালাল ও জামালের মুশাহাদার মধ্যে ডুবে থাকতে যে অযোগ্যতার সৃষ্টি হয়, তা থেকে তাওবাহ করা। আর এটাই ছিলো সাইয়্যিদুল মুরসালীন এবং অন্যান্য উলুল আজম আম্বিয়ায়ে কিরামের তাওবাহ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাওবাহকে 'গ্বাইনে ক্বালব' (غين قلب) আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

-"আমার ক্বালবে আচ্ছন্ন পড়ে যায়, আমি প্রত্যহ ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (সহীহ মুসলিম : ৪৮৭০) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাওবাহ থেকে মাক্বামাত শুরু হয় আর তা দিয়েই এর শেষ। হাফিজ ইবনে ক্বাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মাক্বামাতের প্রথম মধ্যম এবং শেষ স্তরই হলো তাওবাহ"। তাই জীবনের অন্তিম সময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক হারে ইস্তিগ্বফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

-"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" (নাসর (১১০ : ১-৩)

তাওবাহ ও ইস্তিগ্বফার মূলত পৃথক ইবাদাত এবং তা জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। সূরায়ে নাসরের তাওবাহ দ্বারা মূলত শেষ তাওবাহই উদ্দেশ্য। দ্বীনের তাবলীগের কারণে মাহবুবের মধ্যে ডুবে থাকতে যে স্বল্পতা হয়েছে, তার জন্যই মূলত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওবাহর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা মর্ম এটাও হতে পারে, আপনি ইস্তিগ্বফার করতে থাকুন, কারণ, ইস্তিগ্বফার হলো উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাত। ইস্তিগ্বফার হলো দু'আর একটি অংশ আর দু'আ হলো সর্বোচ্চ ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

-"দু'আ ইবাদাতের মগজ।" (তিরমিযি : ৩২৯৩) তাই বলা হয়েছে, আপনি ইস্তিগ্বফার করতে থাকুন, যাতে উত্তম ইবাদাতের মধ্যে থাকাবস্থায় যেনো মাওলার সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে। সহীহ বুখারীতে আছে, এই দু'আর মাধ্যমেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায়-গ্রহণ করেন,

اللهُ مَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الاعلى

-"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো! এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমার মিলন ঘটাও।" (সহীহ বুখারী : ৪০৪৬)

"আল্লাহর দরবারে বান্দার জন্য তার ভুল-ত্রূটি স্বীকার করাই কল্যাণকর। ভুল-ত্রুটি অস্বীকার করে কেউ আল্লাহর দরবারে আসার উপযুক্ত হবে না।"

তাওবাহর চারটি ভিত্তি: ১. ইলম: অর্থাৎ একথা মনে করা যে পাপ হলো ধ্বংসাত্মক বিষ। মাওলা এবং বান্দার মধ্যকার একটি অন্তরায়। ২. নাদাম বা অনুতপ্ত: গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর মাওলার সামনে অনুতপ্ত হওয়া। ক্রন্দন করতে থাকা। এমনভাবে হায়-হুতাশ করা যেনো পর্দা সরে পড়ার নির্দেশ এসে যায়।

আসলে অনুতপ্ত হওয়াই হলো তাওবাহর হাক্বিকাত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

النَّدَمُ تَوْبَةٌ

-“অনুতপ্ত হওয়াই হলো তাওবাহ।” (ইবনে হিব্বান, হাকিম, তাইয়ালাসি) এ সম্পর্কিত আরো অনেক হাদীস আছে। আর এ জন্যই হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসকে হাসান বলেছেন। আর অন্যান্য আলিম এটাকে সহীহ বলেছেন। ৩. তরক তথা পাপ ত্যাগ করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা: অর্থাৎ বর্তমানে পাপ ছেড়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। ৪. তালাফী বা অতীতকে শোধরে নেওয়া: অর্থাৎ গুনাহ্র কারণে হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে যেসব ত্রূটি হয়েছে তা শোধরে নেওয়া। যেমন সালাত ও সিয়াম পালন না করলে তা কাযা করতে হবে। যদি কারো মাল চুরি কিংবা আত্মসাৎ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা মালিকের নিকট ফেরৎ দিতে হবে। সারকথা, তাওবাহ হলো এই চারটি বিষয় তথা, ইলম, নাদাম, তরক এবং তালাফির সমন্বিত রূপ। তাওবার পরিপূর্ণতা লাভ হয় মুখের ইস্তিগ্ফার এবং অন্তরের হুজুরী ও অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে। ইস্তিগ্ফারের আগে দু’ রাকাআত নামায পড়ে নেওয়া উত্তম।

পাপাচার বর্জনের তাওবাহ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো পাপ থেকে তাওবাহ করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

-“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা’আলার কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবাহ।” (তাহরিম (৬৬) : ৮)

আলোচ্য আয়াতে নাসুহ শব্দের অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে অন্য কিছুর মিশ্রণ ছাড়া তাওবাহ করা। অন্য আয়াতে আছে,

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

-“যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালিম।” (হুজুরাত (৪৯) : ১১)

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-“মু’মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (নূর (২৪) : ৩১)

আগার মুযানী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

-“হে লোকজন! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো। কারণ আমি প্রতিদিন এক শতবার তাওবাহ করি।” (সহীহ মুসলিম : ৪৮৭১, তাইয়ালাসি, আহমদ এবং আবদ ইবনে হুমায়িদ)

নিজের অক্ষমতা থেকে তাওবাহ

এর অর্থ হলো বান্দা নিজের অক্ষমতা ও নিঃস্বতার বাস্তবতা উপলব্ধি করবে। তার কোন ইবাদাতই মাওলার দরবারে গ্রহণ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এই অনুভূতি নিয়ে অধিক হারে ইবাদাত করা সত্ত্বেও মুখের মধ্যে তাওবাহ ও ইস্তিগ্ফার জারি রাখা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

-“এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।” (মু’মিনূন (২৩) : ৬০-৬১)

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, উল্লেখিত আয়াতে সৎ লোক না অসৎ লোকের উপর আলোচনা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন, “সৎ লোকদের উপর আলোচনা করা হয়েছে, যারা নাকি সৎ কাজ করেও প্রতারিত হয়

না। বরং আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে কি না, এই আশঙ্কায় তারা ভয় করতেই থাকে।” (তিরমিযি)

প্রভুর দরবারে শিষ্টাচারিতা পালনে যে উদাসীনতা হয় তা থেকে তাওবাহ

এ তাওবাহর দ্বারাই মূলত বিশেষ লোকদের যাত্রা শুরু হয়। তাদের জন্য এই তাওবাহ ওয়াজিব। সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এতেকরে তাদের সাধারণ জীবন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হবে। উপরোল্লিখিত তাওবাহর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার এই তাওবাহর অন্তর্ভুক্ত। এর সূচনা হয় মাওলা থেকে যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয় তা থেকে তাওবাহর মাধ্যমে। আর মুশাহাদার ক্ষেত্রে যে অক্ষমতা প্রকাশ পায় তা থেকে তাওবাহ করার মাধ্যমেই এর সমাপ্তি ঘটে। বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোচনা করা যাচ্ছে।

১. প্রত্যেক রাষ্ট্রে সাধারণ জনগণের জন্য কিছু আইন-কানুন থাকে। এসব মেনে চললে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের উপর কোন ধরপাকড় আসে না। কিন্তু রাজ দরবারে যে বিশেষ লোকজন থাকে, তাদের জন্য বিশেষ কিছু আইন-কানুন থাকে- যা তাদের জন্য মেনে চলা খুবই জরুরী। অন্যথায় শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ শাস্তির প্রারম্ভ হয় দরবার থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে আর যবনিকা হয় মৃত্যুদ- দ্বারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেও সাধারণ মানুষের জন্য কিছু সাধারণ আইন-কানুন আছে, এগুলো মেনে নিলে তাঁর পক্ষ থেকে কোন পাকড়াও আসে না। আর তাঁর মুশাহাদা লাভের অন্বেষী কিছু বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন-কানুন আছে। এগুলো তাদেরকে মেনে চলতে হবে। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন, লাতীফ ও খাবীর। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর থেকে উদাসীন হওয়া, গাইরুল্লাহর দিকে দৃষ্টি দেওয়া অথবা তাঁর প্রতি মনোনিবেশের মাধ্যমে ডুবে যেতে উচ্চস্তরে না পৌঁছা ইত্যাদি বিষয় মূলত রাজ দরবারের শিষ্টাচার। কেউ যদি তা লঙ্ঘন করে, সে হয় তো দরবারে ইলাহী থেকে বহি®কৃত হবে অথবা অন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে পারে। আম্বিয়ায়ে কিরামের ভুল-ভ্রান্তি মূলত এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এই উম্মাতের আউলিয়ায়ে কিরামের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

-"নবীগণই সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এরপরে তাঁদের নিকটবর্তী লোকজন, অতঃপর তাঁদের নিকটস্থ লোকজন।" (সুনানে তিরমিযি)

"এ মালিকের স্মরণ থেকে এক মুহূর্তও গাফিল থাকা যাবে না। কখন যে তিনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তা তোমার জানা নেই।"

"হুজুরী অর্জন হয় যদি তোমার বাসনা, তবে তার সামন থেকে অদৃশ্য হয়ো না। সাক্ষাৎ হবে যখন মাহবুবের, সরিয়ে দাও মায়াজাল এ জগতের।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

-"আর স§রণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়, আর বে-খবর থেকো না।" (আরাফ (৭) : ২০৫)

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

-"তারাই হল গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আ'রাফ (৭) : ১৭৯ ও নাহল (১৬) : ১০৯)

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

-"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহকে স্মরণ করতেন।" (সহীহ মুসলিম : ৫৫৮) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের তাবলীগের জন্য আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

-“হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না; আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (মায়িদা (৫) : ৬৭)

এজন্য তিনি অধিকাংশ সময় দ্বীনের তাবলীগে ব্যস্ত থাকতেন। তাবলীগ যদিও উচ্চস্তরের একটি ইবাদাত, কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা সৃষ্টির সাথে মুবাল্লিগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাই আল্লাহর জামাল ও জালালে ডুবে থাকতে কিছুটা শিথিলতা আসে। আর এই শিথিলতাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে একটি (অনিচ্ছাকৃত) গাফিলতি। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওবাহ ও ইস্তিগ্‌ফার করতেন। এই শিথিলতাকেই হাদীসের মধ্যে গ্বাইনে ক্বালব (ময়লাযুক্ত হৃদয়) দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে:

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

-“আমার ক্বালবে আচ্ছন্ন পড়ে যায়, আমি প্রত্যহ ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।” (সহীহ মুসলিম : ৪৮৭০) এটাই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাওবাহ-ইস্তিগ্‌ফারের কারণ। আর আমাদের জন্য এটা উচ্চ পর্যায়ের একটি ইবাদাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিঞ্জার পর যে ইস্তিগ্‌ফার করতেন, তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইস্তিঞ্জার সময় মাহবুবের মুশাহাদায় ডুবে থাকা তাঁর শানের খিলাফ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সগীরা ও কবীরা এই উভয় প্রকার গুনাহ থেকে মা’ছুম। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে, ‘ফিকহে আকবর’ এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

বুজুর্গানে দ্বীনের একটি কথা হলো, “সৎ বান্দাদের নেক কাজসমূহ নৈকট্য প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে পাপ বিবেচিত হয়”। কুরআন শরীফে যেখানেই কোন নবীর ভুল-ভ্রান্তির আলোচনা হয়েছে, তা মূলত উল্লেখিত বিষয়াদির আওতাভুক্ত। কিন্তু কিছু কিছু ‘গল্পবাজ’ মুফাস্সীর এসব ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা মূলত তত্ত্ববিদদের নিকট উদ্ভট ও ভ্রান্ত বলে বিবেচিত। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো, নবীর নুবুওয়াতের স্তর বড় না বিলায়াতের স্তর বড়? অধমের মতে বিষয়টি মূলত শাব্দিক বিতর্ক। কারণ, শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় মাহবুবের মুশাহাদায় ডুবে থাকা, তবে তো বিলায়াতের দরজাই উত্তম। আর আল্লাহর নৈকট্যের স্তরের

দিকে লক্ষ্য করলে বলতে হবে নুবুওয়াতের স্তরই উত্তম। এই আপেক্ষিক আলোচনা মূলত একজন নবীর ক্ষেত্রে হতে পারে, কোন ওলির ক্ষেত্রে নয়। কেননা, যিনি নবী নন কেবল ওলি, নবীর সাথে তাঁর তুলনাই হতে পারে না। এরকম তুলনাকারী ব্যক্তি কাফির সাব্যস্ত হবে।

তাওবাহর ফজিলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

-"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (যুমার (৩৯) : ৫৩)

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" (বাক্বারাহ (২) : ২২২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ

-"আল্লাহ বান্দার তাওবাহর দ্বারা ঐ লোকটি থেকেও বেশী খুশী হন, যে তার সওয়ারী নিয়ে এক স্থানে অবতরণ করলো, সাথে তার খানাপিনাও আছে। সে মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু যখন সে জেগে উঠলো তখন দেখে যে,

তার সওয়ারী (উট) চলে গেছে। সে তখন এর অনুসন্ধান করতে লাগলো। গরম ও পিপাসা যখন বেড়ে গেলো সে বললো, আমি আমার পূর্বের জায়গায় ফিরে গিয়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়বো। সে সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এবার জেগে উঠে দেখতে পেলো, সওয়ারী ও খানাপিনা তার পাশেই আছে। এই লোকটি তার সওয়ারী ফেরৎ পেয়ে যেটুকু আনন্দ পেলো- বান্দাহ যখন তাওবাহ করে আল্লাহ তা'আলা এরচেয়েও বেশী খুশী হন।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আহমদ) অনুরূপ হাদীস হযরত আনাস, হযরত আবু হুরাইরাহ এবং আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

-"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপ না করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিঃশেষ করে দিবেন। তোমাদের পরিবর্তে এমন এক কওম সৃষ্টি করবেন, যারা পাপ করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।" (সহীহ মুসলিম : ৪৯৩৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ

-"অনুনয়-বিনয় ও ওজর পেশ একমাত্র আল্লাহর কাছেই অত্যন্ত পছন্দনীয়। আর এ জন্যই তিনি কিতাব অবতীর্ণ ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম : ৪৯৫৮) হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ:"عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وشَجَرٍ، وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً، السِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ

-"হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন? তিনি বললেন, সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষের কাছে আল্লাহকে স্মরণ করো। যদি

কোন অপকর্ম করো, তাহলে তাওবাহ করে নাও। গোপন পাপের ক্ষেত্রে গোপন তাওবাহ আর প্রকাশ্য পাপের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য তাওবাহ।” (তাবারানী : ১৬৭৪৫) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }

-“বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যখন তাওবাহ ও কান্নাকাটি করে এবং ক্ষমা চায় তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি পাপ আরো বেশী করে তখন সেই কালো দাগটি আরো বেড়ে যায়। শেষ পর্যায়ে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা’আলা এই পর্দাকেই ‘আর-রান’ বলেছেন - { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }।” (তিরমিযি : ৩২৫৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকীম ইত্যাদি) হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ

-“নিশ্চয় তাওবাহ অবলম্বনকারী পাপাচার মু’মিনকে আল্লাহ তা’আলা ভালোবাসেন।” (আহমদ : ৫৭১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال ، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم

-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা দুনিয়াবাসীদের দু’আ কবরবাসীদের নিকট পাহাড়সম উঁচু বানিয়ে প্রেরণ করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে উপহার হলো তাদের জন্য ইস্তিগ্বফার করা।” (শুয়াবুল ঈমান : ৭৬৬৬) হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

-"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদমসন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকো এবং আমার প্রত্যাশা করো, আমি তোমার দ্বারা সংঘটিত পাপ ক্ষমা করতে থাকি। এতে আমি কোন পরওয়া করি না। হে আদমসন্তান! তুমি যদি এই পৃথিবী পাপ দ্বারা ভর্তি করে দাও, আর শিরক না করেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তবে আমি সমপরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমার কাছে আসবো।" (সুনানে তিরমিযি : ৩৪৬৩, আহমদ - আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

-"সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো, তুমি এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার দাস। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞার উপর ঠিকে আছি। আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে যে করুণা প্রদান করেছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার পাপেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারবে না।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিন অবস্থায় কেউ যদি দিনের বেলা এই দু'আটি পড়ে এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতবাসী। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা মু'মিন অবস্থায় এই দু'আটি পড়বে এবং প্রভাতের

আগেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে-ও জান্নাতী।” (সহীহ বুখারী : ৫৮৩১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

-“যে ব্যক্তি ইস্তিগ্‌ফারকে আবশ্যক করে নিল, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির পথ বের করে দেবেন। উদ্বিগ্নতা থেকে প্রশস্ততার রাস্তা খুলে দেবেন। তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দেবেন যার কল্পনাই সে করতে পারে না।” (আহমদ : ৩৮০৯, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

-“আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, তাঁর দরবারে তাওবাহ করি।” (সহীহ বুখারী : ৫৮৩২)

টীকা: হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, পাপ ছেড়ে দেওয়া হলো সাধারণ লোকদের তাওবাহ। আর বিশেষ লোকদের তাওবাহ হলো উদাসীনতা বর্জন করা। হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে তাওবাহ করাই হলো আসল তাওবাহ। একজন আ’রিফ বলেছেন, সাধারণ লোক তো তাওবাহ করে তাদের পাপ থেকে আর সুফীরা তাওবাহ করেন, তাদের নেক কাজ থেকে। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা’আলার মুশাহাদার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারিতা পালনে যে অভাব হয় তা থেকে তাওবাহ। আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সুফী আল্লাহর মুশাহাদার হাক্বিকাত যখন উপলব্ধি করেন তখন এ ক্ষেত্রে যে ভুল-ভ্রান্তি হয় তা থেকে তিনি তাওবাহর মাধ্যমে ইস্তিগ্‌ফার করেন। কারণ, সুফীর মাক্বাম বা স্তর কেবল বাড়তেই থাকে। তাঁর প্রত্যেকটি মাক্বাম, হাল, মুশাহাদা ও মুকাশাফার জন্য একেকটি তাওবাহ।

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওবাহ অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই গভীর সমুদ্র থেকে এখানে কেবল একটি ফোটার

অবতারণা করছি। তিনি বলেন, তাওবাহই হলো প্রথম ও মধ্যম স্তর এবং তাওবাহই হলো শেষ স্তর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরাতুন নসর নাজিল হওয়ার পর, তিনি প্রত্যেক নামাযের মধ্যে বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللهُ مَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُ مَّ اغْفِرْ لِي

"হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আপনার পবিত্রতা এবং প্রশংসার গুণগান করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।" (সহীহ বুখারী : ৭৫২) সালিকের পথে শয়তানের পক্ষ থেকে ৭টি বাঁধা আসে: ১. কুফর, ২. বিদআত, ৩. কবীরা গুনাহ, ৪. সগীরা গুনাহ, ৫. বৈধ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যা আখিরাতের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়, ৬. যে কাজ অগ্রগণ্য নয় তাতে লিপ্ত রেখে আসল অগ্রগণ্য কাজ থেকে বিরত রাখা এবং ৭. কল্যাণের পথে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, হাত ও যবান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। সালিক যতই অগ্রসর হবে, শয়তান তার দলবল নিয়ে ততোই বেশী আক্রমণ চালাবে। যে যতো বেশী অটল থাকার চেষ্টা করবে, শত্রুর আক্রমণ ততো বেশী তীব্র হবে। সে আল্লাহর জন্য আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটাই হলো, বিশেষ আরিফদের স্তর। যাকে আরবীতে বলে 'উবুদিয়াতুল মুরাগ্বামা' (সংগ্রাম সাধনা)। একমাত্র চক্ষুষ্মানরাই তা উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহর শত্রুর সাথে তাঁর ওলির যে সংগ্রাম হয়, তা তিনি খুব পছন্দ করেন।

ইবনে আলিমের (অর্থাৎ আলীমের পুত্র হযরত মুশাহিদ সাহেব - অনুবাদক) ভাষ্য হলো, আল্লাহ তাঁর অলিদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও অটল অবিচলতার মুহূর্তে তাদের শত্রুর মুকাবিলায় গোপন করুণা দিয়ে সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

-"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে

আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।” (বাক্বারাহ (২) : ২১৪)

حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

-“এমনকি যখন পয়গম¡রগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে; অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।” (ইউসুফ (১২) : ১১০)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

-“আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মু’মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।” (মু’মিন (৪০) : ৫১)

আল্লাহর সাহায্য গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। কোন সময় কেবল গোপনেই হয়। যেমন, আল্লাহ তা’আলা দুর্ভাগা ইয়াযীদের মুকাবিলায় (আল্লাহর হাতেই তার ফায়সালা) সায়্যিদুনা হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে যে সাহায্য করেছিলেন, তা মূলত গোপন ছিল। হে আল্লাহ! হে পরাক্রমশালী! হে মহাবিজ্ঞানী! তুমি আমাদেরকে ইহ-পরকালীন জীবনে শত্রুর মুকাবিলায় গোপনে ও প্রকাশ্যে পরিপূর্ণ সাহায্য করো। আ-মিন।

মুহাব্বাত অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন; আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (ইমরান (৩) : ৩১)

فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

-"অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন; আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মায়িদা (৫) : ৫৪)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

-"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।" (বাক্বারাহ (২) : ১৬৫)

মুহাব্বাত হলো সুলুকের সমস্ত মাক্বামের আত্মা। এর জ্ঞান ছাড়া সুলুকের কোন মাক্বাম ও হাল কোন উপকারে আসবে না। এজন্য তাওবাহর পরই এর আলোচনা যুৎসই। মাদারিজুস সালিকীনের তৃতীয় খণ্ডে ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ের উপর 'কাবির', 'আওসাত' এবং 'সগীর' নামে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। মাহবুবে আজমের

আশিকদের জন্য এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন অত্যন্ত উপকারী। এখানে আলোচনাটি উক্ত বুজুর্গের ভাষ্য দিয়েই শুরু করছি।

তিনি বলেন, মুহাব্বাত এমন একটি স্তর যার জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে। নিশান পর্যন্ত পৌঁছতে দৌড়াতে থাকে। যার উপর প্রেমিকরা জীবন নিঃশেষ করে দেয়। যার বায়ুপ্রবাহে ইবাদতকারীরা চলতে থাকে। মুহাব্বাত তো হৃদয়ের খোরাক এবং চোখের শীতলতা, এটা একটি জীবন, এ থেকে বঞ্চিত হলে মৃত গণ্য হবে। এটি একটি নূর, এটা হারিয়ে গেলে অন্ধকার সাগরে ডুবে যাবে। এটা হলো ঈমান, আমল, মাক্বামা ও হালের আত্মা। যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে প্রচুর চেষ্টা লাগে, সে-ই পথিকদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। সত্যপথে পৌঁছতে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি এই মুহাব্বাতই দূর করে দেয়। এটা সেই কওমের সওয়ারী, যার উপর আরোহণ করে তারা হাবীবের বাড়িতে যাত্রা করে। আল্লাহর কসম! মুহাব্বাতের অধিকারী লোক তো ইহ-পরকালে সম্মান অর্জন করে নিল। প্রেমিকের সান্নিধ্যই হলো তাদের জন্য পরিপূর্ণ সৌভাগ্য। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার দ্বারা ফায়সালা করে দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন একজন মানুষ যাকে সে বেশী ভালোবাসতো তার সাথেই সে পুনরুত্থিত হবে।

রব্বের সাথে বান্দার যে মুহাব্বাত হয় এবং বান্দার সাথে রব্বের যে মুহাব্বাত হয়, তার উপর যৌক্তিক, প্রাকৃতিক এবং নকলী অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। আমরা আমাদের 'কাবির' গ্রন্থে প্রায় একশটির মতো প্রমাণের বর্ণনা দিয়েছি।

অতঃপর হযরত (ইবনে কাইয়্যিম) লম্বা করে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

-"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল- বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।" (আন'আম (৬) : ৫২)

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

-"কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" (দাহর (৭৬) : ৯)

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى

-“এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না।” (লাইল (৯২) : ১৯)

এসব আয়াতের মধ্যে নেক বান্দাদের শেষ সৌভাগ্যের কথা বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা’আলার পবিত্র মুখমণ্ডল দেখার ইচ্ছা করে। আর এই দেখার অর্থ হলো, পরকালে স্বাদ ও ভালোবাসার সাথে তাঁকে দেখা। মুস্তাদারাকে হাকীম এবং সহীহ ইবনে হিব্বানে দীর্ঘ একটি মারফু হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وأسألك النظر إلى لذة وجهك ، وأسألك الشوق إلى لقائك

-“হে আল্লাহ! আমি আপনার চেহারার দিকে প্রেমময় নয়নে দৃষ্টিপাতের প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং আপনার সাক্ষাৎ লাভের তীব্র আকাক্সক্ষা পেশ করছি”। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

-“যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে সে ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করবে: ১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রেমময় হবেন, ২. সে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং ৩. আল্লাহ যখন তাকে কুফর থেকে মুক্ত করেন তখন এর দিকে আবার ফিরে যাওয়া তার জন্য এতো কষ্টকর, যেমন নাকি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ হওয়া।” (সহীহ বুখারী : ১৫) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

- "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার ওলির সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি বান্দার উপর যেসব কাজ ফরয করেছি, এর চেয়ে আর ভালোবাসাপূর্ণ কোন কাজ নেই যা দিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয়। বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। পরিণামে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কর্ণে পরিণত হই যার দ্বারা সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে তা প্রদান করি আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।" (সহীহ বুখারী : ৬০২১)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ

-"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মুহাব্বাত করেন তখন জিব্রাঈল আলাইহিসসালামকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাকে ভালোবাসেন এবং আকাশে ঘোষণা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাঁকে ভালোবাসো। তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জমিনে তার গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।" (সহীহ বুখারী : ৬৯৩১, মুসলিম)

টীকা: উক্ত হাদীসে 'গ্রহণযোগ্যতা' দ্বারা অর্থ হলো, সে নেক ও মুত্তাকীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। পাপাচার ও বিদআতী লোক তো তার উল্টো হবে। ঐ নেক বান্দা ও পাচাপারদের মধ্যে তো যুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

-"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" (বাক্বারাহ (২) : ২১৪)

হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ

-"একটি অভিযানের সময় জনৈক ব্যক্তি প্রতিটি নামাযের মধ্যে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি বলেন, আমি এজন্যই এটা বলি যে, এই সূরার মধ্যে পরম করুণাময়ের গুণগান এসেছে- আর এজন্যই এটা তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বললেন, "তোমরা তাকে সংবাদ দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালোবাসেন।" (সহীহ বুখারী : ৬৮২৭, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

-"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ভালোবাসা দান করো। আর তোমার কাছে যে লোকের ভালোবাসা আমার জন্য উপকারী হবে তার ভালোবাসাও দান করো। হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসা আমার নফস, পরিবার পরিজন এবং শীতল পানির

ভালোবাসা থেকেও বেশী করে দাও।” (তিরমিযি : ৩৪১২) আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন এর বর্ণনায় কুরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

-“আর আল্লাহ সবরকারীদের ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ১৪৬)

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

-“আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ১৩৪)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।” (বাক্বারাহ (২) : ২২২)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

-“আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর।” (সাফ (৬১) : ৪)

اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ

-“অবশ্যই আল্লাহ পরহেযগারদেরকে ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ৭৬)”

এরপর হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, “মুহাব্বাত হলো প্রতিটি মাক্বাম, স্তর ও আমলের রূহ। ইখলাসের মতো এটাও আমলের সাথে সম্পর্কিত। বরং মুহাব্বাতই হলো ইখলাস ও ইসলামের হাক্বিকাত। যার মধ্যে মুহাব্বাত নেই তার মধ্যে তো ইসলামই নেই। ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’, এই সাক্ষ্যের মর্মকথাই হলো মুহাব্বাত। কারণ, ‘ইলাহ’ তাকেই বলা হয় যাকে প্রেম-ভালোবাসা, অনুনয়-বিনয় এবং শ্রদ্ধার সাথে উপাসনা করা হয়। অর্থাৎ উপাস্য সত্তার সাথে হৃদয়ের প্রেমময় সম্পর্ক থাকে।”

সারকথা হলো, কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, ঈমান, ইহসান এবং ইসলামের রূহ হচ্ছে মুহাব্বাত। মুহাব্বাত উভয় দিক থেকে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন হবে তেমনি বান্দার পক্ষ থেকেও হবে। তাই কোন মু'মিনই মুহাব্বাতশূন্য

নয়। হ্যাঁ, আম্বিয়ায়ে কিরামের পর আউলিয়ায়ে কিরামই হলেন মুহাব্বাতের পরিপূর্ণ মাক্বামের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম হলেন প্রথম কাতারের সৈনিক। রণাঙ্গনে তাঁরা মাহবুবের নামে নিজেদেরকে কুরবান করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাসে বিরল। ইসলাম গ্রহণের পরই তাঁরা তাঁদের জান-মাল মাহবুবের নিকট বিক্রি কয়ে দিয়েছিলেন। এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল, আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে; আর এ হল মহান সাফল্য।" (তাওবাহ (৯) : ১১১)

বান্দার সাথে আল্লাহর মুহাব্বাতের মর্ম কি?

উম্মাতের তত্ত্ববিদদের মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে যে মুহাব্বাত করেন, এই মুহাব্বাত দ্বারা বাস্তব অর্থই উদ্দেশ্য- কোন রূপক অর্থে নয়। তবে বাস্তব অর্থটি আল্লাহর শান অনুসারেই বিবেচ্য, আমাদের সাধারণ অর্থে নয়। যেমন তাঁর জ্ঞান ও করুণা তাঁর শান অনুসারেই বিবেচ্য, আমাদের করুণা ও জ্ঞানের মতো নয়। এ বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের জন্য অনর্থক। হ্যাঁ, যেসব লোক মুহাব্বাতের রূপক অর্থ করেন, তাদের এই মতবাদের প্রত্যাখ্যান অবশ্যই জরুরী। শত-সহস্র আয়াত ও হাদীসের মধ্যে মুহাব্বাতে ইলাহির আলোচনা এসেছে। এসব ক্ষেত্রে যথেচ্ছা রূপক ব্যাখ্যা তত্ত্ববিদগণের মতে এক ধরনের হঠকারিতা বৈ কিছু নয়।

আল্লাহর মুহাব্বাত অর্জনের পথ ও পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের মধ্যে মুহাব্বাতের যেসব পথ ও পদ্ধতির উপর আলোচনা হয়েছে, এসবের সারকথা হলো: ১. হযরত হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি তাঁকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পেরেছে, সে-ই হলো আল্লাহ তা'আলার কামিল মাহবুব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামই হলেন মাক্বামে মুহাব্বাতের আদর্শ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

-"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর।" (ইমরান (৩) : ৩১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا

-"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক সঽরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (আহযাব (৩৩) : ২১)

২. দ্বীনের হিফাজত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দায় দৃকপাত না কর। জান-প্রাণ, অর্থ-সম্পদ, কলম ও ভাষা তথা সর্বশক্তি নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া। ৩. পরিপূর্ণভাবে ফারাইয আঞ্জাম দেওয়ার সাথে সাথে অধিক হারে নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়া। ৪. আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার সাথে প্রেম সৃষ্টি করা এবং তা অধ্যয়ন করা। ৫. সবর, ইহসান, তাওবাহ এবং জাহির ও বাতিনের পবিত্রতা অর্জনে অধিকতর সাধনা করা। ৬. দ্বীনের হিফাজতের জন্য যুদ্ধের কাতারে খুব অটল হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া। ৭. তাকওয়া অবলম্বন করা।

আল্লাহর মুহাব্বাত অর্জনের নিদর্শন

১. ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেন, মুহাব্বাত হলো একটি পবিত্র গুণ। এটা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা উভয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাতের অর্থ হলো তিনি বান্দাকে স্বীয় নৈকট্য এবং

পবিত্রতম হাল ও সিফাত দিয়ে ধন্য করেছেন। যে বান্দার হৃদয়ে পবিত্রতম ইলাহী হালের অবতরণ হয়, এবং আল্লাহর নৈকট্য ও হুজুরী যার বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, সে-ই হলো আল্লাহ তা'আলার মাহবুব। সমস্ত নবীগণের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম মাক্বামে মুহাব্বাতের প্রথম স্তরে উত্তীর্ণ। তাঁদের গোটা জীবনই ছিলো পরীক্ষাময়। ২. হযরত খালীলুল্লাহ নিজের বাবা, দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে যে মুকাবিলা করেছেন, নৈরাশ্যজনক অবস্থায় হিজরত করেছেন এবং নিজ পুত্রকে কুরবানী করার যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা কুরআনে করীম ও সহীহ হাদীস শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে কয়েকটি মাত্র আয়াতের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

-"আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা করুন; নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন: হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। পিতা বলল: যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব, তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও!" (মারইয়াম (১৯) : ৪১-৪৬)

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

-"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল: এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর! অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আপন সত্তার দিকে ফিরেছি, যিনি নভোণ্ডল ও ভূণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই।" (আন'আম (৬) : ৭৮-৭৯)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

-"তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর! তখন সে কাফির হতভম্ভ হয়ে গেল; আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।" (বাক্বারাহ (২) : ২৫৮) হযরত খলীল আলাইহিসিসালামের উপর তাঁর পবিরার, দেশ ও শাসক যে নির্যাতন চলিয়েছিল, এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

-"তারা বলল: একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" (আম্বিয়া (২১) : ৬৮-৬৯)

যখন নিজের পিতা, পরিবার-পরিজন এবং রাষ্ট্র থেকে নিরাশ হয়ে পড়লেন, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিলেন, তখন তিনি যে ঘোষণা দিয়েছিলেন এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই আমরা তোমাদের মানি না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম তিনি বলেছিলেন: আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা! তমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর; নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (মুমতাহিনা (৬০) : ৪-৫)

হাজারো কষ্টের পরীক্ষার পর যখন ফিলিস্তিনে অবস্থান করাকালে হযরত হাজেরা আলাইহাস্সালামের গর্ভে ইসমাঈল জন্ম নিলেন, তখন মা ও প্রিয় পুত্রকে আরবের এক নির্জন মরুভূমিতে রেখে আসার নির্দেশ আসলো। আর আল্লাহর অনুগ্রহে এই পরীক্ষায়ও তিনি সফল হলেন। পরীক্ষা কিন্তু শেষ হয়নি। নির্দেশ আসলো, আদরের দুলালকে এবার কুরবানী করুন। এই ঘটনা সম্পর্কে আরো জানার জন্য সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কুরআন শরীফে এর বর্ণনা হলো,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে এসেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।" (ইব্রাহিম (১৪) : ৩৭)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

-"অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি? দেখ সে বলল: পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন; আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।" (সাফফাত (৩৭) : ১০২)

আল্লাহ তা'আলার মাহবুবে আজম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরীক্ষার আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করাও অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দিলে এ বিষয়ে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে রাখি। এরপরও এখানে দু'চারটে কথার আলোকপাত অত্যাবশ্যক মনে করছি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন,

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ

-"আল্লাহর পথে আমি যে পরিমাণ ভয়ের সম্মুখীন হয়েছি, কেউই সে পরিমাণ ভয়ের সম্মুখীন হয় নি। আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয় নি। আমার উপর ত্রিশ দিন এমনভাবে অতিক্রম হয়েছে

যে, আমার ও বিলালের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবারও জুটেনি।” (তিরমিযি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা হয় নবী-রাসূলগণের। এরপর দ্বীনের ক্ষেত্রে যারাই যতটুকু দৃঢ় হবে তার উপর পরীক্ষাও ততো কঠিন হবে। হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

-“আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ লোকদের পরীক্ষা বেশী কঠিন হয়? তিনি জবাব দিলেন, নবী-রাসূলগণের, এরপর দ্বীনের মধ্যে যে যতটুকু দৃঢ় হবে তার পরীক্ষাও সে পরিমাণ কঠিন হবে। মানুষের পরীক্ষা তার দ্বীনের অনুপাতেই হয়। পরীক্ষা তাকে এমনভাবে ঘিরে রাখবে যে, সে নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।” (সুনানে তিরমিযি : ২৩২২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারিমী, তাইয়ালাসী, আহমদ, আবদ ইবনে হুমায়িদ, ইবনে মা’নী, হাকিম, ইবনে হিব্বান) হযরত ফাতিমা বিনতে ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

-“কঠিন পরীক্ষা নবী-রাসূলগণের হয়, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী লোকদের, এভাবে তাঁদের পরবর্তী নিকটবর্তী লোকদের।” (তাবারানী : ২০০৯৪, নাসাঈ, হাকিম) আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

-“হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ লোকদের পরীক্ষা সবচেয়ে বেশী হয়? তিনি জবাব দিলেন, নবীগণের। এরপর কাদের? তিনি জবাব দিলেন, আলিমদের। এরপর কাদের? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, সৎ লোকদের।” (ইবনে মাজাহ, আবু নাঈম, জিয়া, হাকিম, ইবনে হিব্বান) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ , وَيُؤْتَى بِالْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ , ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلاءِ وَلا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ , وَلا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوَانٌ , فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الأَجْرُ صَبًّا , حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ فِي الْمَوْقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللهِ لَهُمْ

-"কিয়ামতের দিন শহীদকে উপস্থিত করে তার হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর সাদক্বাকারীকে উপস্থিত করে তারও হিসাব নেওয়া হবে। সবশেষে পরীক্ষা ভোগকারী লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে, কিন্তু তাদের জন্য কোন হিসাব-নিকাশ ধার্য করা হবে না। তাদের উপর সওয়াব ঢেলে দেওয়া হবে। তা দেখে দুনিয়াতে যারা আরাম ও বিলাসিতা করেছে, তারা আক্ষেপ করতে থাকবে, হায়! যদি কাঁচি দিয়ে আমাদের চামড়া কেটে দেওয়া হতো, তবে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবের অধিকারী হতে পারতাম।" (তাবারানী : ১২৬৫৮) হযরত আবু সা'ঈদ ও হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

-"মু'মিন বান্দা যতোই কষ্ট-পেরেশানীতে আক্রান্ত হোক না কেন, এমনকি তার পায়ে যদি কোন কাটাও বিদ্ধ হয়, এর বিনিময়েও আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মোচন করে দেন।" (সহীহ বুখারী : ৫২১০, মুসলিম) ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, আল্লাহর মুহাব্বাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে পরীক্ষাই হলো প্রথম স্তরের। প্রমাণস্বরূপ তিনি দু'টি হাদীসের বর্ণনাও দিয়েছেন। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য এই অধম যা কিছু লিখেছে তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু যুগের এই বহুমুখী ফিতনার মধ্যে এতোসব আলোচনাও যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। দ্বীনের খাদিম ও মুবাল্লিগদের মধ্যে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য একটু সবিস্তর আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। হে সৃষ্টিকর্তা! হে মাওলা! হে রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও সত্যের একটি দল তৈরী করে দাও, যারা তোমার সত্য দ্বীনের হিফাজতের জন্য গোটা বিশ্বের মুকাবিলা করতেও ভয় করবে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনার বিশেষ করুণা বর্ষণ করুন। দ্বীনের ময়দানে শত্রুর উপর বিজয় দান করুন। হে

আল্লাহ! আমার তা'লিম, তালকিন, তাহরির ও লেখনি তুমি কবুল করে নাও। আ-মিন।

ইমাম গায্যালী ও আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা স্ব-স্ব কিতাবে এই বিষয়টির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমি উভয় বুজুর্গের ভাষ্য এখানে উল্লেখ করার পর এ সম্পর্কিত আয়াতে কারীমা ও হাদীসের উপর আলোচনা করবো। তারা বলেছেন, "আম্বিয়ায়ে কিরাম কাফিরদের দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর এভাবে আউলিয়া এবং উলামায়ে কিরামও মূর্খ জাহিলদের দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হন। আউলিয়ায়ে কিরাম সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়। বাদশাহর দরবারে আসামী বানানো হয়। কাফির বলা হয়। ইতিহাস গ্রন্থাদি আউলিয়া ও উলামার পরীক্ষার ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। এতো কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তাঁরা অটল-অবিচল থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমেই শরীয়তের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন, সত্যের প্রচার করেন, দ্বীনের বিষয়-আশয় এবং মুসলমানদের সংশোধনীর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকেই নির্বাচিত করেন। আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন নমুনা এবং সাধারণ জনগণের কাছে তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রমাণ স্বরূপ। আর এজন্যই কিছু কিছু মূর্খ লোকদের কাছে এসব হক্কানী মা'রিফাতপন্থীরাও কাফির সাব্যস্ত হয়ে যান।"

এখন কিছু প্রামাণাদির উপর আলোকপাত করছি। হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ

-"যখন কোন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন, তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। এদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবর করে তার জন্যই সবর (তথা সওয়াব) নির্ধারিত। আর যে হায়-হুতাশ করে সে তারই উপযুক্ত।" (আহমদ : ২২৫১৭) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

-“পরীক্ষা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিময়ও বাড়ে। যখন কোন জাতিকে আল্লাহ তা’আলা ভালোবাসেন, তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এই পরীক্ষার সময় সন্তুষ্ট থাকে, সে সন্তুষ্টিরই ভাগীদার। আর যে অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তুষ্টিই তার প্রাপ্য।” (ইবনে মাজাহ : ৪০২১, তিরমিযি) হযরত আবু ওয়াইনা মাওলানী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ তা’আলা ভালোবাসেন তখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন।” (তাবারানী) হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الله إذا أحب عبدا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا

-“আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তাকে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে পরীক্ষা করেন।” (ইবনে আবিদ দুনইয়া : ২১৪) যদিও এই হাদীসের সনদ সূত্রে সমালোচনা আছে, কিন্তু যেহেতু এ সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর তাই এতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يُرِدْ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

-“আল্লাহ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে পরীক্ষা করেন।” (সহীহ বুখারী : ৫২১৩) হাফিজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, “বান্দার প্রতি আল্লাহর মুহাব্বাতের অর্থ হলো তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা। সুতরাং হাদীসটির মর্ম হলো, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর দ্বীনের জন্য যে পরীক্ষা হয়, সেটাই মূলত সবচেয়ে কঠিন ও সর্বোত্তম পরীক্ষা। এরূপ পরীক্ষাই হলো আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, আল্লাহর পথে আমি যে কষ্ট পেয়েছি অনুরূপ কষ্ট অন্য কেউ পায় নি। মক্কার মুশরিকদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা’আলা আলাইহিম আজমাঈন যে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, তার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়”।

৩. দরজায়ে মাহবুবের আলামত হলো পরীক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

-"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল; আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" (আনকাবুত (২৯) : ২-৩)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

-"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে; তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" (বাক্বারাহ (২) : ২১৪)

حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

-"এমনকি যখন পয়গম¡রগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।" (ইউসুফ (১২) : ১১০)

যে ব্যক্তি আল্লাহর মাহবুব হয় সে আল্লাহর আশিকও হয়। অর্থাৎ আল্লাহর মুহাব্বাতে সে একদম ডুবে যায়।

টীকা: আল্লাহ তা'আলার জন্য মুহাব্বাতের ক্ষেত্রে عشق 'ইশ্ক' শব্দের প্রয়োগ নিয়ে ইখতিলাফ আছে। কারো মতে তা জায়িয আর অন্যদের মতে না-জায়িয। কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের কথাবার্তায় এ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় নি। ইশ্ক বলা হয় সীমাতিরিক্ত ভালোবাসাকে। আল্লাহর শান অনুযায়ী মানুষ তাঁকে ভালোবাসার ক্ষমতা রাখে না। তাই সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা কিভাবে পোষণ করবে? আর এজন্যই একদল আলিমের মতে ইশ্ক শব্দের ব্যবহার না-জায়িয। অপর একদল আলিম বলেন, কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে 'মুহাব্বাত' শব্দের ব্যবহার আছে আর 'ইশ্ক' হলো মুহাব্বাতের স্তরসমূহের একটি স্তর। আর এসব স্তরের শেষ হলো ইবাদাত। তাই ইশ্ক শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর কোন অসুবিধা নাই।

আল্লাহর সাথে বান্দার মুহাব্বাত

আল্লাহকে মুহাব্বাত করা বান্দার জন্য ফরয। কুরআন সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা দ্বারা এই ফারযিয়াত ও আবশ্যকতা প্রমাণিত। আলোচনার শুরুতে অনেক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহ ইলাহী মুহাব্বাতের বিভিন্ন কাইফিয়াতের সবিস্তর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলাহী মুহাব্বাতের জন্য প্রার্থনা করতেন। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাজাত করতেন,

أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ভালোবাসা চাই, যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদেরও ভালবাসা চাই। যে কাজ আমাকে পৌঁছে দেবে তোমার প্রেমে, আমাকে দাও তুমি এমন কাজেরও ভালোবাসা।" (তিরমিযি) অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে আছে,

اللهُ مَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"হে আল্লাহ! আমার প্রাণ, পরিবার-পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি থেকেও তোমার প্রতি ভালোবাসা অধিকতর করে দাও।" (আবু নাঈম, তিরমিযি) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি দরবারে রিসালতে এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি জবাব দিলো, নামায-রোজা তো বেশী করতে পারি নি- তবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে আমি বেশী ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরকালের জীবনে তো প্রতিটি মানুষ তার প্রেমাস্পদের সাথে থাকবে। এই জবাব শুনে হাযারাত সাহাবায়ে কিরাম এতোই খুশী হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোন বিষয়ের উপর এতো আনন্দবোধ করেন নি। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে: "আল্লাহর জন্য বান্দার মুহাব্বাত প্রতিটি বস্তু থেকে বেশী হওয়া চাই"। আসলে এটা হলো নিম্নস্তরের মু'মিনের নিদর্শন। আর কামিল মু'মিন তো সে-ই হতে পারে যে আল্লাহর মুহাব্বাতে একদম ফানা হয়ে যায়। মাহবুব ছাড়া তার হৃদয় ও মস্তিষ্কে আর অন্য কোন কিছুরই জায়গা অবশিষ্ট থাকে না।

কবি বলেন:

"বন্ধুর ক্রন্দন যখন হৃদয়ের কল্পনায় পরিণত হয়; তখন হাঁটে-ঘাটে, বাজারে কেবল বন্ধুর মুখশ্রীই দৃষ্টিতে ভেসে আসে।"

কোন কিছুর প্রতি হৃদয়ের প্রবণতাকেই বলে মুহাব্বাত। হৃদয়ের প্রবণতার মূল কারণ হলো জামাল (সৌন্দর্য), কামাল (পরিপূর্ণতা) এবং নাওয়াল (করুণা)। রাব্বুল আলামীনের জামাল, কামাল ও নাওয়াল অশেষ, অনন্ত। সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা এবং দয়ার আঁধার হলেন তিনি। তাঁর দিকে হৃদয়ের আকর্ষণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে হৃদয় এ আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত, তা-তো এক পীড়িত হৃদয়। এ ধরনের হৃদয়ের চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। আর এই চিকিৎসা পদ্ধতি হলো তিনটি। ১. গাইরুল্লাহ থেকে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের প্রচেষ্টা করা, ২. মাহবুবের আসমা ও সিফাতের অধিক চর্চা করা। তাঁর হাক্বিকী নাম তথা 'আল্লাহ' এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার জিকির বেশী বেশী করা। হৃদয় যদি অধিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন 'জরব' (আঘাত) দিতে থাকা। ৩. মাহবুবের ধ্যান ও মুরাক্বাবা করা। ফরয, সুন্নাত এবং

মুস্তাহাবসহ সমস্ত ইবাদাতের মধ্যে এই মুরাক্বাবা সৃষ্টির জন্য কঠোর সাধনা করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

“তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো। তোমার সামনেই তাঁকে পাবে।” (সুনানে তিরমিযি : ২৪৪০) অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যান করো। তাঁকে কখনো ভুলে যেও না। তাহলে তুমি ধন্য হবে তাঁর মুশাহাদা ও সান্নিধ্য লাভে। মুহাব্বাতের মোট দশটি স্তর আছে। হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা করেছেন। আমি এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছি।

“মুহাব্বাতের দশটি স্তর: ১. আলাক্বা (সম্পর্ক), ২, ইরাদা (সংকল্প), ৩. সাবাবা (আকর্ষণ), ৪. গ্বারাম (হৃদয়ের আবশ্যক প্রেম), ৫. উদ (খাটি ভালোবাসা), ৬. শাগাব (হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে ভালোবাসার অনুপ্রবেশ), ৭. ইশ্ক (সীমাতিরিক্ত প্রেম যদ্বারা প্রেমিকের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে), ৮. তাইম (ভালোবাসার জন্য অনুনয় বিনয়), ৯. তা’আব্বুদ (এটা তাইমের উপরের স্তরের অবস্থা, কারণ যে বান্দার হৃদয়ে মাহবুব ছড়িয়ে পড়েছে তার হৃদয়ে অন্য কারো জন্য আর স্থান অবশিষ্ট থাকে না। জাহির ও বাতিন সবকিছুই মাহবুবের জন্য হয়ে যায়) এবং ১০. খিল্লাত (ভালোবাসার সর্বশেষ স্তর। ইব্রাহীম এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরা উভয়ই খালীল ছিলেন। প্রেমিক যখন খিল্লাতের স্তরে উত্তীর্ণ হবে তখন তার হৃদয়ে মাহবুব ছাড়া অন্য কারোর জন্য একটু জায়গাও আর অবশিষ্ট থাকবে না।”

মুহাব্বাতের বিভিন্ন অবস্থা

আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুহাব্বাতের অবস্থাগুলো হলো, বারক্ব (চমক), উজদ (উন্মুক্ততা), জাউক (আস্বাদন), লাহাজ (মুহূর্ত), ওয়াক্ত (সময়), সাফা (পরিচ্ছন্নতা), নাফাস (শ্বাস-প্রশ্বাস), ফারাক (বিচ্ছিন্নতা), গায়িব (অদৃশ্য), সুকুর (অতি-আসক্তি), ফানা (বিলীন), বাক্বা (ঠিকে থাকা), উজুদ (অস্তিত্ব), জামা (একত্রীকরণ), তা’জিম (সম্মান) উন্স (পরিচিতি), কুরব (নৈকট্য), সাকিনা (শান্তি), তমানিনাত (প্রশান্তি), ইম্বেসাত (প্রসারতা), ইমলাল (বিরক্তি), গ্বাইরাত (বিতৃষ্ণা) এবং শাওক (আকর্ষণ)

উজদের তিনটি অবস্থা: দাহাশ (আতঙ্ক), হায়জান (আবেগ) ও তামকিন (অটলতা)। কোন কোন আরিফকে আল্লাহ তা'আলা এসব আহওয়ালের মধ্যে কেবল একটি দান করেন। আর কাউকে সবকিছু দান করেন এমনকি আরো বাড়িয়ে দেন। যার অস্তিত্ব এবং অঙ্কন আমরা দেখিও নি এবং এর আলোচনা আমরা শুনতেও পাই নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

-" আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে আমি, নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি।" (হিজর (১৫) : ২১)"

আলোচনার শুরুতে হাফিজ ইবনে কাইয়্যিমের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছিলাম, মুহাব্বাত হলো সমূহ মাক্বামাত ও আহওয়ালের আত্মা। যা হলো সুফিয়ায়ে কিরামের ঐকমত্য। মুহাব্বাতই হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ইখলাসের হাক্বিকাত। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ হলো তিনি ছাড়া না আছেন কোন মা'বুদ আর না আছেন কোন মাহবুব। আর ইখলাস শব্দের অর্থ হলো, হৃদয়কে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা। গাইরুল্লাহর জন্য তাতে কোন অংশীদারিত্ব অবশিষ্ট না রাখা। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা হবেন হৃদয়ের মাহবুব, মা'বুদ এবং মাকসুদ।"

মুহাব্বাতের মাধ্যম

ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের অনুসন্ধানী হও, তবে পশ্চাতে দুনিয়াকে নিক্ষেপ কর। গোটা জীবন জিকির ও ফিকিরে লিপ্ত থাকো। দেখবে তুমি হয়ে গেছ বিরাট এক রাজ্যের মালিক। শাশ্বত সৌভাগ্যের ভাগীদার। আল্লাহই তাওফিকদাতা"।

হৃদয়ে ইলাহী মুহাব্বাত সৃষ্টির অনেক পদ্ধতি আছে। এগুলোর সার হলো তিনটি: ১. তরকে দুনিয়া, অর্থাৎ অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করা।

"হুজুরী অর্জন হয় যদি তোমার বাসনা, তবে তার সামন থেকে অদৃশ্য হয়ো না। সাক্ষাৎ হবে যখন মাহবুবের, সরিয়ে দাও মায়াজাল এ জগতের।"

২. কসরতে জিকির (অধিক হারে জিকির করা): ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়ের পর বেশী করে নফল ইবাদত করা। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

করা ও শোনা, দ্বীনি শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদান, লিখনী সাধনা, অধ্যয়ন, মানুষকে আল্লাহর পথ দেখানো, দু'আ-দরূদ-ইস্তিগ্বফার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আল্লাহু এর জিকির এ সবই হলো নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ৩. মুরাক্বাবা ও মুসামারা: অর্থাৎ সদা-সর্বদা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ থাকা এবং তাঁর সাথে কানাঘুষা করা। ইমাম গায্যালীর ভাষায় এটি হলো 'ফিকরে লাজিম' (অত্যাবশ্যক চিন্তা)।

আল্লাহর সাথে বান্দার মুহাব্বাতের নিদর্শন

আল্লাহর সাথে বান্দার মুহাব্বাতের অনেক নিদর্শন আছে। তন্মধ্য থেকে কেবল ১০টি নিদর্শনের আলোচনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

১. আল্লাহর সাক্ষাতের মুহাব্বাত: প্রত্যেক প্রেমিকই প্রেমাস্পদের সাক্ষাতের চেষ্টা করে থাকে। প্রেমাস্পদের সাক্ষাতই হলো জীবনের একক উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

-"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (কাহাফ (১৮) : ১১০)

মাহবুবের মিলন লাভে যদি মৃত্যুর প্রয়োজন হয়, তাহলে মৃত্যুও প্রেমিকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। আর এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতলাভের প্রার্থনা করতেন। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে,

أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية ، فدعا سعد فقال : يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه ، فأمن عبد الله بن جحش ، ثم قال : اللّٰهُمَّ ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه ، أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني ، فإذا لقيتك غدا قلت : يا عبد الله من جدع أنفك

وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولك ، فتقول : صدقت ، قال سعد : يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي ، لقد رأيته آخر النهار ، وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط

-"উহুদের ময়দানে আব্দুল্লাহ ইবনে যাহাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে (সা'দকে) বললেন, আমরা কেন একটি কোণে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি না? এরপর তিনি প্রার্থনা করলেন: হে প্রভু! আমি তোমার নামে শপথ করছি, আগামীকাল যখন শত্রুর সাথে মুকাবিলা করবো, তখন এক প্রবল শক্তিধর দুশমনের সম্মুখীন করুন। আমি একমাত্র আপনার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। সে-ও আমার সাথে লড়তে থাকবে। তার উপর আমার বিজয় দান করুন। আমি তাকে হত্যা করে অস্ত্র যেনো ছিনিয়ে নিয়ে আসি। তখন তিনি আমিন বলে আবার প্রার্থনা করলেন: হে প্রভু! আমি তোমার নামে শপথ করছি, আগামীকাল যখন শত্রুর মুকাবিলা করবো, তখন এক প্রবল শক্তিধর দুশমনের সম্মুখীন করুন। আমি একমাত্র আপনার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। সে-ও আমার সাথে লড়তে থাকবে। যুদ্ধ করে সে যেনো আমার নাক ও কান ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আগামীকাল যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে, আপনি তখন বললেন, হে আল্লাহর বান্দাহ! তোর নাক ও কান কে কেটে দিয়েছে? আমি জবাব দেবো, আপনি ও আপনার রাসূলের জন্যই এসব হয়েছে। আপনি জবাব দেবেন, তুমি সত্যি বলেছো! বর্ণনাকারী সা'দ বলেন, হে বৎস! আমার প্রার্থনা থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যাহাশের প্রার্থনা উত্তম। দিনের শেষভাগে আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর নাক ও কান একটি রশির মধ্যে বেঁধে রাখা আছে'। সাইব ইবনে মুসাইয়্যাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আশা করি, তাঁর শপথের প্রথমাংশ যেভাবে আল্লাহ তা'আলা পূরণ করে দিয়েছেন, এর দ্বিতীয়াংশও আল্লাহ তা'আলা পূরণ করবেন।" (তাবারানী, বগভী, আবু নাঈম : ৩৫৮৮) হাদীস শরীফের মধ্যে আরো আছে,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

-"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার সাক্ষাতকে মুহাব্বাত করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী নয়, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন না।" (সহীহ বুখারী : ৬০২৬, মুসলিম - হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে) সুনানে তিরমিযির মধ্যে আছে,

ঈমানের আলো যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর অতি দ্রুত দুনিয়া থেকে পলায়নের আকাক্সক্ষা তীব্র হয়ে যায়।

২. নিজের প্রবৃত্তির উপর আল্লাহর চাহিদাকে প্রাধান্য দান:

هذا لعمرى في الفعال بديع الاله وأنت تظهر حبه . تعصي

لوكان حبك صادقا لاطعته . إن المحب لمن يحب مطيع

"তুমি মা'বুদের ভালোবাসা প্রকাশ করছো, অথচ তাঁর অবাধ্যতা করছো, এ রকম আচরণ তো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক! তোমার মধ্যে যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকতো তাহলে তো তাঁকে অনুসরণ করতে। কারণ প্রেমিক তো তার প্রেমাস্পদেরই অনুগামী হয়ে থাকে।"

সারকথা হলো, মাহবুবের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করাই হলো মুহাব্বাতের নিদর্শন। ইমাম সহল তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশী বেশী নফল আদায়ের নাম মুহাব্বাত নয়, বরং হারাম, মাকরুহ এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেকে রক্ষার নামই হলো মুহাব্বাত। 'ইতহাফে'র মধ্যে আছে, সৎ হোক, অসৎ হোক সকলেই ভালো কাজ করতে পারে। কিন্তু পাপাচার বর্জন করতে পারে একমাত্র সৎ লোকই।

টীকা: মুহাব্বাত ও পাপের মধ্যে কি কোন সংঘর্ষ আছে? তত্ত্ববিদদের মতে পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বিদ্যমান। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা পরিপূর্ণ পাপাচারের সাথে কোন ক্রমেই একত্রিত হতে পারে না। এক ব্যক্তি একই সাথে প্রকাশ্য পাপাচার এবং আল্লাহর পূর্ণ মুহাব্বাতের অধিকারী হতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

-"একজন মানুষ মু'মিন থাকাবস্থায় ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ও লুণ্ঠন করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী : ২২৯৫) হাদীসের সারকথা হলো, ব্যভিচার, চুরি,

মদ্যপান, লুটতরাজ ইত্যাদি ঈমানের পূর্ণাঙ্গ স্তরের সাথে সাংঘর্ষিক। যে ব্যক্তি কবীরা গোনায় লিপ্ত সে প্রকৃত মু'মিন ও প্রকৃত প্রেমিক হতে পারে না। তার ঈমান ও মুহাব্বাত হুকমী হিসাবে ধার্য হবে। ইতহাফের মধ্যে আছে, "ঈমানের মর্মকথা হলো, বান্দাহ আল্লাহর সাথে সবসময় উপস্থিত থাকবে, অথবা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনসমূহের সাক্ষ্য দেবে। গাফিল ও পাপাচারী লোক তো এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। সে হুকমী মু'মিন, ঘুমন্ত ব্যক্তির সমতূল্য।" ভালোবাসা ও পাপাচারিতা উভয় দিকে যদি পূর্ণাঙ্গ স্তরে না হয়, তখন উভয়টি একত্র হতে পারে। যেমন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

-"জনৈক ব্যক্তির নাম ছিলো আবদুল্লাহ, তিনি হিমার নামে পরিচিত ছিলেন। তাকে মদ্যপ অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের নিকট নিয়ে আনা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হলো। তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। একথা শোনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে অভিসম্পাত করো না। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই একথা বলতে পারি, এই লোকটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।" (সহীহ বুখারী : ৬২৮২)

৩. আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের আলোচনা বেশী বেশী করা: প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে কোন উপায়েই ভুলতে পারে না। মুখ ও হৃদয়ে কেবল তাঁকেই স্মরণ হয়। সে লিপ্ত থাকে তাঁর কিতাবের পঠন ও শ্রবণে। যেহেতু মাহবুবের পথের প্রদর্শক হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর এ জন্যই তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন, তাই এক মুহূর্তের জন্য তাঁর আঁচল থেকে হাত সরানো যাবে না। ইহইয়া ও ইতহাফের মধ্যে আছে, "আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার নিদর্শন হলো, সবসময় সে আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকবে। মুখ ও হৃদয়ে কোন বিরক্তিবোধ আসবে না। সে কুরআনকে

ভালোবাসবে, কারণ এটা হচ্ছে তাঁর বচন ও কালাম। হৃদয় ও কর্ম দিয়ে তা বার বার চর্চা করবে। সে ভালোবাসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, কারণ তিনি হলে তাঁর হাবীব ও নির্বাচিত বান্দাহ। আর সে ভালোবাসবে আল্লাহর সৎ বান্দাদেরকে।”

মুহাব্বাতের উল্লেখিত তিনটি নিদর্শনের প্রমাণ এখানে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি। ১. আল্লাহর জিকির বেশী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

-“হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে সষ্রণ কর।” (আহযাব (৩৩) : ৪১)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-“আল্লাহকে অধিক পরিমাণে সষ্রণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।” (আনফাল (৮) : ৪৫)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

-“তোমরা আমাকে সষ্রণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।” (বাক্বারাহ (২) : ১৫২)

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

-“এবং আল্লাহর জিকিরই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।” (আনকাবূত (২৯) : ৪৫)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

-“আল্লাহ তা’আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেরূপ- যেরূপ সে আমাকে ভাবে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। যদি আমাকে একা একা স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে একা স্মরণ করি। যদি আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাঁকে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর এক হাত অগ্রসর হলে আমি এক গজ অগ্রসর হই। সে হেঁটে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।” (সহীহ বুখারী : ৬৮৫৬, মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ) আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

-“জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের বিধি-বিধান অনেক। আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে বলুন যা আমি সর্বদা করতে পারি। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার জিহ্বা যেনো সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে।” (তিরমিযি : ৩২৯৭, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

-“নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা বলেন, বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে তখন আমি তার সঙ্গী হয়ে যাই।” (বুখারী, ইবনে মাজাহ : ৩৭৮২, ইবনে হিব্বান) মু’আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ:"أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

-“(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় শেষ কথা যেটি ছিলো তাহলো), আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়? তিনি জবাব দিলেন, তুমি এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে, যেনো তোমার জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত হয়ে আছে।” (ইবনে হিব্বান,

বাজযার, তাবারানী : ১৬৬০৭, ইবনে আবিদ দুনইয়া) আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

-"আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের সংবাদ দেবো না, যা তোমাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সর্বাধিক উচ্চ স্তরের, সোনা-রূপা দানের চেয়েও উত্তম। এমনকি শত্রুর ঘাড়ে তোমাদের আঘাত এবং তোমাদের ঘাড়ে শত্রুর আঘাতের চেয়ে উত্তম? তারা জবাব দিলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, সেটি হলো আল্লাহর জিকির।" (আহমদ, তিরমিযি : ৩২৯৯, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, হাকীম) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن لكل شيء صقالة ، وإن صقالة القلوب ذكر الله ، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

-"প্রত্যেক জিনিসের মরিচা দূর করার যন্ত্র আছে, আর আল্লাহর জিকির হলো হৃদয়ের মরিচা দূর করার যন্ত্র। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য জিকিরের চেয়ে উত্তম কোন পথ নেই।" (শুয়াবুল ঈমান : ৫৫১) হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله ﷺ قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ﷺ : ولا الجهاد إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع

-"আল্লাহর জিকিরই হলো মানুষের জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে অধিক মুক্তিদানকারী। তখন প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকেও কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ না তলোয়ারের আঘাতে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।" (তাবারানী : ২৩৮৭) হারিস আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসের মধ্যে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا ، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت ،... وأمركم بذكر الله كثيرا ، ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا ، فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله

-"তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন এদিক সেদিক তাকিয়ো না, বান্দাহ যতক্ষণ এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি মনোনিবেশ থাকেন। তোমাদেরকে অধিক হারে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ দিচ্ছি। যে আল্লাহকে স্মরণ করে তার উদাহরণ হলো ঐ লোকের মতো যাকে শত্রু তাড়াচ্ছে- তখন সে একটি সুরক্ষিত দূর্গে এসে নিজেকে রক্ষা করলো। এভাবে বান্দার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো আল্লাহর জিকির।" (তিরমিযি, হাকিম : ১৪৮১, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হিব্বান) হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

-"যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের তুলনা হলো মৃত ও জীবিতের সাথে।" (সহীহ বুখারী : ৫৯২৮) আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ

-"বেশী করে তোমরা আল্লাহর জিকির করো যে পর্যন্ত না মানুষ তোমাদেরকে পাগল বলে।" (আহমদ : ১১২৪৬, আবু ইয়া'আলা, ইবনে হিব্বান, হাকিম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ إِنَّكُمْ تُرَاءُونَ

-"এমনভাবে আল্লাহর জিকির করো, যেনো মুনাফিকরা বলে তোমরা রিয়াকারী হয়ে গেছো।" (তাবারানী : ১২৬১৫) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে জামদান পাহাড় অতিক্রম কালে বললেন, তোমরা চলতে থাকো এটা জামদান পর্বত। মুফাররিদরা তো এগিয়ে গেলো। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুফাররিদ কারা? তিনি জবাব দিলেন, যারা আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে।" (সহীহ মুসলিম : ৪৮৩৪) তিরমিযি শরীফে আছে, "তিনি বললেন, মুফাররিদ হলো তারা যারা আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকে, জিকির তাদের বোঝা হালকা করে দেয়, আর কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর সম্মুখে অত্যন্ত হালকা বোঝা নিয়ে আসবে"। হযরত মুনজিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলেন ঐসব লোক যারা কেবল আল্লাহর জিকিরই করতে থাকে। মানুষ তাদেরকে কি বলে, বা কিরূপ আচরণ করে সেদিকে তাদের ভ্রƒক্ষেপই নেই। হযরত উম্মে আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوْصِنِي. قَالَ:اهْجُرِي الْمَعَاصِيَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، وَأَكْثِرِي مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّكِ لا تَأْتِي اللهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ

-"হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, পাপাচার বর্জন করো, কারণ এটাই হলো সর্বোত্তম হিজরত। ফারাঈয আদায়ে যতœবান হও, এটা হলো সর্বোত্তম জিহাদ। বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করো, কারণ আল্লাহর স্মরণই হলো তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।" (তাবারানী : ২০৮২১) হযরত মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهَا

-"জান্নাতবাসী কোন কিছু নিয়েই আক্ষেপ করবে না, কেবল দুনিয়ার জীবনের ঐসব সময়টুকু নিয়ে আক্ষেপ করবে যা তারা আল্লাহর জিকির ছাড়া কাটিয়েছিল।" (তাবারানী : ১৬৬০৮, বাইহাকী)

বাইআত

বাইআত কয়েক প্রকার: ১. ইসলামের উপর বাইআত, ২. খিলাফাত তথা আনুগত্যের বাইআত, ৩. জিহাদের বাইআত, ৪. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন না করার বাইআত, ৫. মৃত্যুর বাইআত ও ৬. পাপাচার ত্যাগ এবং আল্লাহর রাসূলের তরীকার উপর অটল থাকার বাইআত- এটাকে বাইআতে তাওবাহও বলা হয়। তাসাওউফ শাস্ত্রে এই শেষোক্ত বাইআত নিয়ে আলোচনা করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা এই বাইআত প্রমাণিত। অতি শীঘ্রই এর উপর আলোচনা আসবে।

জিকরুল্লাহর পথ ও পদ্ধতি

আগেকার বিষয়াদিতে জিকরুল্লাহর ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফের বর্ণনা এসেছে। এখন জিকরুল্লাহর মশহুর তরীকা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা জরুরী মনে করছি।

গ্রন্থের সূচনায় নিসবত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই নিসবত অর্জন হয়। নিসবত অর্জন হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহর মুহাব্বাতে মত্ত হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে নিল, তার জন্য বাইআতের প্রয়োজন নেই। যেমন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি প্রমুখ মুজতাহিদ ইমামগণ। যাদুত তাক্বওয়াহ গ্রন্থে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, চিশতিয়া, কাদিরীয়া, নকশবন্দিয়া ইত্যাদি তরীকাসমূহের আসল উদ্দেশ্য হলো নিসবত এবং সাকীনা অর্জন করে নেওয়া। আর এরই মাধ্যমে মুশাহাদায় পৌঁছে যাওয়া। তাই এসব তরীকার যে কোন শুগলকে গ্রহণ করে তাতে ডুবে থাকলে নিঃসন্দেহে সাকীনা ও মুশাহাদা অর্জন হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

-"যখনই কোন দল আল্লাহর জিকিরের জন্যে বসে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে দেন। করুণা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তাদের উপর বর্ষণ হয় প্রশান্তি। আল্লাহর কাছে যারা আছেন তাঁদের সাথে তিনি এসব লোকদের আলোচনা করেন।" (মুসলিম : ৪৮৬৮) হাদীসের মধ্যে সাকীনা শব্দের অর্থ হলো আত্মিক প্রশান্তি। এটা কখনো মেঘমালার মতো অবতরণ হয়। তখন হৃদয়ে নূরানিয়াত সৃষ্টি হয়। অনুভব হয় আল্লাহ তা'আলার হুজুরী। ইবাদতের মধ্যে সৃষ্টি হয় স্বাদ ও মনোযোগ। তাই সালিককে জিকির ও মুরাক্বাবায় মশগুল থাকা চাই। ইনশাআল্লাহ! ইলাহী রাহমাত তাকে টেনে নেবে আর মুশাহাদা ও হুজুরী দ্বারা তাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করবে। মুশাহাদার মধ্যে যে স্বাদ আছে, তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে হ্যাঁ, একমাত্র স্বাদ গ্রহণকারী নিজেই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

টীকা: এসব শুগল ছাড়া নিসবত অর্জনই হয় না- এরকম ধারণা রাখা যাবে না। বরং এসব শুগল হলো নিসবতের সমূহ পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি। এই একটি মাত্র পদ্ধতির মধ্যে নিসবত অর্জন সীমাবদ্ধ নয়।

প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহ

আমাদের দেশে জিকরুল্লাহর চারটি প্রসিদ্ধ তরীকা আছে। যে কোন একটিকে অনুসরণ করলে অবশ্যই অন্তরে সৃষ্টি হবে এক প্রকার জয্ব, যা পথিককে পৌঁছে দেবে নিসবত পর্যন্ত। সাইর ইলাল্লাহর পর সাইর ফিল্লাহর অকূল সাগরে ডুব দিয়ে গুপ্ত মণি-মুক্তার অধিকারী হয়ে যাবে। এই মণি-মুক্তার সন্ধানেই হাজার-সহস্র আউলিয়ায়ে কিরাম তাদের জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

"এ বছরই খাকানীর নিকট বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠলো: আল্লাহর সাথে একটিমাত্র মুহূর্ত যাপন, বাদশাহ সুলাইমানের (আ:) রাজত্ব থেকেও উত্তম।"

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির

সাধারণভাবে আল্লাহর জিকির সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা এসেছে। তবে প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহের মধ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আল্লাহ্'

জিকরে মুজাররাদের খুব জোর দেওয়া হয়। তাই এ সম্পর্কে একটু আলোকপাতের প্রয়োজন বোধ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

-"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" (মুহাম্মাদ (৪৭) : ১৯)

ইতবান ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসের মধ্যে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

-"যে মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আল্লাহ তার জন্য আগুন হারাম করে দিবেন।" (সহীহ বুখারী : ৪০৭)

আমি অধমকে হযরত শায়খ মুদ্দাজিল্লুহু প্রথমে নকশ্বন্দিয়া তরীকার তা'লিম দেন। তাই এ তরীকার প্রসিদ্ধ আমল ও শুগল নিয়ে আলোচনা করব। তাছাড়া যে সব সাধক পুরুষদের লেখনী দ্বারা আমি বেশ উপকৃত হয়েছি তারা সবাই-ই নকশ্বন্দিয়া তরীকার ছিলেন। যেমন ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল ইহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, মিশকাতুল আনওয়ার, ইত্যাদি। এভাবে ইতহাফ লেখক আল্লামা জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাকতুবাত লেখক মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, রূহুল মাআনী লেখক সাইয়্যিদ আলুসি বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তারা সবাই নকশ্বন্দিয়া তরীকার ইমাম ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লেখনী থেকেও নকশ্বন্দিয়া তরীকার ফোটা খুব বেশী বর্ষণ হতে থাকে। তাই অগ্রভাগে এই তরীকার আমল ও শুগল সম্পর্কেই আলোচনা করছি।

অধমকে হযরত শায়খ মুদ্দাজিল্লুহু নকশ্বন্দিয়া, চিশতিয়া, কাদিরিয়া এবং মুজাদ্দিদিয়া - এই চার তরীকার ইজাযাত ও তালিম প্রদান করেন। তাই এই চার তরীকার আমল ও শুগল সম্পর্কেও আলোচনা আসবে। তবে নকশ্বন্দিয়া ও চিশতিয়া তরীকার একটু বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করব।

টীকা: উল্লেখিত সব তরীকাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ, দুনিয়া থেকে বিতৃষ্ণা, জিকরুল্লাহর আধিক্য

এবং পরিপূর্ণ মুরাক্বাবার মাধ্যমে নিসবত অর্জনই হলো সব তরীকার উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

احْفَظْ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

-"তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, তোমার সামনেই তাঁকে পেয়ে যাবে।" (সুনানে তিরমিযি : ২৪৪০) উক্ত হাদীসে 'আল্লাহকে স্মরণ করো' এর অর্থ হলো মুরাক্বাবা এবং জিকরে ক্বালবী। এবং 'তাঁকে তোমার সামনে পেয়ে যাবে' এর মর্ম হলো মুশাহাদা। সব তরীকার ঐকমত্য হলো সালিককে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আল্লাহ' জিকির অবশ্যই করতে হবে। হ্যাঁ, জিকিরের পঠন পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা আছে যা মূলত এই অধমের মতে তরীকতের ইমামগণের ইজতিহাদী বিষয়।

নকশবন্দিয়া তরীকার আমল ও শুগল

১. তালিবকে প্রথমে বাইআত করাতে হবে। বাইআতের অনেক প্রকার আছে, যার আলোচনা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। এখানে বাইআতের শেষোক্ত প্রকার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পাপাচার বর্জন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর অটল থাকার বাইআত। কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা এই বাইআত প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-"হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।" (মুমতাহিনা (৬০) : ১২)

এই বাইআতকে ইস্তিগ্বফার ও তাওবাহর বাইআতও বলে। তরীকতের মাশাইখ দ্বারা এই বাইআত চলে আসছে। উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পশে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাইআত করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানাদিকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং সৎ কাজ সম্পাদনে অবাধ্যতা করবে না।" (সহীহ বুখারী : ১৭) হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

-"আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামিতার উপর বাইআত করেছি।" (সহীহ বুখারী : ৫৫) বাইআতকারী যদি পুরুষ হয়, তবে সে বাইআতদাতার হতে হাত ধরবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ

-"আল্লাহর রাসূল আমাকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন যে, তিনি আমার হাত তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা ধরে রাখলেন।" (সহীহ বুখারী : ৫৭৯৪) বাইআতকারী যদি মহিলা কিংবা বড় একটি জামাআত হয়, তাহলে বাইআতের জন্য কাপড় ছড়িয়ে দেবেন। পরনারীর হাত ধরে বাইআত করানো হারাম। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে বাইআত করিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! বাইআতের মধ্যে কোন

মহিলার হাতের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের স্পর্শও হয় নি।” (সহীহ বুখারী) হাফিজুদ ডুনইয়া ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য হলো, বাইআতের মধ্যে পুরুষদের হাত ধরা একটি চলমান আদত। কিন্তু নারীদের জন্য এই নির্দেশনা নয়। তাদের হাত ধরা জায়িয নেই- তবে কাপড়ের মাধ্যমে বাইআত করে নেওয়া উত্তম। শা’বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত,

أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بايع النساء ، أتى ببرد قطري فوضعه على يده ، فقال ﷺ : إني لا أصافح النساء

-“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মহিলাদের বাইআত নিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে একাখানা চাদর দেওয়া হয়। তিনি তখন বললেন, আমরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না।” (মারাসিলে আবু দাউদ)

এরপর নিজের শাইখ থেকে প্রাপ্ত শব্দাবলী ব্যবহার করে ইখলাসের সাথে তাওবাহ করাবেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত এবং হযরত জারীর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর বক্তব্যের দিকে মনোযোগ রাখা বেশ যুৎসই। সারকথা, তাওবাহর মধ্যে ব্যাপক কথার প্রয়োগ করবেন। আল্লাহ তা’আলার দরবারে নিজের ও বাইআতকারীর জন্য মাগফিরাত চাইবেন। দু’আ করবেন, তাঁর হৃদয়ে যেনো রব্বানী জয্ব ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়।

মুরীদের প্রতি উপদেশ

বাইআতের পর মুরীদকে শায়খ নামায-রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি তার নামায রোযা সঠিকভাবে আদায় না হয়, তবে তাকে শিক্ষা দেবেন। যদি তার উপর কোন হক্কুল ইবাদ থেকে থাকে তাহলে অতি দ্রুত পরিশোধের নির্দেশ দেবেন। এরপরই জিকিরের তালিম শুরু করবেন।

তাওয়াজ্জুহ

জিকিরের তালিমের সাথে সাথে নকশবন্দী মাশাইখ তাওয়াজ্জুহও প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ মুরীদের আত্মার সাথে শায়খের আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে হৃদয়ের

ভাষায় প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার মধ্যে যে জয্ব প্রদান করেছো, তুমি তোমার এই বান্দার হৃদয়েও অনুরূপ জয্ব সৃষ্টি করে দাও।

পাস-আনফাস

শায়খ মুরীদকে পাস-আনফাসের শিক্ষা দেবেন। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এভাবে করা যে, শ্বাস ত্যাগের সময় খিয়াল করবেন 'লা-ইলাহা' এবং শ্বাস নেওয়ার সময় খিয়াল করবেন, 'ইল্লাল্লাহ'। খুব মুহাব্বাত ও ইখলাসের সাথে হৃদয়ের খিয়ালে এই জিকির করবেন। নফীর দ্বারা গাইরুল্লাহর মা'বুদিয়াত, মাহবুবিয়াত, মাকসুদিয়াত এবং মাওজুদিয়াতের দিকে খিয়াল রাখবেন। যেমন নাকি জাকির জিকিরের দ্বারা গাইরুল্লাহর সবকিছু বের করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাত দিয়ে হৃদয়কে ভরপুর করে দিচ্ছে। একটা শ্বাসও যেনো আল্লাহর জিকির ছাড়া না যায়, সেদিকে খিয়াল রাখবেন।

ছয় লতীফা এবং নকশবন্দিয়া তরীকার অন্যান্য আমল ও শুগল

যাদুত-তাকওয়ার মধ্যে আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ৬টি লতীফা বিদ্যমান। তাই এগুলোর অবস্থান জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী। প্রথম লতীফা হলো ক্বালব- বাম স্তনের নীচে এর অবস্থান। দ্বিতীয় লতীফা হলো রূহ- এর জায়গা ডান স্তনের নীচে। তৃতীয় লতীফা হলো সির- উভয় স্তনের মধ্যভাগে হলো তার অবস্থান। চতুর্থ লতীফার নাম নফস- এর অবস্থান নাভীমূলে। পঞ্চম লতীফার নাম খফী- এর অবস্থান হলো কপালের সিজদার চিহ্নযুক্ত স্থানে। ষষ্ঠ লতীফা আখফা- এর অবস্থান মাথার তালুতে।

ফায়দা ১: উল্লেখিত ছয় লতীফার উপর আলোচনার সাথে আল্লাহর ইসমে যাত তথা 'আল্লাহ' শব্দের জিকির খুব বেশী করা চাই। শায়খ যেভাবে নিজের লতীফার মধ্যে এই জিকির জারী করে দিয়েছেন, ঠিক এভাবে যেনো মুরীদের লতীফাসমূহে আল্লাহর জিকির জারী হয়ে যায়, তিনি এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেবেন। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তাঁর করুণা কামনা করবেন। তার দিকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন। এই তাওয়াজ্জুর সর্বনিম্ন স্তর হলো, মুরীদ তার হৃদয়ে এক প্রকার আলোড়ন অনুভব করবে। এই আলোড়নটা হাত দিয়ে অনুভব করা যাবে না, বরং

যখন আলোড়ন আসবে তখন লতীফার মধ্যে আল্লাহর নামের জিকির শুরু হয়ে যাবে। সে 'আল্লাহু' 'আল্লাহ' জিকির করতে থাকবে। দিলের মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বাত ও হুজুরী অনুভব করবে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকটি লতীফায় পৃথকভাবে জিকিরের মশক করবে। অতঃপর একই সময় সবগুলোর মধ্যে জিকির শুরু করে দিবে। এতে সব লতীফা থেকে একই সময় আল্লাহর জিকির অনুভব করবে। এই মশককে খুব মজবুত ও দৃঢ় করতে হবে। দৃঢ়তার নিম্ন স্তর হলো যখনই ইচ্ছা তখনই জিকিরে মশগুল হতে পারবে। শায়খ যদি আরো দৃঢ় করার নির্দেশ দেন তাহলে তার হুকুম মেনে চলবে।

ফায়দা ২: ছয় লতীফার জিকিরের পর হাবসে দমের মাধ্যমে নফী এবং ইসবাতের জিকির করবে। নফী অর্থ নাই আর ইসবাত অর্থ স্থিত। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকিরের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে ধ্বংসশীল মনে করা। আল্লাহই একমাত্র চিরস্থায়ী এ বিশ্বাস পোষণ করা। এই জিকির আদায়ের তরীকা হলো, আদবের সাথে কিবলামুখী হয়ে চারজানু অবস্থায় বসা। শ্বাস বন্ধ করে জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগিয়ে 'লা' শব্দকে লতীফায়ে নফস (নাভীমূল) থেকে টেনে বের করে লতীফায়ে সীরে এনে একটু থামাবে। এরপর লতীফায়ে আখফায় এনে পৌঁছে দেবে। মোটকথা, লতীফায়ে নফস থেকে লতীফায়ে আখফা পর্যন্ত টানা মূলত খিয়ালের মাধ্যমে করতে হবে। সির ও খফীর মধ্যে থামার অর্থ হলো একটু কল্পনা করা। আখফা পর্যন্ত লা-কে পৌঁছানোর পর 'ইলাহা'-কে আখফা থেকে টেনে লতীফায়ে রূহ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এরপর 'ইল্লাল্লাহ'-কে লতীফায়ে রূহ থেকে টেনে লতীফায়ে ক্বালবের মধ্যে নিয়ে আঘাত বা জরব লাগাবে। এই জরব মূলত কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন প্রয়োগ নেই। মাথা, মুখ এবং ঠোঁটের মাধ্যমে বাহ্যিক কোন নড়াচড়াই করা যাবে না। বেজোড় সংখ্যায় জিকির করবে, যেমন এক, তিন বা পাঁচবার। এই পদ্ধতিতে একবার জিকির শেষ করে দ্বিতীয়বার শুরু করবে। যদি দম বন্ধ অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় তবে আরো বেশী করে জিকির করবে। একুশ বার পর্যন্ত করা হলো সর্বো""" স্তর। এক দমে একুশ বার করার ক্ষমতা হয়ে গেলে একই বৈঠকে বসে আরো বেশী করাও যেতে পারে। এই জিকিরের সময় সমস্ত লতীফার মধ্যে উষ্ণতা ও পরিচ্ছন্নতা অনুভব হবে। জিকিরকারী অনুভব করবে, একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

ফায়দা ৩: নফী-ইসবাতের পর সুলতানুজ জিকির এর মশক করবে। এর বর্ণনা হলো, মানবদেহের প্রতিটি অংশ হলো ভিন্ন ভিন্ন। এগুলোর ভিন্ন নামও আছে। তাই এসব বস্তুর ভিন্ন জিহ্বাও বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

-"এবং প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।" (বনী ইসরাঈল (১৭) : ৪৪)

সুলতানুজ জিকিরের মর্মার্থ হলো উপরোক্ত প্রতিটি অংশকে এক মনে করবে। এই জিকিরের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং নিজের সমস্ত শরীরকেই ছয় লতীফার মতো মনে করবে। একথা সত্য যে, মানুষের দৃষ্টিতে ছয় লতীফা ও সমস্ত শরীর একই কথা। যখন ছয় লতীফার অবস্থান থেকে জিকির শুরু করবে এবং এর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে, তখন সমস্ত শরীর দিয়ে জিকির আরম্ভ করবে। শায়খ নিজে যেভাবে সুলতানুজ জিকির করেন, ঠিক সেরূপ মুরীদকে মশক করাবেন। এর প্রতিক্রিয়া এভাবে দেখা দেবে যে, কখনো জাকির তার শরীরে কম্পন অনুভব করবে। এমনকি নিজের অনিচ্ছাকৃত হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র হয়ে যাবে। সে এক ধরনের শীতলতা ও আরাম বোধ করবে। সে যেনো অপবিত্রতার সকল বোঝা পেছনে ফেলে দিল। সুলতানুজ জিকিরের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি পাথর থেকে সজোরে জিকিরের আওয়াজ শোনতে পাবে।

ফায়দা ৪: শায়খ তার মুরীদের ছয় লতীফার জিকির এবং সুলতানুজ জিকিরের চর্চা এভাবে করাবেন যে, জিকির নিজের উদ্দেশ্যে মুরীদের দিকে তাওয়াজ্জুহসহ তার জন্যই করবেন। এসময় তিনি যা কিছু অনুভব করবেন, তা-ই হবে মুরীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার স্বরূপ।

ফায়দা ৫: সুলতানুজ জিকির আয়ত্তে আনার পর নফী ও ইয়াদ-দাশ্ত এর চর্চায় নিমগ্ন হবে। ইয়াদ-দাশ্ত এর মর্মকথা হলো, সর্বদা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ থাকা। ওঠা, বসা, খানা-পিনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কঠোরতা ও শিথিলতা ইত্যাদি কোন অবস্থায়ই এই মনোনিবেশে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবে না। যেভাবে কোন কাজের গুরুত্ব যদি অন্তরে থাকে, তখন অন্তর এই কাজটি যথাসময়ে আঞ্জাম দিতে নিমগ্ন থাকে। আর এটাই হলো ইয়াদ-দাশ্তের তাৎপর্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

-"তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, তোমার সামনেই তাঁকে পেয়ে যাবে।" (আহমদ : ২৪৪০, তিরমিযি)

এখন নফীর আলোচনা শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

-"আল্লাহ নভোগুল ও ভূগুলের জ্যোতি।" (নূর (২৪) : ৩৫)

এই আয়াত দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, নূরে ইলাহী সব জায়গায়ই আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের জ্ঞানশক্তি গাইরুল্লাহর কল্পনা-জল্পনা এবং আকর্ষণে মরিচাযুক্ত হয়ে গেছে, তাই সেই নূর উপলব্ধি করতে পারে না। তাই যাতে করে মানুষের জ্ঞান-শক্তি গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র হয়ে নূরে ইলাহী গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে, এজন্যই শুগলে নফীর আমল করা হয়। একটি আয়না যখন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়, তখন তাতে সূর্যের আলো প্রতিবিম্ব (ধারণ করা) হয়। আর আয়না যতো পরিষ্কার হবে, সূর্যের আলোও ততো স্পষ্ট দেখা যাবে। মানুষের জ্ঞানশক্তি যখন গাইরুল্লাহর অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবে তখন তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জালাল ও জামালের বিকাশ ঘটবে। এই শুগলের মধ্যে দু'টি বিষয় প্রয়োজনীয়: ১. সমস্ত জগতের নফী (বিলুপ্তি) এবং ২. নিজের অস্তিত্বের নফী (বিলোপ)। হযরত শায়খ মুদ্দাজিল্লুহু আলীর (হযরত ইয়াকুব বদরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি - অনুবাদক) ভাষ্য মতে, প্রথমে তামাম আলমকে নফী (বিলীন) করে 'লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ' এর মুরাক্বাবা করবে। অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্ব নেই- অস্তিত্বশীল শুধু আল্লাহ তা'আলা। সবকিছু মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের ছায়া। এই মুরাক্বাবায় যতো বেশী নিমগ্ন হবে, ততোই নফীর স্বচ্ছতা হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে। এই নফীর মুরাক্বাবা যদি সালিকের জন্য কঠিন হয় তাহলে 'লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা জরব দিবেন। ইনশাআল্লাহ এতে এই যোগ্যতা অর্জন হবে। এরপর নিজের অস্তিত্বের নফী করবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবকিছুকে বিলীন করে দিবে। কোন কিছুর অস্তিত্বের নফী করা যদি কঠিন হয় তখন লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ দ্বারা জরব লাগাবে। জাদুত তাক্বওয়াহ গ্রন্থে আছে, নবীন মুরীদের ক্ষেত্রে নফীর প্রভার বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কখনো বুক ও পেটের অবস্থানকে শূন্য মনে করবে, আর কখনো নিজেকে হাত-পাহীন মনে হবে। এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হলো, বুক ও পেটের মধ্যে একটি শূন্যস্থান ধারণা করবে। যেমন নাকি

তোপ থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়ে এখানে পড়ে স্থানটিকে শূন্য করে দিয়েছে। এরপর এই শূন্যস্থানকে আরো বিস্তৃত করতে থাকবে এবং এভাবে তা সমস্ত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। কখনো চতুর্দিকে আলোকোজ্জ্বল একটি কালো বৃত্ত দেখবে, এসময়ই নফীর পূর্ণ অবস্থা অনুভব করতে সক্ষম হবে। এটাকেই বলে 'নূরে নফী'। সারকথা, নফীর অনেক পদ্ধতি আছে। নিজের শায়খকে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেবে। যে পদ্ধতিই সহজবোধ্য হয় তার উপর আমল করে গাইরুল্লাহ থেকে একে পবিত্র করে নেবে। একমাত্র পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ হৃদয়েই আল্লাহ তা'আলার জামাল ও জালালের বিকাশ ঘটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

-"তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য তাতে পুত পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী; জ্যোতির উপর জ্যোতি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে।" (নূর (২৪) : ৩৫)

ফায়দা ৬: তালিব যখন সবকিছুর অস্তিত্বের নফী করে দেবে, তখন থেকে শুরু হবে নফীউন নফী ও ফানাউল ফানার শুগল। যে ধারণায় সে নফী করতো এই ধারণাকেও এখন নফী করে দেওয়া। তখনই অন্তর যাবতীয় কল্পনা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে এবং মাহবুবে ইলাহীর তাজাল্লি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠবে।

ফায়দা ৭: নফী এবং নফীউন নফীর চর্চা শেষ হয়ে গেলে, সালিক নূরের বিভিন্ন প্রকার আবরণ দেখতে পাবে। তখন তাকে বুঝতে হবে এগুলো মূলত মাহবুবে হাক্বিকীর পর্দাসমূহ। তাকে এগুলো ভেদ করে অগ্রসর হতে হবে। এ যাত্রাপথের সময় নির্ধারিত নয়। হ্যাঁ, আল্লাহর রাহমাত যদি সে পেয়ে যায় তাহলে এক মুহূর্তে অতিক্রম করে যেতে পারে। এটা চর্চা করার পদ্ধতি হলো তার সামনে যখন নূর প্রকাশ হবে, তখন কল্পনাশক্তিকে বিস্তৃত করে সসীম থেকে বের হয়ে অসীমের মধ্যে নিয়ে যাবে। সালিক তখন শুধু নূর আর নূরই অনুভব করবে। এক নূরের পর আরেক নূর অতিক্রম করে হিম্মাতের সাথে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবে, তিনি

যেনো তাকে আরেকটি নূর দেখিয়ে দেন। তখন এই নূরকে আরো বিস্তৃত করে তৃতীয় নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। নূরের এই ভ্রমণপথে সে 'সামাদিয়াতের' মুরাক্বাবাও করতে থাকবে। এর আলোচনা অচিরেই আসবে ইনশাআল্লাহ। এসব নূর অতিক্রম করে সে শেষ আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এটা হচ্ছে একটি সূক্ষ্ম রংহীন আবরণ। একেই বলে 'রংহীন নিসবত'। এই রংহীন নিসবত অতিক্রমের পর আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল হবে। আর এভাবেই সুলুকের প্রথম স্তরের সমাপ্তি ঘটবে। এখান থেকেই শুরু হবে সাইর ফিল্লাহ তথা সুলুকের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এসময় অনেক ভালো ভালো হাল (অবস্থা) এবং আশ্চর্য ধরনের মাক্বামের উদয় হবে। সাইর ফিল্লাহর মধ্যে মুরীদ যে অগ্রসরতা লাভ করবে, তা সে তার মুর্শিদকে জানাবে।

সারকথা, নফীউন নফীর পর অন্তর জামাল ও জালালের বন্ধু হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে এসব নূর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রকাশ পাবে। কিন্তু যখন কল্পনা শক্তির মাধ্যমে এসব অতিক্রম করে নেবে, তখন তার মধ্যে অবস্থাহীন এবং রংহীন সত্তার তাজাল্লি প্রতিফলিত হবে। সে তখন ধন্য হবে মুশাহাদার নিয়ামত দ্বারা। এটা এমন একটি দৌলত যার সামনে পৃথিবী ও এর মধ্যস্থ সবকিছু মূল্যহীন। এ অবস্থায় উপনীত হলে বান্দা তার বুদ্ধি ও ঈমানের চোখে কোন প্রকার রং, অবস্থা এবং দিক ছাড়াই তার প্রভুকে দেখতে পাবে। এরকম দেখাকে মুশাহাদা বলা হয়। মুশাহাদার মর্মকথা হলো, কোন প্রকার রং ও অবস্থান ছাড়াই বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর তাজাল্লি ও হুজুরী অনুভব করা। এই অনুভব তার ঈমানের চোখ দিয়ে করতে পারবে। মুশাহাদার স্বাদ ও স্বরূপের বর্ণনা খুব কঠিন। শুধু এটুকু বলে রাখি, মানুষ যেমন তার আত্মা বা রূহের জ্ঞান রাখে, মুশাহাদার অবস্থায় আল্লাহর হুজুরীও সে অনুরূপভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তার আত্মার আত্মায় পরিণত হন। আইনুল ইয়াক্বীন দ্বারা মুশাহাদার সূচনা আর এর শেষ হলো হাক্কুল ইয়াক্বীনের মধ্য দিয়ে। তার হৃদয়ের মধ্যে মাহবুবের জামাল ও জালাল ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র মাহবুব ছাড়া অন্য কোনকিছুর দিকে দৃষ্টিপাত তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

"বন্ধুর ক্রন্দন যখন হৃদয়ের কল্পনায় পরিণত হয়; তখন হাঁটে-ঘাটে, বাজারে কেবল বন্ধুর মুখশ্রীই দৃষ্টিতে ভেসে আসে।"

"আমি হলাম তোমার, তুমি হও আমার। আমি হলাম দেহ, তুমি হও আত্মা। আর যেনো বলা ন হয় তুমি-আমি ভিন্ন।"

"হুজুরী অর্জন হয় যদি তোমার বাসনা, তবে তার সামন থেকে অদৃশ্য হয়ো না। সাক্ষাৎ হবে যখন মাহবুবের, ছোড়ে দাও মায়াজাল এ জগতের।"

কিতাবের শুরুতে ইলমুল ইয়াক্বীন, আইনুল ইয়াক্বীন এবং হাক্কুল ইয়াক্বীনের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কোন কোন বুজুর্গের মতে হাক্কুল ইয়াক্বীনের অর্থ হলো মু'আয়ানা (প্রত্যক্ষ দর্শন)। তাদের মতে কাশফের অর্থ হলো আল্লাহর গুণাবলীর মর্ম প্রকাশ হয়ে যাওয়া।

ইলমে মুকাশাফার মর্ম হলো, সত্যপথে বিচরণ এবং ইখলাসের সাথে প্রতিটি কাজকর্ম করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে হৃদয়ে একটি আলো সৃষ্টি হওয়া। তখন সে আল্লাহর যাত ও সিফাত এবং পরকাল দিবসের বিষয়াদি অনুভব করতে সক্ষম হয়। যেগুলোর কথা এই আয়াতে কারীমে এসেছে:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

-"যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।" (বাক্বারাহ (২) : ৩)

কুরআন ও হাদীসের সুকঠিন দুর্বোধ্য মর্ম-রহস্য সালিকের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নূর যতো শক্তিশালী হবে বস্তুর হাক্বিকাতও ততো বেশী স্বচ্ছ হবে। ইলমে মুকাশাফাকে ইলমে ওয়ারাসাতও বলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের উপর আমল করবে আল্লাহ তাকে অজানা বিষয়ের জ্ঞান দান করবেন"। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

-" তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।" (আনফাল (৮) : ২৯)

আল্লাহই পথপ্রদর্শক এবং তিনিই তাওফিকদাতা।

মুরাক্বাবা অধ্যায়

একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে মুরাক্বাবা বলে। বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লালন-পালন ও করুণার দৃষ্টি সব সময়ই আছে। তাই আল্লাহর প্রতি বান্দার মনোনিবেশও একান্ত জরুরী। এ আধ্যাত্মিকপূর্ণ মনোনিবেশকেই বলে 'মুরাক্বাবা'। প্রথম পর্যায়ে কৃত্রিমভাবে মুরাক্বাবা করতে হয়। জিকিরের মধ্যে এ কথার কল্পনা করা, আমি সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞাত সত্তার সামনে বসেছি। নামাযের মধ্যে একথা কল্পনা করা, আমি যে সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছি তিনি আমার বাতিন ও জাহির এমনকি অন্তরের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কেও অবগত আছেন। মুরাক্বাবার পর যখন মুশাহাদা অর্জন হয় তখন এই কৃত্রিমতা উঠে যায়। বান্দা ও মাওলার মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যে রকম সম্পর্ক তার শরীর ও আত্মার মাঝে। যেমন নাকি আল্লাহ তা'আলা তার প্রাণের প্রাণে পরিণত হয়ে যান।

মুশাহাদার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হুজুরির যে দৃশ্য হয়, তা যতই পরিষ্কার হউক না কেন, এই আকৃতিকে কখনো আল্লাহর সত্তা বলা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গ এই আকৃতিকে আল্লাহর সত্তা বলেছেন, আর কেউ এটাকে 'হুলুল' ও 'ইত্তিহাদ' বলেছেন। তত্ত্ববিদদের মতে এ মতবাদ ঠিক নয়। একটি স্বচ্ছ আয়নার মধ্যে সূর্যের আকৃতি তো দেখা যায়, কিন্তু এটাকে সূর্য বলা যাবে না। মাত্র এক হাত আয়নার মধ্যে পৃথিবীর চেয়ে ষোল লক্ষ গুণ বড় সূর্যের সংকুলান কিভাবে সম্ভব হবে? গোটা পৃথিবীসহ আরো যত গ্রহ উপগ্রহ আছে এসব হল সূর্যের আলোর উদয়স্থল। এখন হয়ত বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে। আসলে আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লির মাকামের কোন হিসাব নেই। আমরা অধমদের হৃদয়কে তিনি যে তাজাল্লির নীড় বানিয়েছেন এজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

কোন কোন বুযুর্গদের মতে ইত্তিহাদপন্থিদের 'আনাল হক' (আমি আল্লাহ অর্থে) আর ফিরাউনের أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে কেউ এটাকে হালতে ফানার মধ্যে ধরে নিয়েছেন। তাও ঠিক নয়। কারণ ফানার অবস্থায় হক্বের মধ্যে 'আমিত্ব' একদম বিলীন হয়ে যায়, আর এখানে এর উল্টো হচ্ছে অর্থাৎ 'আমিত্বে'র মধ্যে 'হককে' বিলীন করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এ বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা এভাবে করতে পারি, এখানে হক শব্দটি আল্লাহর সত্তা অর্থে নয়। বরং 'বাতিল ও অসত্যের' বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য। অথবা আমরা বলবো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে

তিনি এটা বলেছেন, আর জ্ঞান ফিরে আসার পর তাওবাহ করেছেন। আল্লাহই একমাত্র পথপ্রদর্শক। (উল্লেখ্য হযরত মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত মশহুর কথাটি একটি কবিতায় বলেছিলেন। 'আনাল হাক্ব' কথাটি তিনি কেনো এবং কোন অবস্থায় বলেছিলেন এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে যা বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এখানে লেখকের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ভাবার কোন জো নেই। -অনুবাদক)

মুরাক্বাবার বিভিন্ন প্রকার

কাওলুল জামিল এবং যাদুত-তাকওয়ার মধ্যে আছে, মুরাক্বাবার মর্ম হল নিজের জ্ঞান শক্তিকে আল্লাহর দিকে এমনভাবে মনোনিবেশ করা যে, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই মনোনিবেশের অনুগামী হয়ে যাবে। সে মনে করবে আমি অনুভবহীন জিনিসের অনুভব করছি। এই অনুভূতি আসা মাত্রই মুরাক্বাবা তার জন্য সহজ হয়ে গেল। আল্লাহর হুযুরির মুরাক্বাবা, নফী বা ইয়াদ-দাশতের মুরাক্বাবা, ওয়াহদানিয়াত এবং সামাদিয়াতের মুরাক্বাবা সবগুলোর মধ্যে এই পদ্ধতিই প্রজোয্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

-"তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁকে তুমি সামনে পেয়ে যাবে।" (আহমদ : ২৪৪০, তিরমিযি) অর্থাৎ আল্লাহর মুরাক্বাবা করতে থাকো, এতে তুমি তাঁর মুশাহাদা লাভে ধন্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

-"ইহসান হলো, এভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি দেখতে না পাও তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।" (সহীহ বুখারী : ৪৮ ও মুসলিম) এই হাদীসের মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমুল ইহসানকে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন: মুরাক্বাবা এবং মুশাহাদা। 'তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো' এর অর্থ হলো মুশাহাদা আর 'তিনি তোমাকে দেখছেন' এর মর্ম হলো মুরাক্বাবা। মুশাহাদার মাধ্যমে ইবাদত আদায় হলেই ইহসানের পূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি হয়। আর মুরাক্বাবার মাধ্যমে হলে ইহসানের অপূর্ণতা থেকে যায়। আবিদ তখন অন্তর চোখ দিয়ে মাহবুবের উপস্থিতি দেখে, যেনো বাহ্যিক

চোখ দিয়েই দেখছে। যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয়, মাহসুসে ইদ্দিআই - দাবীসূলভ অনুভূতি। আবিদ যখন নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থানকে মাহবুবের সামনে উপস্থিত মনে করবে- তখনই তা হবে মুরাক্বাবা। মুশাহাদা এবং মুরাক্বাবা উভয় অবস্থায়ই মাহবুবকে অতুলনীয় নিরাকার এবং আকৃতিহীন দেখবে। কিন্তু আবিদ সর্বাবস্থায় আকৃতিধারী অবস্থায় থাকে। হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীর মধ্যে বলেন, "ইবাদাতের মধ্যে ইহসানের অর্থ হলো, তাতে অনুনয়-বিনয় সৃষ্টি করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'টি অবস্থার দিকে ইশারা করেছেন, এর মধ্যে মুশাহাদা হলো উচ্চ স্তরের। আর মুরাক্বাবা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের। ... অতঃপর তিনি বলেন, এই যোগ্যতা অর্জন করাই হলো দ্বীনের একটি মূল ভিত্তি। এটাই হলো সিদ্দীকিন, সালিকীন এবং আরিফীনের খুঁটি।"

মুরাক্বাবা

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

-"তোমরা যেখানেই তিনি তোমাদের সাথে আছেন।" (তাওবাহ (৯) : ৪০)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

-"আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (তাওবাহ (৯) : ৪০)

উল্লেখিত দু'টি আয়াতের মধ্যে যে কোন একটির মর্মের দিকে ধ্যান করা ও এতে ডুবে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ এতে আল্লাহর হুজুরী অর্জন হবে।

মুরাক্বাবা

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

-"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" (আর-রাহমান (৫৫) : ২৬-২৭)

এই আয়াতের মর্মের মধ্যে খুব ধ্যান করা এবং তাতে ডুবে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা কল্পনাশক্তি থেকে বস্তুচিন্তা দূর হবে এবং অন্তরে আল্লাহর তাজাল্লি পয়দা হবে।

মুরাক্বাবা

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى

-“সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?” (আলাক্ব (৯৬) : ১৪)

এই আয়াতের উপর গভীর ধ্যান করা ও তাতে ডুবে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ এতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে সে ধন্য হবে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি দৃঢ় হবে। মনে হবে মাহবুবের সামন থেকে অদৃশ্য হওয়া কঠিন ব্যাপার। এভাবে (الخبير اللطيف) ‘আল-লাতীফুল খাবীর’, (الله الصمد) ‘আল্লাহুস-সামাদ’, (احد الله) ‘আল্লাহু আহাদ’, (الله) ‘আল্লাহ’ এবং (لا اله إلا هو الحي القيوم) ‘লা-ইলাহা ইল্লা হুআল হাইউল কাইউম’ ইত্যাদির মর্মার্থের দিকে পূর্ণ খিয়াল দিয়ে মুরাক্বাবা করা। এছাড়া যাতে মুজাররদেরও মুরাক্বাবা করা। মুরাক্বাবার মধ্যে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়: ১. অন্তরকে সর্বপ্রকার কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র করা এবং সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতার সামনে আমি বসে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন এরূপ অনুভূতি রাখা। ২. মুরাক্বাবার মধ্যে বেশী সময় ব্যয় করা।

টীকা: সালিকের মধ্যে কবজ ও বসত, উভয় গুণই পরিলক্ষিত হতে পারে। কবজের অবস্থায় মুরাক্বাবা কঠিন, এতে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তাই সালিককে কবজের সময় বসতের সময় থেকে বেশী মুরাক্বাবা করতে হবে। তাকে মনে করতে হবে, আমার কাজ হচ্ছে মুরাক্বাবা করা- তাতে যদি কোন স্বাদ পাওয়া যায় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার দান। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পুরস্কার দিয়ে এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। যে বান্দা কেবল পুরস্কার পেলেই মাহবুবের অনুসন্ধান করে, সে তো তাঁর কোন কাজের নয়। তাই যে ব্যক্তি উভয় অবস্থায় মাহবুবের অনুসন্ধান করবে সে-ই হলো প্রকৃত বান্দাহ এবং প্রকৃত আশিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

-"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে; যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত; এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।" (হিজর (২২) : ১১)

ফায়দা ১: মুরীদের জন্য উচিৎ হলো মুশাহাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে বেশী ধ্যান করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

"তোমরা স্বাদ কর্তনকারী মৃত্যুর কথা বেশী করে স্মরণ করো।" (তিরমিযি : ২৩০৮, আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান) এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এভাবে মুরীদ যেনো তার আমলের মুহাসাবা (হিসাব-নিকাশ) করে। এটা তার জন্য খুবই উপকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

-"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা; আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই অবাধ্য।।" (হাশর (৫৯) : ১৮-১৯)

ফায়দা ২: মুরীদের জন্য উচিত হলো, বেশী বেশী করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ও শোনা। শ্রবণ ও পঠনের মধ্যে মুহাব্বাত পোষণ করবে। কোন কোন বুজুর্গ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকে আম্বিয়ায়ে কিরামের সুলুক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অধম এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র আরবী গ্রন্থ রচনা করেছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে, বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এর উপর সবিস্তর আলোচনা করবে (দ্বিতীয় খণ্ডটি তিনি রচনা করেছিলেন কি না তা জানা যায় নি - অনুবাদক) এখানে জাদুত-তাকওয়া থেকে তিলাওয়াতের কয়েকটি আদব তুলে ধরছি।

তিলাওয়াতের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে পাঠক অন্তর দিয়ে একথা মনে করবে, আমি আল্লাহর সামনে বসেছি। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, পাঠক ভাববে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলছেন। তৃতীয় স্তর হলো, পাঠক আল্লাহর কাজ কর্মের মুশাহাদা করতে থাকবে। এই তৃতীয় অবস্থাই হলো সিদ্দীকদের বৈশিষ্ট্য। আর প্রথমোক্ত দু' অবস্থা হলো আসহাবুল ইয়ামীনের বৈশিষ্ট্য। এ তিন অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থা হলো গাফিলদের বৈশিষ্ট্য।

ফায়দা ৩: সুলুকের মধ্যে পা যখন অটল হয়ে যায়, হৃদয়ে আল্লাহর নিসবত সৃষ্টি হয় এবং একমাত্র আল্লাহই সালিকের প্রাণের প্রাণ হয়ে যান- তখন আল্লাহ এই সালিকের হৃদয়কে তাঁর আসমায়ে হুসনার তাজাল্লির দর্পণে পরিণত করেন। আসমায়ে হুসনা অনন্ত-অনাদি আর মাহবুবের অবস্থারও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই তাঁর উদয়ও অসীম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن لله أنية في أرضه وإن أنية اللهِ فِي أَرْضِهِ قلوب عباده الصالحين

-"নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একটি পাত্র আছে, আর এটিই হলো সৎ বান্দাদের হৃদয়।" (আহমদ) সুফিয়ায়ে কিরাম রাহিমাহুমুল্লাহর ভাষায়, এটা হচ্ছে সুলুকের দ্বিতীয় স্তর। যাকে বলা হয় সাইর ফিল্লাহ (আল্লাহতে ভ্রমণ)। এই সুলুকের শর্ত হলো, আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ মুহাব্বাত। আর এর আত্মা হচ্ছে, সঠিকভাবে আল্লাহর সাথে লেনদেন করা। এর স্তম্ভ হলো দু'টি: ১. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং ২. প্রতিটি কাজকর্ম, নড়াচড়া এবং নীরবতায় পরিপূর্ণ ইখলাস অবলম্বন করা। এর শেষ স্তর হলো, মাহবুবের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর উপাসনা সঠিকভাবে সম্পাদন করা। এটাকে বলে 'ইস্তিক্বামাত ফিশ-শারীয়াহ' আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

-"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।" (ফুসসিলাত (৪১) : ৩০)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।” (আহক্বাফ (৪৬) : ১৩)

আল্লাহর ইচ্ছা হলে দ্বিতীয় খণ্ডে তাসাওউফের অবশিষ্ট মাক্বাম ও সাইর ফিল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো (দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় নি- অনুবাদক) এখানে জগতখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মা'আনী থেকে কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করে নেবো।

ইমাম আল্লামা সাইয়্যিদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামে রাব্বানীর কথা নকল করে বলেন, “ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, শরীয়তের তিনটি স্তর আছে: ইলম, আমল এবং ইখলাস। এগুলো ছাড়া শরীয়তের কোন বাস্তবতা নেই। শরীয়ত যদি বাস্তবায়ন হয়ে যায় তবে তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে গেলো। ইহ-পরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ সৌভাগ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। সমস্ত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো শরীয়ত। সুফিয়ায়ে কিরাম তরীকত ও হাক্বিকাতের যে ভিন্ন রূপদান করেছেন তা মূলত ইখলাসের পূর্ণতা সাধনে শরীয়তের সহায়ক। তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে পথ আছে, হোক সেটা নুবুওয়াত বা ওলায়েতের নৈকট্যের পথ, এগুলো কেবল শরীয়তের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে। এই শরীয়তের পথেই আল্লাহর রাসূল দাওয়াত দিয়েছিলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

-“বলে দিন: এই আমার পথ, আল্লাহর দিকে বুঝে সুজে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (ইউসুফ (১২) : ১০৮)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ

-“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন।” (ইমরান (৩) : ৩১)

এসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হয় শরীয়ত ছাড়া সব রাস্তাই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। শরীয়ত যে পথকে প্রত্যাখ্যান করে, তা জিন্দিকিয়াত ছাড়া আর কী হতে পারে? প্রমাণস্বরূপ বলা যায়,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

-"আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া? সুতরাং কোথায় ঘুরছ?।" (ইউনুস (১০) : ৩২)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

-"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।" (আলে ইমরান (৩) : ৮৫)

এছাড়া হাদীসের মধ্যে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে মাঝখানে একটি রেখা টেনে আলাদা করে দেন। ... জেনে রাখুন, সুফিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সুলুকের শেষ সীমার মধ্যে নিহিত। আর এটা হলো শরীয়তেরই জ্ঞান- অন্য কোন জ্ঞান নয়। তবে যাত্রাপথে আরো অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, কিন্তু এগুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। এটাই হচ্ছে শরীয়তের ইলম, যা উলামায়ে কিরাম ধারণ করে রেখেছেন। তবে উলামায়ে কিরামের ইলমকে বলা হয়, চিন্তা ও দর্শন এবং আউলিয়ায়ে কিরামের ইলমকে বলে অন্তর্দৃষ্টি।"

আমাদের চিশতিয়া বুযুর্গদের আমল ও শুগল

তের তাসবিহ: দু'শ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া। লা বলার সময় লতিফায়ে ক্বালব থেকে মাথা ঘুরিয়ে ডানদিকে ইলাহা বলে ইল্লাল্লাহ দ্বারা ক্বালবে জরব দিবে। এরপর ইল্লাল্লাহ দ্বারা ক্বালবে জরব দিবে, মোট ৪শ বার। এরপর ৬ শতবার 'আল্লাহু আল্লাহ' জোরে জোরে পাঠ করা, এবং ক্বালবে জরব দিতে থাকা। এরপর একশ বার 'আল্লাহ' পাঠ করা, এবং ক্বালবে জরব দিতে থাকা। শেষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' ও দরূদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করা। এরপর ক্রমান্বয়ে পাস-আনফাস, সুলতানুল-আজকার ও মুরাক্বাবাসমূহ করতে থাকা। তরীকতের জিকির আদায়ে কামিল শাইখের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান খুবই জরুরী। তাই এসব

জিকির ও শুগল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তাছাড়া নকশবন্দিয়া এবং চিশতিয়া জিকির-শুগলের মধ্যে বেশ কোন পার্থক্য নেই। তের তাসবীর মধ্যে যে পার্থক্য ছিলো তা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে শুগলে আর-রাহ করা যেতে পারে। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'যিয়াউল কুলুব' গ্রন্থে জিকির-শুগল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। এখানে কাদিরীয়া তরীকার কিছু জিকির-শুগলের আলোচনা করে বিষয়টির ইতি টানছি।

(سميع الله) 'আল্লাহু সামিউন' দ্বারা লতীফায়ে নফস থেকে লতীফায়ে সির পর্যন্ত; (بصير الله) 'আল্লাহু বাছিরুন' দ্বারা লতীফায়ে সির থেকে লতীফায়ে আখফা পর্যন্ত; (قدير الله) 'আল্লাহু কদীরুন' দ্বারা লতীফায়ে আখফা থেকে চতুর্থ আসমানের উপর পর্যন্ত; এরপর (عليم الله) 'আল্লাহু আলীমুন' দ্বারা চতুর্থ আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা বা আরশে আজীম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত প্রতিটি জোড়া শব্দের মধ্যে অন্তরের খিয়াল ঠিক রাখা এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে একেকটি মনজিল অতিক্রম করা। আর এভাবেই শাইখ তার মুরীদকে উল্লেখিত স্তরসমূহে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করাবেন। ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুত আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন হবে।

মুহাব্বাতের অন্যান্য আলামত

চতুর্থ আলামাত: নীরবে নিভৃতে আল্লাহর সাথে বাতচিত এবং ধ্যানের স্বাদ পাওয়া। তাঁর দরবারে অনুনয়-বিনয়ের সাথে ভিক্ষা চাওয়া সবচেয়ে বেশী তৃপ্তিকর মনে হবে। তাঁর কালামে পাকের সাথে এক অদ্ভুত ভালোবাসার জন্ম নেবে। কালামে পাকের পঠন ও শ্রবণে হৃদয়ে প্রশান্তি বর্ষণ হবে, আর চোখযুগল অশ্রুসিক্ত হবে। অনুভব হবে ঈমান ও ইয়াকীনের দীপ্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون

-"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর, আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন

তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।” (আনফাল (৮) : ২)

اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

-“আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, বারবার পঠিত, এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (জুমার (৩৯) : ২৩)

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

-“আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।” (মায়িদা (৫) : ৮৩)

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

-“যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা’আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে! আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিšতা-ভাবনা করে।” (হাশর (৫৯) : ২১)

হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তরজমায়ে কুরআনের টীকায় তিনটি কবিতা লিখা আছে:

"বিদআতের গান শোনে তোমরা আজ বধির, হৃদয় তোমাদের হয়েছে স্বাদহীন। যে গানে পাহাড় ভয়াতুর প্রকম্পিত, তোমাদের প্রাণে যদি না লাগে তার ছোঁয়া. তাহলে তোমরা বড়ই দুর্ভাগা।"

এ ব্যাপারে লেখকের একটি স্বতন্ত্র আরবী গ্রন্থ আছে। আশা করছি তা অচিরেই প্রকাশ কবর। এখানে হাফিজ ইবনে তাইমিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৫ নং পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য বিষয়টির ইতি টানছি। তিনি বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম কোন কোন সময় একত্র হয়ে তাঁদের কোন একজনকে তিলাওয়াত করতে বলতেন আর সবাই শুনতে থাকতেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলতেন, 'হে আবু মূসা! তুমি আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও'। তখন তিনি তিলাওয়াত করতেন এবং সবাই তা শোনতেন। কোন কোন সাহাবী বলতেন, এসো আমরা বসি এবং আমাদের ঈমানকে নতুন করি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সাথে কয়েকবার জামাআতের সাথে নফল নামায পড়েছেন। একবার আহলে সুফফায় এসে দেখলেন, একজন পাঠক কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন, তিনি তখন তাঁর পাশে বসে তা শ্রবণ করতে থাকেন। কুরআন শরীফ শ্রবণ এবং অন্যান্য জিকিরের সময় অন্তরে যে ভয় সৃষ্টি হয়, চোখ অশ্রু সজল হয় এবং শরীরের মধ্যে যে কম্পন আসে, কুরআন এবং সুন্নাহ মুতাবিক এগুলো মূলত খুবই উত্তম গুণ। তাই একথা বলা যায়, কুরআন তিলাওয়াত-শ্রবণের মধ্যে অন্তরের পরিশুদ্ধি নিহিত"।

পঞ্চম আলামাত: আল্লাহর মুহাব্বাতের পঞ্চম আলামাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভালোবাসা। হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

-"কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তানাদি, বাবা এবং সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হয়েছি।" (সহীহ বুখারী : ১৪) সহীহ বুখারী শরীফে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে, "সুপ্রতিষ্ঠিত ঈমান লাভের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতে হবে"। কুরআন শরীফে আছে,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

-“নবী মু’মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।” (আম্বিয়া (৩৩) : ৬)

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্তকরণে আমি বাধ্য।

টীকা ১: সমস্ত উলামায়ে কিরামের মতে এখানে মুহাব্বাত দ্বারা যৌক্তিক মুহাব্বাত উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, হৃদয়ে যদি মাহবুবের উপস্থিতি চিরন্তন হয়ে যায়, তখন এই ভালোবাসা স্বাভাবিক রূপে পরিণত হয়। এ অবস্থা অর্জন হয়ে গেলে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতার কোন প্রশ্নই আসে না। এরূপ বৈশিষ্ট্যই ছিলো সাহাবায়ে কিরামের এবং এটাই হচ্ছে আউলিয়ায়ে কিরামের শান। তাঁরা শহীদ হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, মার খেয়েছেন কিন্তু শরীয়তের কোন ক্ষতি বরদাশত করেন নি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের বন্ধুদেরকে আপনি এই নিয়ামত দান করুন। আ-মিন।

টীকা ২: মূল মাহবুব হলেন আল্লাহ তা’আলা। দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাব্বাত করতে হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কারণ, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পথপ্রদর্শক। তৃতীয় পর্যায়ে মুহাব্বাত করতে হবে উলামা এবং সৎ লোকদেরকে যারা আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। এরপর নিজের পূর্বপুরুষ, উত্তরপুরুষ এবং আত্মীয়স্বজনদের যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তাদেরকে মুহাব্বাত করা। এটা হলো চতুর্থ পর্যায়। এসব হলো শরীয়তের আওতাধীন মুহাব্বাত। তাছাড়া সালিকের হৃদয়ে হাল-স্বরূপ আরেকটি মুহাব্বাতের সৃষ্টি হবে যা তার জন্য খুবই উপকারী। যেমন, কোন উদ্বিগ্ন এবং নিঃস্ব মানুষকে দয়া করা- কারণ, সে আমার মাহবুবেরই সৃষ্ট। সহীহ বুখারীর মধ্যে আছে একজন মহিলা কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহর মাগফিরাত লাভে ধন্য হোন।

টীকা ৩: যে মুহাব্বাতের সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে নয়, এ মুহাব্বাত সালিকের জন্য এক বিষধর ঘাতক।

মুহাব্বাতের ষষ্ঠ আলামাত: আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ হলো মুহাব্বাতের ষষ্ঠ আলামাত। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মায়িদা (৫) : ৫৪)

সময়ের চাহিদা হলো এ ব্যাপারে একটি গ্রন্থ রচনা করা। কিন্তু প্রকাশনার খরচ বহন আমার জন্য বেশ কঠিন। আর এ জন্য অত্র গ্রন্থেরও পরিসমাপ্তি করতে বাধ্য হয়েছি। আল্লাহর উপর ভরসা করে সামান্য আরো একটু আলোচনা করছি।

উলামায়ে কিরামের ইজমা হলো, মু'মিনের ভালোবাসা এবং শত্রুতা উভয়ই একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ

"একামত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং শত্রুতা পোষণই হলো ঈমানের সুদৃঢ় রজ্জু।" (আহমদ : ১৭৭৯৩) অন্য হাদীসে আছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

-"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে বা শত্রুতা পোষণ করবে, দান করবে এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ

مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

-"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল; জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (মুজাদালাহ (৫৮) : ২২)

অর্থাৎ এসব লোককে আল্লাহ তা'আলা গায়িব থেকে সাহায্য করবেন, তাদেরকে নূর দেবেন, তারা তাদের আত্মায় অনুভব করবে এক নতুন জীবন। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের প্রাণের প্রাণ হয়ে গেলেন। তারা আল্লাহর বিরোধী ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের বন্ধুত্ব পোষণ করেন না, হোক তারা তাদের বাবা বা সন্তানাদি। তারা ঈমানে তাহক্বিকী লাভে ধন্য হবেন। এটাই ছিলো সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য। উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরাম এ পথই অবলম্বন করেন। কোন কাফির-মুনাফিক, জিন্দিক, বিদআতী, পাপাচারী এবং জালিমের সাথে বন্ধুত্বপোষণ করেন না। আর না তাদের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের কোন প্রকার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

-"আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না, নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই, অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।" (হূদ (১১) : ১১৩)

আয়াতের মর্মার্থ হলো, তাদের সাথে ওঠাবসা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও গুণগান গাওয়া এবং তাদের সর্বপ্রকার সামঞ্জস্যতা থেকে সাধ্যানুযায়ী বেঁচে থাকতে হবে। (সূত্র: হাশিয়ায়ে তরজমায়ে কুরআন- হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলুসী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রুহূল

মাআনীতে বলেন, “তোমরা যালিমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না। এখানে ‘যালিম’ দ্বারা মুশরিক উদ্দেশ্য। অনুরূপ কথা ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণনা করেছেন। ঝুঁকে পড়াকে কেউ কেউ অন্তরের ঝুঁকে পড়া বলেছেন। অন্যরা এটাকে আরো ব্যাপকার্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে সম্মান করা, তাদের সাথে ওঠাবসা করা। হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আমি যালিমদের জন্য সেলাই করি। এতে কি তাদের সাহায্যকারী হবো? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তুমিও যালিম। এমনকি যে তোমাকে সুই দিয়েছে সে-ও এক যালিম। আবু আহমদ একজন ইমামের পেছনে নামায পড়ছিলেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কারণ ইমাম সাহেব উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে বেহুশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত যালিম তার অবস্থা কী হবে? আমি সেটা ভাবছিলাম।”

যুলুম সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস ও বুজুর্গদের উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-“কিয়ামতের দিন অত্যাচার অন্ধকারে রূপ লাভ করবে।” (সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি) আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

رَوَى عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের জন্য অত্যাচার- নিপীড়ন হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও এটা নিষিদ্ধ করছি। তাই তোমরা একে অন্যকে নিপীড়ন করো না।” (মুসলিম : ৪৬৭৪, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ) হযরত

আবু মূসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"আল্লাহ একজন যালিমকে শিথিলতা দান করেন কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের আর্থিক নিপীড়ন করে থাকে, সে যেনো ঐ দিন আসার আগেই তা পরিশোধ করে দেয়, যেদিন তার কাছে কোন দীনার কিংবা দিরহাম থাকবে না। তার যদি কোন সৎ কাজ থাকে, অত্যাচারের মাত্রানুযায়ী তা কেটে নেওয়া হবে। আর যদি সৎ কাজ না থাকে, তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপাচার তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী) হযরত মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"তুমি উৎপীড়িত ব্যক্তির বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকো কারণ, এ বদদু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম) হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنْ اللهِ بُعْدًا

"যে ব্যক্তি জঙ্গলে থাকে সে কঠোর হয়ে যায়, যে শিকার করে সে উদাসীন হয়ে যায়, যে রাজা-বাদশাহর দুয়ারে আসা-যাওয়া করে সে পরীক্ষায় পতিত হয়- যতো বেশী সে বাদশাহর নিকবর্তী হবে ততো বেশী সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে।" (আহমদ : ৮৪৮১, আবু দাউদ নাসাঈ, তিরমিযি- ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে) কাব ইবনে উজরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার পরে কিছু শাসকের আগমন হবে যারা আমার হিদায়াত ও সুন্নাতের অনুসরণ করবে না। যে ব্যক্তি তাদের কাছে গিয়ে তাদের অত্যাচারে সহযোগিতা করবে, তাদের মিথ্যার সত্যতা প্রদান করবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর আমিও তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সে হাউজের কাছে আসতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে যায় নি, তাদের নিপীড়নে কোন সাহায্য করে নি, তাদের মিথ্যার উপর কোন সত্যতা প্রদান করে নি, সে আমার দলের আর আমিও তার দলভুক্ত। অচিরেই হাউজে কাওসারের কাছে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে।" (আহমদ, ইবনে হিব্বান, তিরমিযি, নাসাঈ) এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম থেকে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا

-"আমার উম্মাতের একদল মানুষ দ্বীনের শিক্ষার্জন ও কুরআন পাঠ করবে। তারা বলবে, আমরা শাসকদের কাছে এসে পার্থিব ক্ষেত্রে লাভবান হই কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি। কিন্তু এটা সম্ভবপর নয় কারণ, কাটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে কাটা ছাড়া আর কিছুই মিলে না। তাই ওদের সান্নিধ্য থেকে পাপ ছাড়া আর কী মিলবে?" (ইবনে মাজাহ : ২৫১) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ

"আমি আমার উম্মাতের জন্য বাকপটু মুনাফিককেই বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি।" (আহমদ : ১৩৭) হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا ، أما المؤمن فيحجزه إيمانه ، وأما المشرك فيقمعه كفره ، ولكني أتخوف عليهم منافقا ، عالم اللسان ، يقول ما يعرفون ، ويعمل ما ينكرون

"আমি আমার উম্মাতের জন্য মু'মিন কিংবা মুশরিককে ভয় করি না। মু'মিনকে তার ঈমানই রক্ষা করবে। আর মুশরিককে তার কুফর উপড়ে দেবে। কিন্তু বাকপটু মুনাফিককে বেশী ভয় করি। সে এমন কথা বলবে যা তোমরা জানো না। এমন কাজ করবে যা তোমরা অপছন্দ করো।" (তাবারানী : ৭২৬৫) হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ، وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ، وأسخط عليه الناس

-"মানুষের অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করেও যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ নিজে তার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি উপেক্ষা করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ নিজেও তার উপর অসন্তুষ্ট হোন এবং মানুষকেও তার প্রতি নারাজ করে দেন।" (ইবনে হিব্বান, তিরমিযি) হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أرضى سلطانا بسخط ربه عز وجل خرج من دين الله تبارك وتعالى

-"যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোন শাসকের সন্তুষ্টি কামনা করে সে আল্লাহর দ্বীন থেকে বহি®কৃত হয়ে যায়।" (হাকিম) এ সম্পর্কে আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ তারিক ইবনে শিহাব বাজালী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

-"জনৈক ব্যক্তি জিহাদে বের হওয়ার সময় আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলো, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।" (নাসাঈ : ৪১৩৮) এ সম্পর্কেও সাহাবায়ে কিরাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন তাদের উলামা তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তা বর্জন করলো না। তখন আলিমরাও তাদের মজলিসে উঠাবসা এবং তাদের সাথে পানাহার শুরু করলো। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিলেন। দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদের উপর লানত বর্ষণ করলেন। কারণ তারা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করেছে।" (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

-"আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শোনেছি, মানুষ যদি কোন অত্যাচারীকে দেখেও তাকে পাকড়াও করে না, অচিরেই আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে বেষ্টন করে দেবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযি : ২০৯৪, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, আহমদ) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم

-"যখন তুমি দেখবে আমার উম্মাতের লোকজন, কোন যালিমকে 'হে যালিম' বলতেও ভয় পায়, তখন তুমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে।" (হাকিম)

বিশেষ আলোচনা

“পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম পেশ করছি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি। হে আল্লাহ! হে ক্ষমতাধর! হে মহাপরাক্রমশালী! হে মহাবিজ্ঞানী! যালিম ও শত্রুদের মুকাবিলায় আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ সাহায্য করুন। তাদের সামনে আমাদেরকে পরাজিত করুন না। আমাদের মুকাবিলায় কোন যালিমকে আপনি সাহায্য করুন না।”

ইহইয়ায়ে উলূম ও ইতহাফ থেকে কিছু আহরিত বাণী

জেনে রাখো, ইলম ও উলামা সম্পর্কে অনেক আয়াত এবং হাদীস এসেছে। এসব আলিম দ্বারা নিঃসন্দেহে আখিরাতমুখী আলিম উদ্দেশ্য। দুনিয়ালিপ্সু আলিমরা তো ‘আলিমে সু’। তাদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীস থেকে অনেক শাস্তির বার্তা এসেছে। তাই দুনিয়ালিপ্সু উলামা এবং আখিরাতমুখী উলামার মধ্যকার পার্থক্যকারী আলামত ও পরিচয় চিনে নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

আলিমের সর্বনিম্ন স্তর হলো, সে তার জ্ঞান দ্বারা দুনিয়াকে তুচ্ছ এবং নশ্বর মনে করবে। সে পরকালীন জীবনকে চিরস্থায়ী জানবে। সে বুঝবে ইহ-পরকাল বিপরীতমুখী দু’টি জীবন। যেমন দু’ সতীন। একজন সন্তুষ্ট হলে অপরজন অসন্তুষ্ট হবেই। আখিরাতমুখী আলিমদের অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য তারা রাজা-বাদশাহ ও আমীরদের সান্নিধ্য থেকে বেঁচে থাকেন। তারা এদের কাছে গমনাগমন করেন না। এমনকি রাজা-বাদশাহরাও যদি তাদের দুয়ারে আসেন, তবুও তারা তাদের সান্নিধ্য থেকে বেঁচে থাকেন।

সারকথা হলো, রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্যই হলো সব অনিষ্টের মূল। আর এ ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বনই হলো আখিরাতমুখী উলামার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কেউ রাজা-বাদশাহর দরবারে আসবে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।” (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি শাসকের যতোই

নিকটবর্তী হবে, সে ততোই আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরবে।" (তিরমিযি) ইবনুল আলিমের মতে, মুসনাদে আহমদের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার পরে একদল শাসক আসবে, তোমরা তাদেরকে চিনবে এবং অস্বীকারও করবে। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে মুক্ত থাকবে। যে অপছন্দ করবে সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এসব শাসকদের সাথে যুদ্ধ করবো না? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বে ততক্ষণ না।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি) সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নিশ্চয় জাহান্নামে একটি গর্ত আছে। জাহান্নাম নিজেই প্রত্যেক দিন এ থেকে সত্তুর বার আল্লাহর আশ্রয় চায়। আল্লাহ তা'আলা এই গর্তকে রাজা-বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎকারীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"। ইবনে আদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসখানা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শাসকদের সাথে সম্পৃক্ত আলিমই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "তোমরা ফিতনার ক্ষেত্রস্থল থেকে বেঁচে থাকো। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, ফিতনার ক্ষেত্রস্থল কি? তিনি জবাব দিলেন, রাজা-বাদশাহদের দরবার। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর বান্দাদের জন্য আলিমগণ হলেন রাসূলের আমানতবাহক, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বাদশাহর সান্নিধ্য থেকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু যখন তারা বাদশাহর সাথে মিশে যাবে তখন তারা রাসূলের খিয়ানত করলো। তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক ও তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকো।" (দায়লামী)

ইতহাফ গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের উপরে হবে। তাবিঈদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তোমরা যখন আলিমকে বাদশাহর দরবারে আসা-যাওয়া করতে দেখবে, তখন তার ব্যাপারে সাবধান থেকো, সে হচ্ছে একটি চোর।" আবু হাযীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শ্রেষ্ঠ শাসক হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর নিকৃষ্ট আলিম হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি শাসকদের সাক্ষাতে এগিয়ে আসেন"। মাকহুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে যে ব্যক্তি কিছু পাওয়ার আশায় বাদশাহর সান্নিধ্যে যায়, সে বাদশাহর সমপরিমাণ পাপ

নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” (দায়লামী) বিখ্যাত ওলি এবং মুহাদ্দিস ফুযায়িল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোন ব্যক্তির জন্য রাজা-বাদশাহদের নিকট যাওয়ার চেয়ে একটি দুর্গন্ধময় লাশের কাছে যাওয়া উত্তম। যে ব্যক্তি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে না, সে যদিও নফল ইবাদাত বেশী করে না, কিন্তু সে সারারাত ইবাদাতকারী, সিয়াম সাধনাকারী, হজ্জ ও উমরাহ পালনকারী এবং আল্লাহর পথে মুজাহিদের চেয়েও উত্তম”। অতঃপর ইতহাফ গ্রন্থকার বলেন, রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্য বর্তমান যুগে আলিমদের জন্য একটি বড় ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অনিষ্ট গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে সূক্ষ্মভাবে ধোঁকা দেয়। সে বলে, তাদের কাছে তোমার যাওয়া-আসা তো দ্বীনের কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাইআত গ্রহণের পর তাঁর কাছে লিখলেন, “আম্মা বাদ .. আল্লাহর দ্বীনের কাজে আমি কোন লোকদের সাহায্য নেব, সে ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দান করুন। হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পত্রের জবাবে লিখলেন, “দ্বীনদার মানুষ তো আপনার সাক্ষাতের জন্য আসবে না। আর আপনি দুনিয়াদারদের সাথে সাক্ষাতের কোন ইচ্ছাও করবেন না।”

সপ্তম আলামাত: মুহাব্বাতের সপ্তম আলামাত হলো, আল্লাহ তা’আলার ভয়। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে মাহবুবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় উভয়টিই থাকে। ভয় হলো মুহাব্বাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। এ সম্পর্কে সতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আফসোস, এখানেই এসে আমরা গ্রন্থের ইতি টানতে বাধ্য। আল্লাহ তা’আলা তাওফিক দান করলে আগামীতে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো। এখানে ইহইয়ায়ে উলূম থেকে আরো দু’একটি কথা তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, “বিশেষ প্রেমিকের জন্য ভয়ের কিছু স্তর আছে। একটি আরেকটির চেয়ে কঠিন। প্রথম স্তর হচ্ছে, বিমুখ হওয়ার ভয়। এর চেয়ে কঠোর হলো পর্দা পড়ে যাওয়ার ভয়- এটা হলো দ্বিতীয় স্তর। এর থেকে আরো কঠোর হলো, দূরে সরে পড়ার ভয়, এটা হলো তৃতীয় স্তর। আর এর থেকেও কঠোর চতুর্থ স্তর হলো থেমে যাওয়ার ভয়। এই থেমে যাওয়াটা সাধারণ লোকদের জন্য একটি শাস্তি আর বিশেষ লোকদের জন্য একটি সূক্ষ্ম ধোঁকা। তা থেকে একমাত্র অটল অবিচল মানুষই বাঁচতে সক্ষম হয়। ভয়ের পাঁচ নং স্তর হলো হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। ষষ্ঠ স্তর হলো বিস্মৃতির ভয়। প্রেমিককে সব সময় প্রেমাস্পদের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী হতে হবে। আকাঙ্ক্ষা পোষণে সে কখনো বিরক্তিবোধ করবে না। নতুন স্বাদ-আস্বাদন ছাড়া

সে তৃপ্ত হয় না। এর পর হলো বদলে যাওয়ার ভয়। অর্থাৎ আল্লাহর মুহাব্বাত থেকে গাইরুল্লাহর মুহাব্বাতে পরিণত হওয়া। এ স্তর হলো অসন্তুষ্টি ও নারাজির। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এসব বিষয়ের জন্য খাওফ ও মুরাক্বাবা খুবই জরুরী। কারণ, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভালোবাসে সে তা হারিয়ে যাওয়া নিয়েও আশঙ্কা করে।”

এখানে এসেই ‘কিতাবুল ফুরক্বান ফি ইলমিত্তাছাওউফ ওয়াল ইহসানের’ প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি হলো।

‘আল আযকার তুফিদুস সালিকীন ইলার রাহমান’ নামে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য বিষয়টি সমাপ্ত করবো। (এ শিরোনামে কোন গ্রন্থ প্রকাশ হয় নি -অনুবাদক)

মুনাজাত

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

اللّٰهُمَّ اجعلني صبورا واجعلني شكوا واجعلني قي عيني صغيراوفي اعين ألناس كبيرا

اللّٰهُمَّ طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بانوار معرفتك ومحبتك ومشاهداتك

وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلّم

-"অতএব, বিশ¡জগতের পালনকর্তা, ভূগুলের পালনকর্তা ও নভোগুলের পালনকর্তা আল্লাহরই প্রশংসা। নভোগুলে ও ভূগুলে তাঁরই গৌরব; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (জাসিয়া (৪৫) : ৩৬-৩৭)

-"আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।" (বাক্বারাহ (২৫৫) : ২)

-"আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য, তিনি ছাড়া মহাকরুণাময় দয়ালু কেউ নেই।" (বাক্বারাহ (২) : ১৬৩)

-"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।" (আলে ইমরান (৩) : ১৭৩)

-"অতএব আল্লাহ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।" (ইউসুফ (১২) : ৬৪)

-"তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।" (আম্বিয়া (২১) : ৮৭)

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নাই। বাদশাহী শুধু তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোন মৃত্যু নাই। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

"হে চিরঞ্জীব ও প্রতিপালক! আমি তোমার রাহমাতের ভিক্ষা করছি। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞপরায়ণ বানাও। আমাকে আমার চোখে ছোট এবং মানুষের চোখে বড় বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করো। তোমার

মা’রিফাত, মুহাব্বাত এবং মুশাহাদার নূর দিয়ে অধিক ইস্তিগ্বফার এবং তোমার নবীজীর উপর অধিক সালাত ও সালাম পাঠের মাধ্যমে আমার অন্তরকে আলোকিত করে দাও”।

تمّت بالخير

মুহাম্মাদ মুশাহিদ
খাদীমুল হাদীস
দারুল উলূম, কানাইঘাট, সিলেট।